ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ

নৃপেন্দ্র গোস্বামী, এম. এ.,

রাজা রাধাকান্ত দেব গোল্ড মেডালিস্ট ; অধ্যাপক, দমদম মতিঝিল কলেজ,
কলিকাতা-২৮ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বিভাগের পরীক্ষক ;
বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি এবং **ভারতীয় দর্শন**
গ্রন্থের লেখক ; ভারতকোষের নিবন্ধ লেখক।

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

মুখবন্ধ

বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশকালে আমার তরফ থেকে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করছি। আমার পূর্বপ্রকাশিত পুস্তক "বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি" (প্রথম ভাগ) আর্য গোত্রসংগঠন বিষয়ে আলোচনামূলক। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। প্রথম ভাগে গোত্রসমস্যার উপর বৈজ্ঞানিক আলোকপাতের জন্য আধুনিক সামাজিক নৃবিজ্ঞানের কতিপয় সূত্রের অবতারণা ছিল। এই সূত্রগুলি প্রধানত পদ্ধতিগত, আংশিকভাবে সিদ্ধান্তগত। স্বল্প পরিসরে কৃত আলোচনাকে স্বচ্ছতর করবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বর্তমান প্রয়াস। দীর্ঘ ভূমিকায় আলোচিত হয়েছে নৃতাত্ত্বিক বিষয়গত (১) পরিবার, (২) বিবাহ, (৩) আত্মীয়তা, **Kinship** এবং (৪) শ্রেণী ও বর্ণ সংক্রান্ত তথ্য ও সমস্যা। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় ও অভারতীয় উভয় প্রকার তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে পূর্ব পুস্তকের রীতিতে। উভয় প্রকার দৃষ্টান্তের মধ্যে মিল এবং অমিল থেকে সূচিত হয় ভারতীয় অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য। ভারতের মধ্যেও এলাকাগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অপর অঞ্চলের সামাজিক সত্য ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সমুচিত নয়। তার পক্ষে বাধাস্বরূপ নঞর্থক তথ্যসমূহ। আমার বক্তব্য হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিক আপেক্ষিকতাবাদ। সর্বাত্মক সিদ্ধান্তের পক্ষে আমি যুক্তি খুঁজে পাইনে, যদিও নানা দেশগত সামাজিক তথ্য সমূহের তুলনামূলক আলোচনারও প্রয়োজন রয়েছে।

গ্রন্থের প্রথম প্রকরণে আলোচ্য হচ্ছে ভারতীয় সমাজের বিবর্তনগত বৈশিষ্ট্য, যা ইউরোপীয় নজীরের সাহায্যে বোধগম্য নয়। ভারতের ক্ষেত্রে কৌমতন্ত্র (**tribalism**) ও বর্ণভেদের বিশেষ ভূমিকা লক্ষিত হয়, যা ইউরোপীয় সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্গত নয়। দাসতা ও সামন্ততন্ত্র ইউরোপে সামাজিক বিবর্তনকে যেমন রূপায়িত করেছে, তেমনভাবে ভারতীয় সমাজের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। ইউরোপে শ্রেণীবিন্যাস মুখ্য সামাজিক সত্য, কিন্তু ভারতে বর্ণবিন্যাস প্রাধান্য পেয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকরণের আলোচ্য বৈদিক আর্যদের পারিবারিক সংগঠন ও যৌন জীবন। এই আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরবর্তী চার প্রকরণে আলোচিত বিষয় সমূহ। স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে এবং অর্থশাস্ত্রে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রথামত বিবাহের তালিকা ও পুত্রের তালিকা প্রায় একপ্রকার। এই সূত্রিত বিবরণের বাস্তব দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হয়েছে মহাভারতে। মহাভারতীয় তথ্যসমূহ বৈদিক এবং বেদোত্তর আমলের সামাজিক আলেখ্যরূপে প্রতিভাত হয়। উভয় আমলের পরিবার ও বিবাহ প্রথা

অনেকটা এক ছাঁচে ঢালা। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিচারে বৈদিক ও বেদোত্তর কালের মধ্যে ব্যবধান গুরুতর, কিন্তু পারিবারিক সংগঠনের বিবেচনায় উভয় যুগের সাদৃশ্যই চোখে পড়ে। বেদের আমলে ব্যক্তিগত ও যৌথ পরিবার ছিল এবং পরবর্তী আমলেও এই দুই প্রকার পরিবার ছিল। বেদের যুগের গণিকাপ্রথা পরবর্তী কালে অধিকতর সংগঠিত রূপ লাভ করেছে। উভয় আমলেই যৌন জীবনে কড়াকড়ি ছিল না, তবে বিধিনিষেধ ছিল এবং সম্ভবত বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহও ছিল বলে মনে হয় পুত্রতালিকার বিশ্লেষণ থেকে।

সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণের আলোচ্য প্রাচীন ভারতে যৌন বিধি নিষেধের অতিক্রমণ। এই আলোচনায় কামসূত্র গ্রন্থের তথ্যসমূহের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই সব তথ্যের আঞ্চলিক রূপ সহজেই ধরা পড়ে। এগুলির ভিতরে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে প্রধানত শহরের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের যৌন জীবনের রূপরেখা। নবম প্রকরণে আলোচিত হয়েছে মৃচ্ছকটিক নাট্যগ্রন্থে চিত্রিত প্রাচীন কালের নগর জীবন ও তার অঙ্গীভূত গণিকা প্রথা। দশম প্রকরণটি কুট্টনীমতম কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার বা অর্থনৈতিক পটভূমিতে ধৃত গণিকাজীবনচিত্র।

একাদশ প্রকরণটি মুসলমান সমাজের বিবাহপ্রথা, মহর প্রথা, বিবাহবিচ্ছেদ-রীতি, জাতবিচার প্রভৃতি বিষয়ে খণ্ডবিবরণ মাত্র। দ্বাদশ প্রকরণে আলোচিত হয়েছে সমসাময়িক নৈতিক প্রবণতা।

গ্রন্থমধ্যে কোন বিশেষ মতবাদের প্রতি বা সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শিত হয় নাই। প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের তুলনায় উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার হয় নি। যৌথ পরিবারের বা পারিবারিক সাম্যবাদের বিলোপের আসন্ন সম্ভাবনায় একটু ক্ষোভ প্রকাশ আছে মাত্র। সামাজিক আতিশয্যের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। এরূপ আতিশয্য সেকালেও ছিল এবং একালেও বহুক্ষেত্রে প্রকট। বর্তমানে পশ্চিমীকরণের হুজুগে এদেশে আমদানীকৃত বিবিধপ্রকার আতিশয্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটছে। আতিশয্যজনিত নৈতিক সংকট প্রায় সামাজিক ব্যাধির আকারপ্রাপ্ত।

গ্রন্থগত মন্তব্য ও শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

(১) পৃ ২৭। সোভিয়েট দেশে সাধারণত পুরুষের মজুরী অপেক্ষা নারীর মজুরী কম এরূপ উক্তির ব্যাখ্যা আবশ্যক। মজুরীগত তারতম্যের কারণ হচ্ছে মহিলাদের মধ্যে অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। অদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকের বেতন পার্থক্য উক্ত দেশে স্বীকৃত।

(২) ট্রাইবের অর্থে হিন্দী ভাষাগত কৌম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই অর্থ বোঝাতে বাংলা ভাষায় আদিবাসী ও উপজাতি শব্দদ্বয়ের অধিক প্রচলন দেখা যায়।

(৩) পৃ ৬৬। সমধিন। বেহাই ও বেহানকে বোঝাতে এই শব্দের প্রয়োগ অঞ্চলবিশেষের হিন্দীভাষীদের মধ্যে দেখা যায়। মজুমদার-মদনের গ্রন্থে (পৃ ১০৯) এই শব্দের এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। অধিক সতর্ক প্রয়োগে সমধী ও সমধিন হচ্ছে যথাক্রমে বেহাই ও বেহান।

(৪) পৃ ৬৬। জ্ঞাতি। পিতৃব্য ও দেবর প্রভৃতিকে জ্ঞাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিতৃব্য পিতৃধারার আত্মীয়। এরূপ আত্মীয়কে বোঝাতে জ্ঞাতি শব্দের প্রয়োগে আপত্তি থাকা উচিত নয়। সাধারণত জ্ঞাতি শব্দবাচ্য পিতৃধারার আত্মীয়। কিন্তু দেবর বিবাহজাত আত্মীয়। তাকে জ্ঞাতিরূপে গণনায় আপত্তি উঠতে পারে। এস্থলে বলা সঙ্গত যে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞাতি শব্দের শিথিল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

পৃ ৫২। জ্ঞাতিগোষ্ঠী। পিতৃধারার (patriliny) এবং মাতৃধারার (matriliny) বাচক হিসেবে কিন (kin) শব্দকে সমাজবিদরা চালু করেছেন। তাঁদের অনুকরণে এই দুই প্রকার বংশধারাকে বোঝাতে জ্ঞাতি শব্দ প্রয়োগ করেছি। মাতৃধারাবাচক কোন শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নেই, যেহেতু এরূপ বংশধারা আর্যসমাজের বহির্ভূত। এজাতীয় মাতৃনামের বংশধারা বলতে যা বোঝা যায় তার সঙ্গে পিতৃনামিক গোষ্ঠীগত কগ্‌নেট আত্মীয়ের মিল আছে।

জ্ঞাতিশব্দের অর্থভেদের নমুনা উল্লেখ করছি।

মনুসংহিতা অনুসারে মামাত, পিসাত ও মাসতুত বোনকে, অর্থাৎ, নারীর ধারার আত্মীয়াকে বা কগ্‌নেট আত্মীয়াকে জ্ঞাতি বলা যায়। (মনু ১১।১৭২, ১৭৩)

অমরের মতে জ্ঞাতি, বন্ধু ও সগোত্র একার্থক, অর্থাৎ, পিতৃধারার আত্মীয়। বাংলাভাষার প্রয়োগে জ্ঞাতি অনুরূপ অর্থবাচক। (অমর ২।৬।৩৪)

অথর্বমন্ত্রে পিতৃবন্ধুর ও মাতৃবন্ধুর উল্লেখের সঙ্গে বিবাহ সংক্রান্ত জ্ঞাতির উল্লেখ দেখা যায়। এস্থলে জ্ঞাতি বিবাহজাত আত্মীয়ের দ্যোতক। (অথর্ব ১২।৫।৪৩, ৪৪)

(৫) পৃ ৫৮। বৃদ্ধ প্রপৌত্র। মথুরানাথ তর্করত্নকৃত দায়ভাগের অনুবাদে এই শব্দপ্রয়োগ দ্রষ্টব্য। (দায়ভাগ, মূল, টীকা ও অনুবাদ, ১৮৭০, পৃ ২২৫)

(৬) পৃ ১১৪। অতি-অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। এই প্রয়োগ অনুমোদন পাবে কিনা জানি না। প্রচলিত সীমা হচ্ছে অত্যতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ।

(৭) পৃ ১২৭। অতীচার। বিকল্প রূপটি অতিচার। অর্থশাস্ত্র, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ প্রদত্ত পাঠ দ্রষ্টব্য।

(৮) পৃ ১৩০। আলুক। দেশীয় মেটে আলুবিশেষ। পোটেটো নয়।

(৯) পৃ ৭৭। নব শায়ক। পৃথক্‌ তালিকায় নব শায়কের অন্তর্গত হচ্ছে

কাঁসারীর ও শাখারীর পরিবর্তে তেলী ও ময়রা। গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকাগত অপর সাত বর্ণ বিষয়ে মতভেদ নাই।

(১০) পৃ ৯, Yaghan একটি কৌমের নাম। পৃ ১২১, নিন্দু মৃত সন্তান প্রসবকারিণী।

পৃ ১৭০, ১৭৩, মৃচ্ছকটিক প্রকরণে চারুদত্তের পরিচারিকা রদনিকা।

(১১) গ্রন্থোক্ত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ভূখণ্ডবাচক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিষয়গত অনুশীলনে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, সাহিত্যিক নারায়ণ চৌধুরী, সাহিত্যিক সরোজ আচার্য, সাহিত্যিক রণজিৎ কুমার সেন, সাহিত্যিক সরিৎশেখর মজুমদার, সাহিত্যিক শৈলেন্দ্র বসু, সাহিত্যিক সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক শৈলেন্দ্র মজুমদার, ডক্টর দুলাল চৌধুরী, অধ্যাপক মতিলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র প্রভৃতি। পরিশেষে গ্রন্থগত মুদ্রণজনিত ও অন্যান্য ত্রুটীবিচ্যুতির জন্য সহানুভূতিশীল পাঠকমণ্ডলের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

৪২।৭ ইস্ট এণ্ড পার্ক,
কলিকাতা ৩৯

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

সূচীপত্র

সংক্ষেপ সংকেত

ঋ—ঋগ্বেদ শাকল সংহিতা।

ঐ ব্রা—ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

নিরুক্ত—যাস্ক কৃত নিরুক্ত, ঋগ্বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

অথর্ব—অথর্ববেদ শৌনক সংহিতা।

তৈ সং—কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা।

তৈ ব্রা—কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।

প্রবর প্রশ্ন—কৃষ্ণযজুর্বেদীয় বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রের পরিশিষ্ট।

আপ শ্রৌ সূ—কৃষ্ণযজুর্বেদীয় আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্র : প্রবর বিষয়ক [illegible]তম প্রশ্ন, ৫-১০ কাণ্ডিকা।

গোত্রপ্রবর নিবন্ধ কদম্বম—P. Chentsal Rao কৃত সংকলন, এই গ্রন্থের অন্তর্গত অভিনব মাধবাচার্য কৃত গোত্রপ্রবর নির্ণয়

বা সং—শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়িসংহিতা।

শ ব্রা—শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ।

ছা উপ—সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

মহা—বেদব্যাস কৃত মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ।

মনু—মনুসংহিতা স্মৃতিগ্রন্থ।

যাজ্ঞবল্ক্য—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা স্মৃতিগ্রন্থ।

মিতাক্ষরা—যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর বিজ্ঞানেশ্বর কৃত টীকা।

দায়ভাগ—জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগ।

উদ্বাহতত্ত্ব—রঘুনন্দন কৃত নব্যস্মৃতি গ্রন্থ।

অমর—অমরসিংহ কৃত নামলিঙ্গানুশাসন বা কোষগ্রন্থ।

অর্থশাস্ত্র—কৌটিল্য কৃত অর্থশাস্ত্র, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।

কামসূত্র—বাৎস্যায়ন কৃত কামশাস্ত্র, চৌখম্বা সংস্করণ।

বিষ্ণু—বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা সমন্বিত।

বিষ্ণু সং—বিষ্ণুসংহিতা স্মৃতি গ্রন্থ।

গৌতম—গৌতমসংহিতা স্মৃতিগ্রন্থ।

বসিষ্ঠ—বসিষ্ঠসংহিতা স্মৃতিগ্রন্থ।

পরাশর—পরাশরসংহিতা স্মৃতিগ্রন্থ।

অত্রি সং—অত্রিসংহিতা স্মৃতিগ্রন্থ।

(উক্ত পাঁচটি স্মৃতিগ্রন্থ, উশনঃসংহিতা এবং সংবর্ত সংহিতা উনবিংশতি-সংহিতার অন্তর্গত।)

Ency. Brit.—Encyclopaedia Britannica.

Ency., Hastings—Encyclopaedia of Religion and Ethics, J. Hastings.

ভূমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশে সাহিত্যক্ষেত্রে একধরণের অতিযৌনতাবাদ অতি-মাত্রায় বীতভয় হয়ে উঠেছে এবং শ্লীলতা সংক্রান্ত সংস্কারগুলিকে অতিক্রমণে চেষ্টিত। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর জনপ্রিয়তার পিছনে সামাজিক কারণ রয়েছে। প্রতিকূল অর্থনীতি, রাজনৈতিক হতাশা, সমাজ-জীবনে শূন্যতাবোধের বিস্তৃতির ফলে নেতিমূলক চিন্তা বিকশিত হচ্ছে। পুরাতন মূল্যগুলির Negation বা খণ্ডনের দিকে এই চিন্তা প্রসারিত। আমরা যেন একটা Negation বা খণ্ডনের যুগে প্রবেশ করেছি। প্রচলিত নীতি, আদর্শ, মূল্য (Value) প্রশ্নের বিষয় হয়েছে। পরিবার-প্রথা, বিবাহ-প্রথা, যৌন এক-নিষ্ঠতা, শ্লীলতা-সংস্কার বজায় রাখার কি প্রয়োজন? শিল্পী, সাহিত্যিক, চিন্তাশীলরা সমগ্র সাংস্কৃতিক সঞ্চয়ের সম্বন্ধেই একটা প্রশ্ন-সূচক চিহ্ন তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। আমরা সম্পূর্ণ-রূপে সংস্কার-মুক্ত হই না কেন? কিন্তু সংস্কার-মুক্তি কথার কথা মাত্র। মানুষ হিসেবে আমরা কোন না কোন কাল্চার-এর সঙ্গে যুক্ত, যার দরুণ নিজেদের আমরা পশু-স্তর থেকে আলাদা-রূপে গণ্য করি। কাল্চার মানে সংস্কার-সমষ্টি,—বস্তুগত বা ভাবগত। পুরাতন সংস্কারের উচ্ছেদ মানে নূতন সংস্কারের আবাহন। সংস্কার কাটিয়ে ওঠার প্রশ্ন অবান্তর।

যৌন প্রশ্নগুলিও মূলত সামাজিক প্রশ্ন, যেহেতু আমরা সমাজে বাস করি। যৌন আবেদন-মূলক শিল্প-সাহিত্য সামাজিক অর্থকোশ থেকেই কিছু লভ্যাংশের প্রত্যাশী, নইলে যৌনতাবাদের জন্য মাথাব্যথা এত তীব্র হত না।

প্রাক্-বিবাহ যৌনতা বা বিবাহোত্তর ব্যভিচার কম-বেশি সর্বপ্রকার আদিম গোষ্ঠীতে কিংবা সভ্য সমাজে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু সর্বত্রই কোন না কোন প্রকারের অবিধিবদ্ধ বা বিধিবদ্ধ বিবাহ-প্রথা ও পরিবার-প্রথা বর্তমান। খাদ্য সংগ্রহকারী আদিম গোষ্ঠীগুলিতেও প্রাথমিক পরি-বারের সাক্ষাৎ মিলেছে। পরিবার প্রথা-বিহীন কোন গোষ্ঠী বা সমাজ আবিষ্কৃত হয়নি। বিবাহ রীতি থেকেই পরিবার উদ্ভূত, এর পিছনে যৌন প্রেরণা অন্যতম মৌলিক প্রেরণা, কিন্তু তা ছাড়াও জীবন-যাপনের কতগুলি বাস্তব প্রয়োজন রয়েছে, যেগুলি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বহু ক্ষেত্রেই যৌন প্রয়োজনকে ছাপিয়ে ওঠে অর্থনৈতিক প্রয়োজন।

যৌনতার রূপায়ণও প্রচলিত সাংস্কৃতিক জনশ্রুতি-সাপেক্ষ, নিছক প্রবৃত্তির পরিপূরণ নয়। সেম নাগা গোষ্ঠীতে বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করার রীতি সমর্থিত হয়। এর মূলে যৌন সত্য নগণ্য অংশ মাত্র, বস্তুতপক্ষে পৈত্রিক সম্পত্তি লাভের প্রেরণাই মূল কথা, যেহেতু এই গোষ্ঠীতে বিধবা মৃত স্বামীর সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে। আন্দামান-বাসীর পরিবার প্রথা জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজন-প্রসূত। এই গোষ্ঠীতে স্বামী-স্ত্রী এক-যোগে খাদ্য আহরণে নিযুক্ত হয়। বিবাহ ও পরিবার-প্রথার মূলীভূত কয়েকটি প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রেই পরিস্ফুট। যথা,—(১) যৌন প্রেরণা; (২) সন্তান-পালন; (৩) গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির ধারা সংরক্ষণ; (৪) অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর সংসারযাত্রায় যৌনতার স্থান সর্বাগ্রগণ্য নয়, বরঞ্চ অর্থনীতি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সাংসারিক বাস্তবতা আদিম ও সভ্য সমাজের দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবেচ্য এবং এই দিকটাকেই উপেক্ষা করেছে সমসাময়িক যৌনতাবাদ। বিবাহ-বহির্ভূত ব্যভিচার বহুক্ষেত্রে অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, প্রায় গণিকা-বৃত্তির সামিল। শহুরে পরিবেশে বহু নারী পেটের দায়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, যেমন গণিকা-বৃত্তির পটভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিছক কাম-বৃত্তি নয়। বিবাহের সামাজিক তাৎপর্য বা ব্যভিচারের ও গণিকা-প্রথার সামাজিক দিক সঠিকভাবে বিচার করলে কাম-বৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। [Social Anthropology, D. N. Majumdar and T. N. Madan, 1961, pp. 78, 79.]

বর্তমান গ্রন্থে আলোচ্য ভারতীয় সমাজ-সংগঠন ও বিবাহ-প্রথা। আদিম সমাজের কৌমতন্ত্র ও হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ, আদিম ও সভ্য গোষ্ঠী-গুলির বিবিধ প্রকার বিবাহ-প্রথা, প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু সমাজের বিবাহ-বিধি, প্রাক্-বিবাহ যৌনতা, বিবাহোত্তর ব্যভিচার, গণিকা-প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা হয়েছে, যা সমসাময়িক কুতূহলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমাজতত্ত্ব বাঙ্গালী পাঠকের নিকটে একেবারে অপরিচিত বিষয় নয়, কিন্তু ছাড়া ছাড়া বিক্ষিপ্ত আলোচনা বাংলা সাময়িক পত্রে পরিবেষিত হয়, সুসংবদ্ধ আলোচনা আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে কদাচিৎ গ্রন্থাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ সমাজ-সংগঠন ও বিবাহ-বিষয়ক বা যৌনতা-বিষয়ক নানা সমস্যাই মননের অন্তর্গত। এরূপ সমস্যার সমাজ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একান্তই প্রত্যাশিত।

ফ্রয়েডীয় যৌনতাবাদ অনেকের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, যা হালের সাহিত্যিক আন্দোলনে নানাভাবে রূপায়িত। এর কারণ ফ্রয়েডের সঙ্গে পরিচয় বাংলা অঞ্চলে অনেক দিন থেকে। ঠিক সেই পরিমাণে

সমাজতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। অথচ সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা যথার্থভাবে সমাজতত্ত্বের এলাকা-গত। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে উপযোগী সূত্র নয়। সামাজিক পরিবেশ বহুবিধ প্রথা, সংস্কার ও বিকৃতির জন্য দায়ী। অঞ্চলভেদে এই পরিবেশ বিভিন্ন ও বিচিত্র, সর্বত্র একপ্রকার নয়। এই হিসেবে সামাজিক সমস্যামাত্রই আঞ্চলিক সমস্যা, বিশ্বজনীন সমস্যা নয়। আঞ্চলিক পরিবেশ ও প্রয়োজন সমস্যা সৃষ্টি করে এবং তা থেকে রীতিনীতি ও প্রথার উদ্ভব ঘটে। তাই সমস্যার সরলীকরণ চলে না। এক অঞ্চলের সমস্যাকে অন্য অঞ্চলে আরোপিত করলে আলোচনার প্রসঙ্গ নষ্ট হয়। অতীতের সমস্যাও বর্তমানের উপর চাপিয়ে দেওয়া চলে না। প্রাচীন ভারতে কানীন সন্তানের স্বীকৃতি ছিল, বর্তমান হিন্দু সমাজে তার স্বীকৃতি নেই। 'কেন নেই' সেইটাই সমাজবিদের কৌতূহলের বিষয়। এক যুগের ট্যাবু (Taboo) অন্য যুগে অন্তর্হিত। এক অঞ্চলের বিধি-নিষেধ অন্য অঞ্চলে হাস্য উদ্রেক করে। খাসিদের অনেক প্রথাই বাঙ্গালীর পক্ষে অচিন্তনীয়। মালাবারের যৌনজীবন উত্তরপ্রদেশের শহরে কল্পনার অযোগ্য। পাহাড়িয়া বহুপতিবিবাহ বা শিথিল যৌনতা বাঙ্গালী হিন্দুর নিকটে নীতি-বহির্ভূত। ইংরেজ মুলুকে প্রাক্-বিবাহ যৌনতা কিংবা বিবাহ-বিচ্ছেদ যে ধরণের স্বাভাবিক ব্যাপার, আমাদের নিকটে সেরূপ নয়। তার অর্থ এই যে বাংলাদেশ ইংলণ্ডীয় সামাজিক পরিবেশের বহির্ভূত। আঞ্চলিক সামাজিক পরিবেশকে না বুঝলে অনেক ট্যাবু ও প্রথার তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন অঞ্চলের আচার-বিচার আঞ্চলিক প্রয়োজন-প্রসূত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবন ধারণের প্রয়োজন বা অর্থনৈতিক প্রয়োজন যৌন সমস্যাকে বিশেষ রূপ দেয়। তিব্বতীয় বহুপতিবিবাহ ভাইদের একান্নভুক্ত পরিবার সংরক্ষণে নিয়োজিত। কেরলের নায়ার বহুপতিবিবাহের ভিন্ন উৎস। কাম-বৃত্তির বিশ্লেষণ বা যৌন শারীরতত্ত্ব এই বিষয়ে কোন আলোকপাত করে না। শহুরে সমাজের যৌন বিকৃতির মূল উৎস অর্থনৈতিক বা অন্যবিধ সামাজিক কারণে নিহিত।

সামাজিক সম্মতি ব্যতিরেকে কোন প্রথার বিলুপ্তি ঘটে না, তার প্রমাণ প্রচলিত বরপণপ্রথা। এককালে বরপণের বিপরীত কন্যাপণ প্রথা বাংলাদেশেই প্রচলিত ছিল। ইংরেজী শহুরে আদর্শের প্রভাবে আজ হিন্দু সমাজে এক-বিবাহ রীতি আইনে পরিণত, অথচ প্রাচীন ভারতে বহু-স্ত্রী বিবাহ বা দ্বি-স্ত্রীবিবাহ নীতিগত অসমর্থন পেত না। কয়েক দশক পূর্বেও রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ বহুস্ত্রী বিবাহে প্রবৃত্ত হত। কিন্তু ব্যাপারটা নিছক কামের পীড়ন-জনিত নয়, কুলীন সমাজে পুরুষের সংখ্যাল্পতা এবং প্রতিলোম বিবাহ এড়াবার বাধ্যতামূলক

সামাজিক ট্যাবু এক্ষেত্রে ছিল বিবেচ্য, যা হাস্যকর ইতিকাহিনী সৃষ্টি করেছে। এস্থলে অর্থনৈতিক কারণ অনুপস্থিত। আজকের **বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন** প্রগতিমূলক পদক্ষেপ-রূপে গণ্য, কিন্তু প্রাচীন ভারতে **শর্ত-মূলক বিবাহ-বিচ্ছেদ** নৈতিক সমর্থন লাভ করত। চৈতন্যোত্তর কালের জাত্-বোষ্টমদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন হামেশাই ছিন্ন হত। সতীত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন কালের ও বর্তমানের ধারণায় অনেক তফাৎ চোখে পড়ে। আমরা কি কল্পনা করতে পারি যে ব্যভিচার-দূষিতা নারী মাসিক ঋতুর পরে শুদ্ধা-রূপে গণ্যা হতে পারে? অথচ এরূপ ধারণার প্রচলন ছিল আদি আর্য সমাজে। এথেকে প্রতিভাত হয় যে সাময়িক প্রয়োজন তথা আঞ্চলিক প্রয়োজন যৌনতা-বিষয়ক প্রথার জন্মদাতা। যদি কোন কারণ বশত আমাদের সমাজে পুরুষের সংখ্যাল্পতা সমস্যার আকার গ্রহণ করে, তাহলে বহু-পত্নী-বিবাহের আবশ্যকতা আবার অনুভূত হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতা দেখা দিলে বহুপতি-বিবাহের প্রতি প্রবণতা কিছু ভিন্ন আকারে স্ফুট হতে পারে। শহুরে সভ্যতার প্রসারের ফলে আজকের অনেক অচিন্তনীয় ব্যাপার আগামীকাল চিন্তনীয় হয়ে উঠবে। যথা, বর্ণ-গত অন্তর্বিবাহ (caste endogamy) থেকে বিচ্যুতির জন্য পূর্বে সমাজে পতিত হতে হত, —(কয়েক দশক পূর্বের সামাজিক হালচাল),—আজ কোন কোন অভি-ভাবক অন্তর্বিবাহের বেড়া ভেঙ্গে ফেলছেন। কালে কালে বর্ণান্তর বিবাহের বাধা হয়ত থাকবে না। এই প্রকারে প্রয়োজন বদলায় পরিবেশ-গত পরিবর্তনের ফলে, নূতন প্রয়োজন দেখা দিতে থাকে, যার সঙ্গে পুরাতন রীতি নীতি সংস্কার খাপ খায় না। তখন রীতি নীতিতে সময়োপযোগী পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। শহুরে সভ্যতার একটা ঝোঁক উচ্ছৃঙ্খলতা ও আতিশয্যের দিকে, অসংযত ভোগবাদের দিকে। এই অসংযম ও ভোগবাদ শুধু পুঁজিবাদী বুর্জোয়া বিকৃতি নয়, সমাজতন্ত্রের দেশগুলি থেকেও এ ধরণের খবর এবং অপরাধ-প্রবণতার খবর প্রায়শ আমাদের কানে আসছে। অনেকের ধারণা যে সমাজতন্ত্রের পরিবেশে সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যাধির অবসান ঘটে। এরূপ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করছে অধুনাতন সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির শহুরে সমাচার। শহুরে নৈতিকতা (ethos) বিশেষ প্রবণতা-যুক্ত, তা পুঁজিতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে প্রায় এক রকমের। প্রাচীন শহরেও অসংযত ভোগবাদের দিকে (চার্বাকীয় নীতির দিকে) প্রবণতা ছিল,—আধুনিক শহরেও সেই দৃশ্য কিছু ভিন্ন আকারে। শহুরে ভোগবাদী দৃষ্টিতে যৌন ব্যভিচারের যেরূপ সমর্থন মেলে, গ্রাম্য পরিবেশে সেরূপ মেলে না।

নৃতাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক প্রথা ও

আচারের বিশ্লেষণ দ্বারা একটি বৈজ্ঞানিক মনন-ক্ষেত্র সৃষ্টি করার প্রয়াসী, যেখানে নিজের সামাজিক রীতিকে অপরের সামাজিক রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান দেওয়ার মনোভাব সমর্থিত নয়। আমাদের সামাজিক পরিবেশের অনুকূল আচার গড়ে উঠেছে। অপরাপর সমাজেও এই প্রকারে নানাজাতীয় আচার বিকশিত হয়েছে। কোন্ অঞ্চলের আচার উৎকৃষ্ট, কোন্ দেশের প্রথা নিকৃষ্ট—এরূপ বিচার পরিবেশ-গত প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে। হিন্দু অঞ্চলের বর্ণভেদ স্থানীয় প্রয়োজন-প্রসূত, তার উৎপত্তি যে কারণে তা দূরীভূত হলে কালে কালে তার বিলোপও অসম্ভব নয়। য়ুরোপীয়রা অনেক হিন্দু আচারকে কটাক্ষ করেছে, আবার য়ুরোপীয় আচারকে রক্ষণশীল হিন্দু ঘৃণা করেছে বা প্রগতিবাদী হিন্দু অনুকরণ করেছে। এজাতীয় মনোভাবগুলি সমাজবিজ্ঞানকে আশ্রয় করেনি। বিদেশীয় আচারের সঙ্গে স্বকীয় আচারের গরমিল থেকে একের উৎকর্ষ বা অপরের অপকর্ষ অনুমান করা যায় না। কোন আচারকে সহজে কোন অঞ্চল থেকে অপসারিত করা চলে না। সমাজ-সংস্কারকরা অনেক সময়ে ত্বরিত পরিবর্তন আনতে চেয়ে ভুলের বশবর্তী হন। সামাজিক পরিবর্তন ধীরগতিযুক্ত, তার পিছনে বাস্তব কারণ-সমূহের (পরিবেশ-গত অর্থনৈতিক-সামাজিক কারণ-সমূহের) কিংবা নবাগত আদর্শের বা ভাবধারার অথবা বিদেশীয় দৃষ্টান্তের প্রভাব থাকে। হালের হিন্দু সমাজীয় পরিবর্তনে এই সকল ব্যাপার লক্ষণীয়।

বর্তমানে উনিশ-শতকীয় সংস্কারবাদে ভাঁটা পড়েছে আমাদের দেশে, রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। কোন মহলে ধীর পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষিত, কোন মহলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে কাম্য। এরূপ পরিবর্তন সহজ-সাধ্য নয়। সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষণগুলিতে সহযোগিতার মনস্তত্ত্ব সহজে গড়ে উঠছে না (বিশেষত কৃষি-সমবায়গুলিতে), ব্যক্তিতান্ত্রিক লাভালাভের দৃষ্টিভঙ্গীও দূরীভূত হচ্ছে না, (সোভিয়েট দেশে মুনাফার ভিত্তিতে বোনাস-প্রবর্তন ব্যক্তিতন্ত্রের নজীর-রূপে প্রতিভাত),—কর্ম-উদ্দীপক বা incentive সৃষ্টি করতে বহুক্ষেত্রে ব্যর্থতা পরিস্ফুট, আবার শহর অঞ্চলের নয়া ভোগবাদ সমস্যা সৃষ্টি করছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনুন্নত দেশে গরীবী ও বেকারীর দ্বারা পীড়িত, উন্নত দেশে জনকল্যানমূলক অর্থনীতির সহায়তায় কিছু কিছু সামাজিক ব্যাধির উপশম করতে সফল হলেও সমস্যা-মুক্ত নয়।

জন-কল্যান-মূলক অর্থনীতি কিংবা সমাজতন্ত্র,—উভয়ের মধ্যেই সরকারী কেন্দ্রীকরণ, সরকারী নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক নিরাপত্তার নীতি স্বীকৃত। উভয়েই ভোগবাদের আদর্শ-চারী, শ্রম ও উপভোগের নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ। উভয়েই নানাপ্রকার সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত,—যেগুলি শহুরে সভ্যতা থেকে উদ্ভূত

শহুরে জীবনের বিচ্ছিন্নতা-বোধ, ভীড়ের মধ্যে একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, কপটতা, স্বার্থানুশীলন, প্রতিযোগিতা, যৌন বিকৃতি, মানসিক বিকৃতি থেকে সমাজতন্ত্রও নিষ্কৃতি পাবে না।

সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত বিবাহ থাকতে পারে না এবং যৌথ যৌনতা (Sexual communism বা যৌন সাম্যবাদ) বিকশিত হবে,—এরূপ একটি ধারণা অনেকে পোষণ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে এই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত বিবাহ সম্পর্কিত,—এবং যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংকুচিত, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিবাহ ধীরে ধীরে উঠে যেতে থাকবে। State socialism বা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নে খামার ও কারখানাগুলি রাষ্ট্রগত বা যৌথ সম্পত্তি-রূপে গণ্য, সেখানে ব্যক্তিগত পরিবার উঠে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

"Marriage and Family in the U.S.S.R." নামক গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে Sputnik পত্রিকায়। এই উদ্ধৃতি অনুসারে কয়েকটি তথ্য প্রদর্শিত হচ্ছে।

১৯৬০ সাল: প্রতি ৯টি বিবাহে ১টি divorce বা বিবাহ বিচ্ছেদ। (সোভিয়েট ইউনিয়ন)।

১৯৬৪ সাল: প্রতি ৫ বা ৬টি বিবাহে ১টি বিবাহ বিচ্ছেদ। (সোভিয়েট ইউনিয়ন)।

১৯৬৩ সাল: প্রতি ৪টি বিবাহে ১টি বিবাহ বিচ্ছেদ। (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)।

১৯৬৩ সাল: ৬ বা ৭টি বিবাহে ১টি বিবাহ বিচ্ছেদ। (পূর্ব জার্মান ডিমোক্রাটিক রিপাবলিক)।

১৯৬৩ সাল: প্রতি ৭ বা ৮টি বিবাহে ১টি বিবাহ বিচ্ছেদ। (যুগোস্লাভিয়া)।

১৯৬৩ সাল: প্রতি ১১টি বিবাহে ১টি বিবাহ বিচ্ছেদ। (ফ্রান্স)।

১৯৬৩ সাল: ১১টি বিবাহে ১টি বিবাহ বিচ্ছেদ। (পশ্চিম জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক)।

১৯৬৩ সাল: প্রতি ১১ বা ১২টি বিবাহে ১টি বিবাহ বিচ্ছেদ। (পোল্যাণ্ড)।

১৯৬৩ সাল: প্রতি ১২ বা ১৩টি বিবাহে ১টি বিবাহ বিচ্ছেদ। (ব্রিটেন)।

১৯৬৩ সাল: প্রতি ১৩টি বিবাহে ১টি বিবাহ বিচ্ছেদ। (জাপান)।

১৯৬৬ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এর কারণ হচ্ছে এই যে ১৯৬৫ সালের আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ পদ্ধতি সহজ

করা হয়। লেনিনগ্রাড আদালতে ১০০০টি বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার বিবরণ এইপ্রকার :—

বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য স্ত্রী যেস্থলে দরখাস্ত করেছে সেক্ষেত্রে বিবিধ কারণ প্রদর্শিত হয়েছে। যথা,—

স্বামী অতিরিক্ত মদ্যপায়ী, সমগ্র স্ত্রী-কৃত দরখাস্তের ২৯.২ শতাংশ। স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা, ১৫ শতাংশ। স্বামীর দুর্ব্যবহার, ২৬.৬ শতাংশ। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ-হীনতা, ১২.৪ শতাংশ। স্বামীর চরিত্রের অসামঞ্জস্য, ৯ শতাংশ। অপরাধের জন্য স্বামীর কারাদণ্ড, ৩ শতাংশ। অপর পুরুষের প্রতি স্ত্রীর প্রণয়, ১.৪ শতাংশ। স্বামীর পুরুষত্বহানি, ১শতাংশ। সন্তান-হীনতা, সন্তানলাভে স্বামীর অনিচ্ছা, স্বামীর ঈর্ষাপরায়ণতা, স্বামীর হীনস্বাস্থ্য বা ব্যাধি—২.৪ শতাংশ।

বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য স্বামী যে ক্ষেত্রে দরখাস্ত করেছে, সেক্ষেত্রে প্রদর্শিত কারণগুলি এইরূপ। যথা,—

স্ত্রীর চরিত্রের অসামঞ্জস্য—সমগ্র স্বামী-কৃত দরখাস্তের ৩০.৫ শতাংশ। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুরাগ-হীনতা—২৪·৫ শতাংশ। স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা—১৫·৫ শতাংশ। অপর রমণীর প্রতি স্বামীর প্রণয়—১২·৩ শতাংশ। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিরূপ মনোভাব—৭ শতাংশ। শ্বাশুরীর সহিত স্বামীর কলহ—২·৫ শতাংশ। সন্তানহীনতা—২·৫ শতাংশ। যৌন অসামঞ্জস্য—২·২ শতাংশ। স্ত্রীর অহেতুক ঈর্ষাপরায়ণতা—১·৭ শতাংশ। স্ত্রীর হীনস্বাস্থ্য, স্ত্রীর অতিরিক্ত মদ্যপান, বাসগৃহের অস্বাচ্ছন্দ্য—১·৩ শতাংশ। [pp. 35-39, Sputnik, monthly digest, June, 1968, edited by Novosti Press Agency, Moscow and published in London.]

উক্ত বিবরণে স্ফুট হচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে ব্যক্তিগত বিবাহ প্রথা টিকে রয়েছে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ, ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষত্রুটী, ঈর্ষাদ্বেষ, বিশ্বাসভঙ্গ প্রভৃতি ব্যাপারও রয়েছে। সমাজতন্ত্র মানুষের প্রকৃতির বিশেষ রূপান্তর ঘটাতে পারেনি। পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে যৌন জীবনের দৃশ্য প্রায় এক প্রকার।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ করতে পারি। সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা মার্কসীয় মহলে স্বীকৃত হয় না, যেহেতু মার্কস্ ও এঙ্গেলস ম্যালথাসের জনসংখ্যা-মূলক প্রকল্পকে ব্যঙ্গ করতেন। এই দুই মনীষী অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে জনসংখ্যার প্রভাব অস্বীকার্য নয়। সমসাময়িক কালে একেবারেই নয়। জনসংখ্যা স্ফীতিকে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই নয়, সমাজ-বাদী দেশগুলিতেও ভীতির দৃষ্টি দিয়ে দেখা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সংবাদ

অনুসারে সমাজতন্ত্রী চীনদেশে শহরে ও পল্লীতে ব্যাপকভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় অনুসৃত হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে দুটির অধিক সন্তান কাম্য নয়,—এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী এই অঞ্চলে প্রসারিত হচ্ছে। অথচ তাত্ত্বিক অনুশীলনে জনসংখ্যার সমস্যা স্বীকৃতি পায়নি। এতে সূচিত হয় থিওরী ও আচরণের অসামঞ্জস্য,—যা সামাজিক চিন্তায় মোটেই কাম্য নয়। [Engels's letter to F.A. Lange, 1865 ; Marx's letter to Schweitzer, 1865 ; Problems of Communism, Sept.-Oct., 1971, The New Face of Maoist China, T. Durdin, pp. 10-11.]

বর্তমান গ্রন্থের পরিধি সমাজ-সংগঠন ও যৌন-সমস্যায় সীমাবদ্ধ এবং আলোচনা-পদ্ধতি বস্তুতান্ত্রিক ও তথ্যগত। তথ্য পরিবেষণ ও তা থেকে সীমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে এই কারণে যে,—কোন সামাজিক প্রথাকেই তার পরিবেশ থেকে আলাদা ক'রে দেখা চলে না। এক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীকে চরম সত্য মনে ক'রে অন্য গোষ্ঠীর প্রথাকে সমালোচনা করা অসঙ্গত। কোন বিশেষ সময়ের দৃষ্টিভঙ্গীও চরম সত্য নয়, তা দিয়ে অতীতের প্রথাকে নির্ভুলভাবে যাচাই করা যায় না। অতীতের নিয়োগ-প্রথা আমাদের নিকটে রুচিকর নয় বলেই তার উপযোগিতা ছিল না এমন কথা বলা অসমীচীন। সকল প্রথা বা ব্যবস্থা আঞ্চলিক ও সাময়িক প্রয়োজন-প্রসূত। প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত সংস্কার-আন্দোলন সার্থক হতে পারে, কিন্তু নিছক বিদেশীয় অনুকরণ আঞ্চলিক সমস্যাকে ভাল ক'রে না বুঝে অনেক ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে মাত্র।

(১) পরিবার

পরিবারের তাৎপর্য

'পরিবার' কথাটি বাংলা ভাষায় ফ্যামিলির বাচক। সংস্কৃত কুল ঠিক পরিবার নয়, কুল হচ্ছে কখনও কখনও গোত্রের বা clan-এর সমার্থক, কখনও বংশের বা lineage-এর সমার্থক। বৈদিক গোত্রে শুধু পিতৃধারার গণনা হয় মাতৃধারাকে বাদ দিয়ে। আর্য বংশধারাও শুধুমাত্র পিতৃধারা। গোত্র একধারাবিশিষ্ট সংগঠন—unilateral group ; আর্য বংশও একজাতীয় সংগঠন। গোত্রের পৈত্রিক ধারাটি প্রমাণযোগ্য নয় ; বংশের পৈত্রিক ধারাটি প্রমাণযোগ্য এবং কতকটা ঐতিহাসিক সত্যতা-যুক্ত। পরিবার হচ্ছে দ্বিধারা-বিশিষ্ট সংগঠন (bilateral group), যার মধ্যে পিতৃধারা ও মাতৃধারা

স্বীকৃত হয়। অমুক ঐ পরিবারের লোক, এর মানে সে একজনকে পিতারূপে এবং একজনকে মাতারূপে স্বীকার করে।

(ক) প্রাথমিক পরিবার (elementary family বা primary family বা nuclear family) স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক সন্তান নিয়ে গঠিত। এই হিসাবে পরিবার জৈব সংগঠন বা সন্তান উৎপাদন-কারী সংগঠন। পরিবারে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের যৌন সঙ্গী (spouses বা mates)। তাদের সন্তানেরা তাদের সঙ্গে যুক্ত। সন্তান যদি দত্তক হয়, তাহলে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের জৈব সম্বন্ধ থাকে না, শুধু সামাজিক সম্বন্ধই থাকে।

(খ) আধুনিক সমাজবিদরা—সোয়ানটন, ম্যালিনাউস্কি, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন, লাউই—বলেন যে, প্রাথমিক পরিবার একটি সর্বগোষ্ঠীগত সংগঠন। পরিবার-বিহীন কোন গোষ্ঠী কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেখানে ক্ল্যান বিকশিত হয়নি, সেখানেও পরিবার আছে। ক্ল্যান-বিহীন পরিবার-প্রথা-যুক্ত গোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত :—(১) আন্দামান-বাসী ;

(২) কোচিনের কাদার ;

(৩) টিয়েরা ডেল ফুয়েগো অঞ্চলের ইয়াঘান (yaghan)।

অতি নিম্নস্তরের সংস্কৃতি-যুক্ত গোষ্ঠীতেও পরিবার-প্রথার অস্তিত্ব বিষয়ে সংবাদ পাওয়া যায়। যথা, মাতৃধারাবিশিষ্ট ক্ল্যান-যুক্ত সিংহলের বেদ্দ (vedda) গোষ্ঠী খাদ্য সংগ্রহের পর্যায়ে পড়ে রয়েছে, কিন্তু এদের ভিতরেও পরিবার-প্রথা রয়েছে।

(গ) আদিম গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, এমন কি আমাদের সমাজের প্রসঙ্গেও পরিবার সংক্রান্ত আলোচনায় বাঁধাধরা চলতী ধারণা খুব কার্যকরী নয়। আদিম সমাজে তথা আমাদের সমাজের আনাচে কানাচেও বিবাহ-সংস্কার-বিহীন দম্পতী চোখে পড়ে। বহু ক্ষেত্রে অবিবাহিত নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর অনুরূপ আচরণ, সন্তান-প্রীতি, সন্তান-পালন, পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা, কর্তব্যবোধ প্রভৃতিতে পারিবারিক চিত্রই ফুটে ওঠে। বঙ্গ-দেশীয় রক্ষিতা-সম্পর্ক বহুস্থলে পরিবারের বৈশিষ্ট্য-যুক্ত। হালের কোন কোন ফরাসী শিল্পী ও সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে বিবাহ-বিহীন পত্নী-সম্পর্ক, জাতবোষ্টমদের কণ্ঠী-বদল প্রথা অস্থায়ী পরিবারের (pairing family) তাৎপর্য বহন করে।

(ঘ) অনেক সময়ে পরিবারের মূলীভূত দ্বিধারা-নীতি (bilateral principle) পরিত্যক্ত হয়। যথা, পারিবারিক উপাধি বণ্টনের রীতিতে বাঙ্গালী সমাজে পিতার উপাধি সন্তান পায়। চাটুজ্জের ছেলে চাটুজ্জে, বসুর ছেলে বসু, সাহার ছেলে সাহা ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে সাহা বা মণ্ডলরা রায় হয়েছেন, কিন্তু উপাধি পরিবর্তনের কাল থেকে সন্তানেরাও রায়

হিসেবেই গণ্য হচ্ছেন। ইংরাজ সমাজেও স্মিথের ছেলে স্মিথ, ব্রাউনের ছেলে ব্রাউন ইত্যাদি। এই পিতৃনামিক রীতি (patronymic) মাতার দিকটাকে উপেক্ষা করছে। কিন্তু এর দ্বারা মাতৃপক্ষকে একেবারে অবহেলা করার প্রশ্ন ওঠে না। নানাবিধ আচার আচরণে পিতা ও মাতার উভয়ের পক্ষের স্বীকৃতি ফুটে ওঠে। আমাদের সমাজে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে চাটুজ্জের ওয়ারিশ হতে পারে বাঁড়ুজ্জে মাতৃপক্ষের দিক দিয়ে, কোন অনাত্মীয় চাটুজ্জেকে সম্পত্তি প্রদত্ত হয় না।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হোপি গোষ্ঠীতে মাতৃনামিক (metronymic) রীতি। মায়ের নাম সন্তান পায়, এটা পারিবারিক উপাধি (family surname)। কিন্তু ব্যক্তিগত নাম পিতার গোষ্ঠীর কোন রমণীর দ্বারা প্রদত্ত হয়। সুতরাং পারিবারিক জীবনে পিতার দিকটাও বিবেচিত হয়।

উক্ত অঞ্চলের হিদাৎসা গোষ্ঠীতেও মাতৃনামিক রীতি, কিন্তু পিতার দিকটা উপেক্ষিত নয়। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় পিতৃপক্ষের ভূমিকা রয়েছে।

আফ্রিকার পিতৃনামিক থঙ্গা গোষ্ঠীতে পরিবারের গণ্ডীতে মাতুলের বড় আদর, তার মানে মাতৃপক্ষকেও উপেক্ষা করা হয় না। [Primitive Society, R. H. Lowie, 1961, pp. 64, 65]

(ঙ) পরিবার যেখানে ক্ল্যানের অঙ্গীভূত, সেখানেও পরিবারের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট।

অস্ট্রেলিয়ার ক্যারিয়েরা গোষ্ঠীতে প্রত্যেক পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র চালা-ঘর। সেখানে তার আলাদা উনুন, আলাদাভাবে খাদ্য রন্ধনের ব্যবস্থা। স্বামী হয়ত পশু শিকার ক'রে এনেছে, স্ত্রী তরকারি সংগ্রহ করেছে, তা থেকে খাদ্য প্রস্তুত হয় শুধুমাত্র পরিবারের জন্যই।

বিহারের সিংভূমের হো গোষ্ঠীতে কিলি (clan) ও পরিবারের দায়িত্ব পৃথকীকৃত। কিলির দায়িত্ব খাদ্য উৎপাদন। বিভিন্ন ব্যক্তিগত পরিবারের জন্য উৎপন্ন শস্য বিলি করা হয়। পরিবার নিজের সুবিধা অনুযায়ী ভাগের ফসল ভোগ করে। সন্তানেরা পরিবারের অংশ, তারা পিতা মাতার দ্বারা প্রতিপালিত হয়। তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার কিলির উপরে অর্পিত। কোন টাবু (নিষেধ) লঙ্ঘিত হলে তা অপরাধ-রূপে গণ্য হয় এবং অপরাধের বিচারক কিলি পঞ্চ।

উড়িষ্যার শিকার-জীবী খারিয়া গোষ্ঠীতে পরিবারের সভ্য স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানেরা। পিতৃ-আবাসিক (patrilocal) ব্যবস্থা। স্ত্রী স্বামীর ঘরে বাস করে। সাধারণত বিবাহের পরে বসবাসের জন্য স্বামী আলাদা কুটীর নির্মাণ করে। স্বামী পশু বা মৎস্য শিকার করে, স্ত্রী ফলমূলাদি আহরণ করে। এদের ক্ল্যান পিতৃধারাবিশিষ্ট। ক্ল্যানের দায়িত্ব হচ্ছে ভাষা, লোকগাথা,

লোককথা, রীতি নীতি সংরক্ষণ এবং শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ। পরিবার ক্ল্যানের অঙ্গীভূত।

আসামের কৃষিজীবী খাসি গোষ্ঠীতে আদি মাতা থেকে বংশধারা কল্পিত হয়। ক্ল্যান মাতৃধারাবিশিষ্ট। মাতৃধারা রক্ষা করবার জন্য পরিবারে কোন মেয়ে না থাকলে দত্তক কন্যা গৃহীত হয়। আমাদের পিতৃধারায় দত্তক পুত্র গ্রহণের রীতি। খাসি উত্তরাধিকারও মাতৃধারায়, মা থেকে সম্পত্তির মোটা অংশ কনিষ্ঠা কন্যায় সঞ্চারিত হয় (ultimogeniture)। ধর্মরক্ষার ভার কনিষ্ঠা মেয়ের উপরেই। বিবাহ-কালে মাতৃ—আবাসিক রীতি (matrilocal residence)। স্বামী স্ত্রীর ঘরের বাসিন্দা হয়। কিন্তু সুবিধা-মতো বাসের জন্য স্বামী আলাদা গৃহ নির্মাণ করে। মাতৃ-আবাসিক রীতিতে পরিবারে বৃদ্ধা মাতার সঙ্গে বাস করে তার স্বামী, বিবাহিতা কন্যারা ও তাদের স্বামীরা এবং তাদের সন্তানেরা। পুত্রেরা যে যার স্ত্রীর ঘর করতে চলে যায়। পরিবার ক্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত হলেও স্বাতন্ত্র্যযুক্ত।

ব্রেজিলের ক্যানেলা (Canella) গোষ্ঠীতে সন্তানের জন্মকালে পরিবারের স্বাতন্ত্র্য চমৎকার ভাবে ফুটে ওঠে। শিশু ভূমিষ্ঠ হলেই স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী খাদ্যের সংযমাদি (couvade) পালন করে। স্বামী-স্ত্রী সমভাবে সন্তানের জন্মসংক্রান্ত ট্যাবুগুলি পালন করে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান এই ত্রয়ী-যুক্ত পরিবারটিকে গোষ্ঠীর অন্য সকল লোক থেকে স্বতন্ত্ররূপে গণ্য করবার দৃষ্টিভঙ্গী স্ফুট হয়। ক্যানেলাদের মাতৃ-আবাসিক রীতি। বিবাহের পরে স্বামী বধূর ঘরে বাস করে। বধূর ভাগের জমিটুকু চাষ ক'রে জীবিকা নির্বাহ হয়। যৌথ পরিবারের ধরণটি শুধু বাসগৃহে ধরা পড়ে। বাস্তব্য জমিতে সকলের স্বত্ব,চাষের জমিতে প্রত্যেক নারীর আলাদা দখলী স্বত্ব। জীবিকার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নারী তার স্বামী-সন্তানকে নিয়ে আলাদা একক গঠন করে। যৌথ পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিবারকে (individual family) আলাদাভাবে চিনে নিতে কোন অসুবিধা নেই। [Social Organization, R. H. Lowie, 1961, p. 218.]

এই জাতীয় দৃষ্টান্তগুলি থেকে বোঝা যায় যে ব্যক্তিগত পরিবার সর্বত্রই গোষ্ঠীজীবনের মধ্যেও একটা আলাদা সংস্থা।

দ্বিধারা-নীতির সংকোচ

পরিবারের দ্বি-ধারা-নীতিতে সন্তান তার পিতা-মাতা উভয়কেই স্বীকার করে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে দ্বিধারা-নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটে।

যে পরিবারে জন্ম হয় তাকে বলা হয় জন্মগত পরিবার (family of origin)। বিবাহ-জাত পরিবার হচ্ছে উৎপাদক পরিবার (family of

procreation)। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী তার জন্মগত পরিবার ছেড়ে স্ত্রীর ঘর করতে আসে। এটা মাতৃ-আবাসিক রীতি। (খাসি প্রথা, ক্যানেলা প্রথা)। এরূপ স্থলে পরিবার হচ্ছে মাতৃ-আবাসিক (matri-local)।

যে স্থলে স্ত্রী তার জন্মগত পরিবার ছেড়ে স্বামীর ঘর করতে যায়, সেখানে পরিবার হচ্ছে পিতৃ-আবাসিক (patrilocal)। (ওরাওঁ প্রথা, হো প্রথা, খারিয়া প্রথা)।

যে ক্ষেত্রে সন্তান পিতার উপাধি গ্রহণ করে, সে ক্ষেত্রে পরিবার হচ্ছে পিতৃনামিক (patronymic)। (বাঙ্গালী প্রথা, ইংরাজ প্রথা)।

যে ক্ষেত্রে সন্তান মাতার কুল-নাম গ্রহণ করে, সে স্থলে পরিবার হচ্ছে মাতৃ নামিক (metronymic)। (হোপি প্রথা)।

যে ক্ষেত্রে পরিবার মাতৃধারা বিশিষ্ট (matrilineal) ক্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে স্ত্রীর ধারায় সন্তান অন্তর্ভুক্ত হয়, স্ত্রী থেকে কন্যায় উত্তরাধিকার পরিচালিত হয়। (খাসি প্রথা, হোপি প্রথা, জুনি প্রথা)।

যে ক্ষেত্রে পরিবার পিতৃধারাবিশিষ্ট (patrilineal) ক্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত, সে স্থলে সন্তান পিতার ধারায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পিতা থেকে পুত্রে উত্তরাধিকার পরিচালিত হয়। (খারিয়া প্রথা)।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে ধরা পড়ে যে বংশ বা ক্ল্যানের দ্বারা পরিবার-প্রথা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

পরিবার ও বিবাহ

কোন না কোন প্রকার যৌনসম্পর্কের রীতি থেকে পরিবার-প্রথা উদ্ভূত হয়। এই যৌনসম্পর্ক সমাজে অনুমোদিত হলে একে বিবাহ-রূপে গণ্য করা চলে। বিবাহ ও পরিবার অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, উভয় প্রথার মূলে রয়েছে যৌন সম্পর্ক। কিন্তু উভয়ের যৌন তাৎপর্য ছাড়াও অন্যপ্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকরিতা রয়েছে।

একবিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান-মূলক প্রাথমিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য বুঝতে অসুবিধা হয় না।

প্রাথমিক পরিবারের একটি বর্ধিত সংস্করণ বহু-স্ত্রী-যুক্ত পরিবার (Polygynous family)। যেখানে স্ত্রীরা আলাদা আলাদা ঘরে বাস করে, সেখানে এরূপ পরিবার প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি প্রাথমিক পরিবারের সমষ্টি মাত্র। স্ত্রীদের যোগসূত্র স্বামী। (থঙ্গা দৃষ্টান্ত)।

বহু পতিযুক্ত পরিবারও (Polyandrous family) বস্তুত পক্ষে প্রাথমিক পরিবারের বর্ধিত রূপ মাত্র। (খশ দৃষ্টান্ত)।

ছোট আকারের যৌথ বিবাহ কোথাও কোথাও বহুপতিত্ব থেকে বিকশিত হয়েছে। এস্থলে পরিবার হচ্ছে যৌথ বিবাহ-ভিত্তিক এবং স্বামীর সংখ্যা একাধিক, স্ত্রীর সংখ্যাও একাধিক। (টোডা দৃষ্টান্ত, খশ দৃষ্টান্ত)। [Social Anthropology, J. S. Slotkin, 1950, pp. 433-436]

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

পরিবার প্রথার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। যথা :—

(১) সন্তান পালনের প্রয়োজন থেকে স্বামী-স্ত্রী-মূলক পরিবার গঠিত হয়। জীবন ধারণের ব্যাপারেও স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সাহায্য করে।

(২) পরিবারের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র যৌন তৃপ্তি সাধন নয়। এর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনও সার্থক হয়। এই দিক দিয়ে বলা চলে যে পরিবার হচ্ছে একটি যৌন সম্পর্ক, যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটায়।

(৩) পরিবার যৌনতা (Sex)-ভিত্তিক হলেও মূলত একটি অর্থ-নৈতিক একক হিসাবে কাজ করে। অর্থনীতির দ্বারা পারিবারিক হালচাল নির্ণীত হয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অর্থনৈতিক অংশীদার (economic partner)। উভয়ের সম্পর্কে তথাকথিত রোমান্সের অবকাশ নেই বললেই হয়। বাঙ্গালী চাষী পরিবারে স্বামীর চাষ-বৃত্তিকেই যাচাই করা হয় এবং স্ত্রীর তরফে প্রত্যাশিত ধান ভানা, ভাত রাঁধা প্রভৃতি গৃহস্থালীর কর্ম। কিন্তু তাই বলে দাম্পত্য জীবন প্রেম-বর্জিতও নয়।

আবাসিক রীতির দ্বারা দাম্পত্য-সম্পর্ক খানিকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। মাতৃ-আবাসিক রীতিতে স্বামী স্ত্রীর ঘর করে, শ্বাশুরী ও শ্যালিকাদের প্রতি তার বাধ্যবাধকতা থাকে। পিতৃ-আবাসিক রীতিতে স্ত্রী স্বামীর ঘর করে, তাই শ্বাশুরী ও দেবরদের নিকটে তাকে অনুগত হয়ে থাকতে হয়। যথা, উনিশ শতকীয় রুশ রীতি, কিছু কাল পূর্বের চীনা রীতি, জাপানী রীতি, বাঙ্গালী রীতি।

বিশেষ প্রথা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। আর্য প্রথায় স্বামী ও স্ত্রী এক সঙ্গে ভোজন করত না, এখনও হিন্দু প্রথা বহুলাংশে এই-প্রকার। পূর্বেকার দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে স্ত্রীর সহিত ভোজন চালু ছিল (বৌধসূ ১। ১।২।২, ৩)। যুগোস্লাভ কৃষক পরিবারে, আলবেনীয় পশুচারী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সহ-ভোজন নেই।

শিল্পায়নের পূর্বে এবং পরেও বহু দিন পর্যন্ত, যতদিন না ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পুরাপুরি আত্মপ্রকাশ করেছে,—ইউরোপে ঠিক ভারতীয় রীতিতে বিবাহের

পূর্বে অভিভাবকের অনুমোদন আবশ্যকীয় ছিল। ফ্রান্সে অভিভাবক-প্রস্তাবিত বিবাহ চালু ছিল, কনেকে যৌতুক দেওয়ার রীতিও দেখা যেত। ব্যাভেরিয়ায় কৃষকদের মধ্যে বিবাহকে এখনও অভিভাবকেরা নিয়ন্ত্রণ করে। আয়র্লণ্ডেও এই রীতি। বিবাহের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিবেচনাই প্রাধান্য লাভ করত। এই দিক দিয়ে এখনও বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি।

অভিভাবক-পরিচালিত বিবাহে দাম্পত্য প্রেমের অবকাশ থাকে না একথাও বলা চলে না। আদিম কৌমগুলির দৃষ্টান্ত এবং বাঙ্গালীর দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য।

(৪) পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য এর অস্থায়িত্ব। বংশ (lineage) এবং জ্ঞাতি (kin) পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। কিন্তু স্বামীর বা স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সমাপ্তি ঘটে। পরিবারস্থ পুত্র বা কন্যার বিবাহ হলে পরিবারের গঠন বদলায়।

বর্দ্ধিত পরিবার

প্রাথমিক পরিবারের আয়তন বর্দ্ধিত হয়, যদি এর সঙ্গে সন্তানদের পরিবার, সন্তানের সন্তানদের পরিবার যুক্ত হয়। এরূপ স্থলে কয়েকটি ব্যক্তিগত পরিবারের (individual family) সমন্বয় ঘটে। ঈদৃশ পরিবারের সমষ্টিকে বলা হয় বর্দ্ধিত পরিবার (extended family)।

প্রাথমিক পরিবারের সভ্য স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা। বর্দ্ধিত পরিবারের সভ্য (১) স্বামী, স্ত্রী ; (২) বড় ছেলে, বড় বৌ ; (৩) মেঝ ছেলে, মেঝ বৌ ; (৪) বড় ছেলের ছেলে, নাত্‌বৌ ; (৫) মেঝ ছেলের ছেলে মেয়ে ; (৬) বড় ছেলের পৌত্র, পৌত্রী ইত্যাদি।

বর্দ্ধিত পরিবারের একটি রূপ যুক্ত পরিবার (joint family)। যুক্ত পরিবার দুই প্রকার। যথা,—

(১) মাতৃ-আবাসিক যুক্ত পরিবার (matrilocal joint family)। নায়ার পরিবার এই প্রকার।

(২) পিতৃ-আবাসিক যুক্ত পরিবার (patrilocal joint family)। হিন্দু পরিবার এই প্রকার।

হিন্দু যুক্ত পরিবারের কয়েকটি দম্পতী একটি বাসস্থানে সংযুক্তভাবে থাকে। পিতৃ-আবাসিক ব্যবস্থা। বিবাহের পরে পুত্র বাড়ীতেই থাকে। বিবাহিতা বধূ ঘর করতে আসে। মেয়েরা বিবাহিতা হয়ে শ্বশুর বাড়ীতে চলে যায়।

পূর্বেকার যুগোস্লাভ যুক্ত পরিবার ছিল পিতৃ-আবাসিক। এরূপ পরিবারে পুত্রেরা ও বউরা এবং অবিবাহিতা কন্যারা অন্তর্ভুক্ত। বিবাহিতা কন্যারা শ্বশুর বাড়ীতে চলে যেত।

প্রাচীনকালে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলিতে কম-বেশি যুক্ত পরিবার ছিল। রোমীয়দের মধ্যে যুক্ত পরিবারে পূর্ব পুরুষদের আচরিত চর্যা (cult) অনুসৃত হত।

ব্রেজিলের ক্যানেলা গোষ্ঠীতে যুক্ত পরিবারে মাতৃ-আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। বিবাহিত বরেরা বধূদের ঘর করতে আসে। পারিবারিক বাস-গৃহ মহিলাদের পরিচালনাধীন। চাষের জমিতে ব্যক্তিগত দখলী অধিকার দেখা যায়। যুক্ত পরিবারটি প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি ব্যক্তিগত পরিবারের সমন্বয়। (Social Organization, Lowie, pp. 217, 218.)

রক্ত-সম্পর্কিত পরিবার

রক্ত-সম্পর্কিত পরিবারে রক্তের সম্পর্কই অধিকতর আদৃত, দাম্পত্য সম্বন্ধ কতকটা যেন অবহেলিত।

রক্ত-সম্পর্কিত পরিবার (consanguineous family) নিকট রক্তের আত্মীয়দের দ্বারা গঠিত। এক রক্তের আত্মীয়েরা কেন্দ্রবর্তী, তাদের ঘিরে থাকে বধূরা। কিংবা, এক রক্তের আত্মীয়ারা কেন্দ্রবর্তী, তাদের ঘিরে থাকে স্বামীরা। মালাবারের নায়ারদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার ব্যবস্থা ছিল। এরূপ পরিবারের স্থায়িত্বকাল বেশি।

দম্পতী-মূলক পরিবার

দম্পতী-মূলক পরিবারে (conjugal family) দাম্পত্য সম্পর্কই অধিকতর আদৃত। দম্পতী কেন্দ্রবর্তী। স্বামী-স্ত্রীকে ঘিরে থাকে রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়েরা। এ ধরণের পরিবারের সঙ্গেই আমরা সাধারণত পরিচিত। এরূপ পরিবার অস্থায়ী। দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত এর স্থায়িত্ব-কাল।

বর্তমানে শহরাঞ্চলে দম্পতীমূলক পরিবার বেশি সংখ্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রামাঞ্চলে পিতৃ-আবাসিক রক্ত-সম্পর্কিত হিন্দু পরিবার এখনও দেখা যায়। এক্ষেত্রে বধূরা বহিরাগত, তারা স্বামীদের ঘর করতে এসেছে। কোন বধূর বাঁচা মরার উপর পরিবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে না।

যুক্ত-পরিবার

ঋগ্বেদীয় আমলে ব্যক্তিগত পরিবার এবং যুক্ত-পরিবার দুইই ছিল বলে

মনে হয়। বিবাহ-সূক্তে যুক্ত-পরিবারের আভাস পাওয়া যায়। এরূপ যুক্ত পরিবারের সভ্য ছিল স্বামীর পিতা, মাতা; স্বামী, স্ত্রী; স্বামীর ভ্রাতারা ও অবিবাহিতা ভগ্নীরা; স্বামী-স্ত্রীর সন্তানেরা ও নাতিরা। (ঋ ১০।৮৫; অথর্ব ১৪।১; ১৪।২)।

বৌধায়নের সপিণ্ড গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত শুধু পিতৃপক্ষীয় আত্মীয় (agnates),—অর্থাৎ, প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, স্বয়ং, নিজের ভাই, নিজের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র। এস্থলে নিজের উপরের তিন প্রজন্ম (degrees) এবং নীচের তিন প্রজন্ম ধরা হচ্ছে। এই সপিণ্ড গোষ্ঠীর দায় বা সম্পত্তি অবিভক্ত। এই দায় সম্ভবত স্থাবর সম্পত্তি। ঈদৃশ সপিণ্ড গোষ্ঠী বিপুলায়তন যুক্ত-পরিবারের তথা একরক্ত সম্পর্কিত পরিবারের ছবি উপস্থাপিত করছে। (বৌ ধসূ ১।৫।১১।৭)।

বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা টীকা থেকে যুক্ত-পরিবারের নজীর মেলে। মিতাক্ষরার মতে আপৎকাল ব্যতীত স্থাবর-সম্পত্তির দান-বিক্রয়ে পরিবারস্থ সকল সভ্যের সম্মতি আবশ্যক হত। অর্থাৎ, স্থাবর সম্পত্তির যথার্থ মালিক সমগ্র পরিবার। এই মালিকানা ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত (unity of ownership)। তাই দান-বিক্রয়ে ব্যক্তির অধিকার অপরের অনুমোদন-সাপেক্ষ। স্থাবরে তু স্বার্জিতে পিত্রাদি-প্রাপ্তে চ পুত্রাদি-পারতন্ত্র্যম্ এব। (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১১৩,১১৪; Evolution of Law, N. C. Sen Gupta, 1962, pp. 87, 141.)

বাংলাদেশে জীমূতবাহন-বর্ণিত 'দায়ভাগ' ব্যবস্থা চালু ছিল। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যুক্ত পরিবারের কোন ব্যক্তি নিজ স্থাবর সম্পত্তির অংশ দান-বিক্রয়ে অধিকারী। এস্থলে যুক্ত পরিবারেও স্থাবর সম্পত্তিতে ব্যক্তিস্বত্ব প্রতিভাত হয়। এরূপ সম্পত্তিতে শুধু দখল সমষ্টিগত, কিন্তু মালিকানা ব্যক্তিগত (unity of possession)। স্থাবরং যদ্যপি স্বয়মর্জিতম্। অসম্ভূয় সুতান্ সর্বান্ ন দানং ন চ বিক্রয়ঃ। তেন দান-বিক্রয়-কর্তব্যতা-নিষেধাৎ তৎ-করণাৎ বিধ্যতিক্রমঃ ভবতি ন তু দানাদ্যনিষ্পত্তিঃ। (দায়ভাগ ২৮)

মিতাক্ষরার অনুশাসনে উত্তর ভারতের যুক্ত পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হয়েছে। দায়ভাগের দৃষ্টিভঙ্গীতে বঙ্গদেশীয় পারিবারিক আলেখ্য এবং বাঙ্গালীর ব্যক্তিতান্ত্রিকতার ঝোঁকটি স্পষ্টীকৃত হয়েছে। বর্তমানে এই ঝোঁকটি ক্রমবর্ধমান। শিল্পায়নের ফলে যুক্ত-পরিবার ধ্বংসমুখীন এবং ব্যক্তিগত পরিবারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

সমসাময়িক কালে হিন্দু সমাজ বহুদিক দিয়ে পরিবর্তনমুখীন। প্রথমত, সনাতন বর্ণভেদ এখনও টিকে রয়েছে বটে, কিন্তু পূর্বেকার উচ্চ-নীচ স্তর-বিভাগ লুপ্তপ্রায়, যেহেতু সকল জাত্ বা বর্ণ সমান মর্যাদা দাবি

করছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্যবোধ থেকে। সমতল ভেদগুলিও নূতন আকার-প্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত, সামাজিক ব্যাপারগুলিতে সমাজের কর্তৃত্বের পরিবর্তে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এর ফলে ঘটছে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক মনোভাবের প্রসার এবং সামাজিক মনোভাবের সংকোচ। এই রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতার সঙ্গে যেন জড়িয়ে রয়েছে ব্যক্তির দায়িত্ব-মুক্তির একটা ধারণা এবং এরই একটা চরম মূর্তি-রূপে কল্পিত হচ্ছে সমাজতন্ত্রের আদর্শ। রাষ্ট্রের ঘাড়ে সব বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু তাৎপর্য বহন করে না এই আদর্শ। তৃতীয়ত, পূর্বেকার সমাজ-গত যৌথ চেতনা প্রায় বিনষ্ট এবং গড়ে উঠছে নব্যধরণের ব্যক্তিতান্ত্রিকতা। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী শহরীকরণের ও শিল্পায়নের সঙ্গে জড়িত। চতুর্থত, ব্যক্তিতান্ত্রিকতার প্রসার হিন্দু যুক্ত পরিবারের উপর চরম আঘাত হানছে।

বর্তমানে যৌথ পরিবার ভাঙনের মুখে। গ্রামের চেয়ে শহরে এই দৃশ্য অধিকতর প্রকট। গ্রামের সংস্কৃতিতে যুক্ত পরিবার অনেকটা সামঞ্জস্য-পূর্ণ ছিল। গ্রাম্য সংস্কৃতি কৃষি-নির্ভর। কৃষি জমি-নির্ভর। জমি পরিবারের পক্ষে স্থায়ী বন্ধন। এই বন্ধন-সূত্রে অর্থনৈতিক কারণে পিতা ও পুত্রদের একত্রাবস্থান আবশ্যকীয় হত। ভাইয়েরাও জমির সূত্রে একত্র বাঁধা থাকত। পরস্পরের সহযোগিতা জীবন ধারণের প্রয়োজন থেকে অনিবার্য হত। হালের শিল্পায়িত অর্থনীতিতে দৃশ্যপট অন্যপ্রকার।

এক পরিবারের লোকরা বিভিন্ন কারখানায় কাজ গ্রহণ করে। এর ফলে তাদের মধ্যে যোগসূত্র শিথিল হতে থাকে। তাদের বাসস্থানও বৃহৎ পরিবারের উপযোগী নয়, ক্ষুদ্র পরিবারের উপযোগী। এই কারণেই শিল্পাঞ্চলে জ্ঞাতিকুটুম্বের বন্ধন-সূত্র ক্ষীণতর এবং ব্যক্তিগত ছোট ছোট গৃহস্থালী গঠনের দিকেই ঝোঁক প্রবলতর।

শিল্প-শ্রমিকের ও কৃষিজীবীর মানসিক প্রবণতা (ethos) ও আচারাদি (mores) বহুল পরিমাণে পৃথক্। কৃষিজীবীর সংযত যৌনতা, রক্তসম্পর্ক প্রীতি, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি অকল্পনীয় মজুরের জীবনযাত্রায়। কৃষকের পারিবারিক জীবন-গত যৌথ মনোভাবগুলি মজুরের ক্ষেত্রে অসম্ভাবিত। বরঞ্চ রুগ্ন মানসিকতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তার চরিত্র-গত। গ্রামের ও কারখানার পরিবেশের মধ্যে বিপুল ব্যবধান। ট্রেড ইউনিয়নের মজুরীবৃদ্ধির আন্দোলনে যে যৌথ মূর্তি স্ফুট হয় তা শ্রমিকের জীবনযাত্রার পরিচায়ক নয়। বরঞ্চ এরূপ আন্দোলন ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে অনুপ্রাণিত করে।

শহরে ব্যক্তিতন্ত্র গ্রাস করছে ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত যৌথ সংসারগুলিকে। এরূপ নিদর্শনের অভাব নেই পশ্চিমবঙ্গের ছোট-বড় শহরগুলিতে। যুক্ত পরিবারের বিভজন-রূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার। কোন ক্ষেত্রে

পিতা বর্তমানে পুত্রেরা বিভক্ত এবং একই গৃহের বিভিন্ন কক্ষবাসী; প্রত্যেকের জন্য আলাদা চুল্লী (hearth)। কোন ক্ষেত্রে প্রধান ভোজের জন্য হাঁড়ি আলাদা নয়, তবে প্রাতরাশ প্রভৃতিতে স্বাতন্ত্র্য প্রতিভাত। কোথাও দুই ভাইয়ের যৌথ সংসার, এক ভাই আলাদা। কোথাও আয়ের পার্থক্য থেকে যৌথ অর্থনীতিতে ভাঙন দেখা দিয়েছে। কোন কোন দৃষ্টান্তে পৃথক্ অন্নের মূলে রয়েছে খাদ্য-রুচি-গত অমিল কিংবা পান-ভোজনের সময়ের অনিয়ন্ত্রণ। বহু ক্ষেত্রে কর্মস্থলের ভিন্নতা যৌথ সংসারকে ছিন্ন করেছে। ঈদৃশ দৃষ্টান্তের সংখ্যাই সমধিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। এর চরম পরিণতি হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবোধ (alienation—ঠিক পারিভাষিক অর্থে কথাটি এ প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হচ্ছে না)। বিভিন্ন বয়সের পারিবারিক সভ্যদের মধ্যে অসহযোগ, বয়স্ক ও তরুণের অনতিক্রম্য ব্যবধান, পারস্পরিক অসহনশীলতা, ব্যক্তিস্বার্থবাদের অনুসরণ, নব্য ভোগবাদ বা চার্বাকবাদ—সমষ্টিগত চেতনাকে বিনষ্ট করেছে। এতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞাতি-কুটুম্ব-মূলক আত্মীয়তার সূত্রগুলি। আত্মীয়তার বন্ধনকে (kinship bond) ডিঙিয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে নূতনতর বন্ধনগুলি ;—যথা, ক্লাব সমিতি প্রভৃতির বন্ধন, রাজনৈতিক দলের বন্ধন, ট্রেড ইউনিয়নের বন্ধন ইত্যাদি। এই সকল বন্ধনের চেয়ে রক্তসম্পর্কের বন্ধন ছিল অধিকতর বাধ্যবাধকতাযুক্ত এবং আন্তরিকতা-পুষ্ট। আন্তরিক সম্পর্কের চেয়ে বাহ্যিক যোগসূত্রের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াই সমকালীন নৈতিকতার লক্ষ্য-রূপে পরিস্ফুট।

ব্যক্তিগত রোজগারের বিপুল ব্যবধান বা কর্মক্ষেত্র-গত ব্যবধান নূতন ধরণের ব্যক্তিগত পরিবার সৃষ্টিতে প্রেরণা দিচ্ছে। উচ্চশিক্ষিতদের ভিতরে ব্যক্তিতন্ত্রের মাত্রা গগন-স্পর্শী এবং ভয়াবহ মর্যাদার অভিমানের সঙ্গে যুক্ত; এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে রক্ত সম্পর্কের দাবি উপেক্ষিত এবং এর সঙ্গে যৌথ পরিবার একেবারেই সামঞ্জস্যহীন।

যৌথ পরিবারের দোষগুণ সমালোচিত হয়েছে। (১) এরূপ পরিবারে অলস-অকর্মণ্যেরা নিশ্চেষ্ট জীবনযাত্রার সুযোগ পায় এবং পরগাছাদের (drones) সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। (২) এরূপ পরিবারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা সৃজনশীলতা বিকাশপ্রাপ্ত হয় না; (৩) তদুপরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবকাশ যথেষ্ট নয়। একথা না মেনে উপায় নেই যে পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সংযুক্ত গৃহস্থালীতে খণ্ডিত হতে বাধ্য, কিন্তু যৌথ পরিবারের সুযোগ-সুবিধাগুলিও বিবেচ্য। (১) যৌথ সংসার অক্ষম, অযোগ্য ও বেকারদের আশ্রয়-স্বরূপ। (২) এরূপ পরিবার সামাজিক বীমার (social insurance-এর) কিছু কিছু দায়িত্ব সংকীর্ণ ক্ষেত্রে পালন করে। ছাঁটাই, কর্মচ্যুতি, কারখানার বন্ধ-ঘোষণা,

ধর্মঘট, আকস্মিক পীড়া, অপঘাত-মৃত্যু, বার্ধক্য, অপ্রত্যাশিত বৈধব্য প্রভৃতি সমস্যার আংশিক সমাধান করে। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত পরিবারে এরূপ সংকট মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা করে। যে স্থলে সামাজিক বীমা সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রায় ধর্তব্য নয়, সেখানে ঈদৃশ সংকটের সম্মুখীন হতে পারে সংযুক্ত পারিবারিক সংগঠন। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় একথার তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। **কল্যাণ-রাষ্ট্রের সার্থক রূপায়ণ যেখানে সম্ভব হয়েছে,** অর্থাৎ, বেকারভাতা, বার্ধক্যভাতা, স্থবিরাশ্রম, পঙ্গুনিবাস প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছে, এমন কি ধর্মঘট-কালীন ভাতাদানের জন্য অর্থভাণ্ডার গড়ে উঠেছে,—সেখানে ব্যক্তিজীবনের সমস্যাগুলি খুব তীব্র হতে পারে না। **সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও** ব্যক্তিগত সমস্যার বা সংকটের সম্ভাবনা কমে যায়। কিন্তু উন্নতিশীল দেশের সামাজিক কাঠামোয় যুক্ত-পরিবারের সংকট-কালীন কার্যকরিতা অস্বীকার্য নয়। (৩) যুক্ত-পরিবারে ব্যক্তির তরফে নিরাপত্তাবোধ (sense of security), ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিশ্চিন্ততাবোধ সহজায়ত্ত। অপর পক্ষে ব্যক্তিগত পরিবারে নিরাশ্রয়তাবোধ, অসহায়তাবোধ অনিবার্য।

যুক্ত-পরিবারের সনাতন আকৃতিতে family commune বা পারিবারিক যৌথতন্ত্রের যে রূপায়ণ দেখা যায় তা নারীসভ্যাদের পক্ষে অনুকূল হয় নাই, যেহেতু শ্বশ্রূ-শাসন, বধূ-নির্যাতন, অনবসর রন্ধন-গৃহ, পুরুষ-প্রাধান্য স্বাভাবিক মানবীয় শ্রম-বিভাগকে ও ন্যায়-নীতিকে অপহৃত করেছে। কিন্তু যে শিল্পায়িত শহুরে সমাজ "ব্যক্তিকে আবিষ্কারের" বড়াই করে, অর্থাৎ, ব্যক্তিতন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা, তার গর্ভজাত শিশুটি দম্পতী-মূলক (conjugal) পরিবার। এরূপ পারিবারিক ব্যবস্থাতেও, যেখানে অর্থাগম প্রয়োজনের অতিরিক্ত, সেখানে পান-দোষ ও স্বেচ্ছাচার দাম্পত্য সম্পর্ককে কলুষিত করছে। সমাজের উপরতলায় এই দৃশ্য। একেবারে নীচ তলায় দারিদ্র্য-জনিত পরিস্থিতি মদের গেলাসকে আশ্রয় করেছে; এই সামাজিক স্তরের উন্নতিবিধান সময়-সাপেক্ষ। মাঝের স্তরে যুক্ত-পরিবারের অস্তিত্ব এখনও দৃষ্ট হলেও তার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়। অহমিকা বা ব্যক্তিত্বচর্যা নরনারীর মধ্যে সহযোগিতার নীতিকে পর্যুদস্ত করছে। আত্মস্বার্থ ও পরস্বার্থের সমন্বয় বর্তমানে চিন্তার অনধিগম্য এবং নূতন দৃষ্টিতে—(১) নিজ অধিকার অপরের অধিকারের পূর্বে বিবেচ্য; (২) নিজ কর্তব্য অপরের কর্তব্যের পরে বিবেচ্য। প্রাচীন ভারতীয় নৈতিকতায় কর্তব্যকে বলা হত ঋণ বা ধর্ম, যথা, অধ্যয়ন দ্বারা ঋষি-ঋণ শোধ হয়; যজ্ঞ দ্বারা দেব-ঋণ শোধ হয়; ব্রাহ্মণের ধর্ম অধ্যাপন; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অস্ত্র-চর্চা; মনু ৪।২৫৭; বিষ্ণু ২'৪। এই নৈতিকতায় অধিকার বোধকে তুলে ধরা হয়নি। আধুনিক নৈতিকতায়

অধিকারবোধ হয়েছে অগ্রে বিবেচ্য এবং কর্তব্য-প্রসঙ্গ অবহেলিত। এই আলেখ্যই মূর্ত পারিবারিক জীবনে।

[দিগ্‌দর্শনী :

আধুনিক শিল্পায়িত সমাজের,—Industrial society'র—ধারণা প্রতিপাদিত হয়েছে কোম্‌ত্‌ (Comte)-এর চিন্তাধারায়। শিল্পায়িত সমাজের বৈশিষ্ট্য শিল্পায়ন, শহরীকরণ, গৃহ ও কর্মস্থানের পার্থক্য, যুক্ত পরিবারের বিলোপ, ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিগত পরিবারের ক্রমিক সংখ্যাবৃদ্ধি। প্রাচীন সমাজে কৃষিজীবীদের সঙ্গে তুলনায় শহরবাসীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। বর্তমানের দৃশ্য ভিন্ন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা সাত বা আট ভাগ কৃষিকাজে নিযুক্ত এবং পশ্চিম জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা দশভাগ কৃষিতে নিযুক্ত। শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শহর ও শহরবাসীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য welfare state বা কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা। আয়-করের সহায়তায় জন-কল্যাণ সম্ভাবিত হচ্ছে। বর্তমানে ব্রিটেনের প্রত্যেকটি কোম্পানি গড়ে মুনাফার অর্দ্ধভাগ সরকারকে দেয় আয়-কর হিসেবে। সমাজ-কল্যাণ, পেন্‌সন, সামাজিক বীমা, জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রভৃতির দ্বারা মজুরী-জীবীদের অবস্থার উন্নতি সাধিত হচ্ছে। পশ্চিম ইউরোপে দৈনিক শ্রমের সময়-হ্রাস, সপ্তাহে দুইদিন ছুটি, বেতন-সহ বার্ষিক ছুটি, শিক্ষালাভের সুবিধা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ প্রভৃতি মজুরদের উন্নতির সূচক। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মজুরদের ক্রমিক দুর্দশা হতে বাধ্য —এই মার্কসীয় প্রবচনটি বর্তমানের কল্যাণ-রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।—The Challenge of Democracy, John Strachey, 1964, pp. 10-15 ; Ideology and Development, Raymond Aron, 1964, pp. 3-5.]

বহুপতিযুক্ত পরিবার

উত্তর প্রদেশের পাহাড়িয়া কৌমগুলির বহুপতিযুক্ত পরিবার (polyandrous family) বিষয়ে নৃবিজ্ঞানী ডি. এন. মজুমদার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। দেরাদুন জেলার জৌনসর অঞ্চলে খশদের বাস। তাদের ভিতরে বহুপতিত্ব প্রচলিত। সাধারণত খশ পরিবারে কয়েক ভাইয়ের যুক্তভাবে এক স্ত্রী কিংবা কয়েক ভাইয়ের যুক্তভাবে দুই স্ত্রী অথবা তিন স্ত্রী দৃষ্ট হয়। ভাইয়েরা সহোদর বা বৈমাত্রেয় হতে পারে। বহুক্ষেত্রে ভাইদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান খুব বেশি হয়, যৌথ স্ত্রী (common wife) ও সর্বকনিষ্ঠ স্বামীটির মধ্যেও বয়সের খুব ফারাক থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ

স্বামীরা বয়সে এত ছোট যে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীর দ্বারা তারা পালিত হয়। (১) অর্থনৈতিক কারণে সব ভাইয়ের আলাদা আলাদা স্ত্রী বহুস্থলে সম্ভব হয় না। কয়েক ভাই যৌথভাবে এক স্ত্রী নিয়ে থাকে। এতে কোন কোন স্ত্রী বিরক্তও হয়। যে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, তার অন্য ভাইদের সঙ্গে সে যৌন সম্পর্ক পছন্দ করে না, এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাও ভাবে। বিবাহ বিচ্ছেদ (ছুট) খুব সহজ ব্যাপার নয়। (২) খশদের **যৌন নৈতিকতা দ্বিমুখী** (double moral standard)। স্বামীর ঘরে বউর বা রন্তির স্বাধীনতা নেই, তার খাটুনীর জীবন। সে যখন পিতৃগৃহে যায়, তখন সে মেয়ে বা ধ্যন্তি। ধ্যন্তির স্বাধীনতা প্রায় বাধাহীন, সে হামেশাই অবৈধ প্রেমে লিপ্ত থাকে, বিশেষত যদি সে সুন্দরী হয় এবং স্বামীর গৃহস্থালী পছন্দ না করে। বাজগি জাতের (caste) মধ্যে ধ্যন্তিরা নর্তকী ও স্বেচ্ছাচারিণী, কিন্তু রাজপুত ও ব্রাহ্মণ পরিবারে বিপরীত দৃশ্য। (৩) খশ ও ডোম কৌমের মধ্যে বহুপতিত্বের সঙ্গে যৌন স্বেচ্ছাচার বহুক্ষেত্রে জড়িত থাকে। কোন পরিবারে কয়েক ভাইয়ের একটি মাত্র পত্নী এবং পত্নীটি বয়স্কা। ছোট ভাইরা বয়স্কা পত্নীর সঙ্গ পছন্দ করে না, স্বেচ্ছাচারে ব্রতী হয়।

(৪) বহুপতিযুক্ত পরিবারে বয়স্কা স্ত্রী অনেকক্ষেত্রে সপত্নী কামনা করে। সপত্নী বা সতীন (co-wife) এলে তার কাজের লাঘব হবে। স্বামীদের মধ্যে একজনের উপর স্ত্রীর বেশি টান থাকলে সে সতীনের জন্য দাবি তোলে। (৫) একটি পরিবারের বৃত্তান্ত। পাঁচ ভাই। বড় ভাই তিন বউকে ঘরে এনেছে। সে মৃত। মেঝভাইয়ের ঘাড়ে তিন বউ, অন্য তিন ভাই ক্ষুদে নাবালক। মেঝ ভাই তিন বউয়ের সঙ্গে শোয়, কনিষ্ঠা বউকে সে বেশি ভালবাসে, কিন্তু কনিষ্ঠা বউও তার চেয়ে বয়সে বড়। বউদের বেশ মিল্-মিশ্। তারা মেঝ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াও করে না। তবু মেঝভাই পাশের গ্রামে একটি বিধবা মেয়েকে ভালবাসে। কোন এক সময়ে সে পালিয়ে যায় গ্রাম থেকে এবং মনোনীতাকে বিবাহ ক'রে সংসার পাতে।

(৬) খশ সংসারে বড় বউয়ের বিশেষ অধিকার (right) ও সুবিধা-সুযোগ (prerogative) আছে। সতীনের নির্বাচনে তার হাত আছে। সতীন এলে তার সঙ্গে বড় বউয়ের সদ্ভাব, কদাচিৎ অসদ্ভাব দেখা যায়। পুরুষেরা মাঠে চাষ করে, ছাগল-ভেড়ার ঘাস যোগায়। বৃদ্ধ পিতা নাতিকে নিয়ে রঙ্গ-রস করে, বড় ছেলের মাথায় সংসারের ভার চাপিয়ে দেয়। গৃহস্থালীতে মেয়েদের কাজের পরিমাণ খুবই বেশি। বর্ধিষ্ণু পরিবারেও এর ব্যত্যয় নেই।

(৭) বাজগি জাতের মধ্যে বিষম কাজিন বিবাহ (cross cousin marriage), মামাত বোনকে বিবাহ, পিসাত বোনকে বিবাহ, মাতার বৈমাত্রেয় বোনকে বিবাহ, স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শালার মেয়েকে বিবাহ, দুই

ভাইয়ের যৌথভাবে কোন মেয়েকে ও তার পিসীকে বিবাহ, মাতুল কর্তৃক ভাগিনেয়ীকে বিবাহ লক্ষিত হয়। (জৌনসর অঞ্চল)

(৮) "জদি" গ্রামে এক পরিবারে দুই ভাইয়ের যৌথভাবে এক স্ত্রী; দ্বিতীয় পরিবারে এক ভাইয়ের এক স্ত্রী এবং অন্য ভাইয়ের দুই স্ত্রী। তৃতীয় পরিবারে দুই ভাইয়ের এক যৌথ স্ত্রী। চতুর্থ পরিবারেও দুই ভাইয়ের এক যৌথ পত্নী।

(৯) জৌনসর অঞ্চলের একটি বিবরণ অনুসারে **শতকরা ৩১টি মেয়ের এক স্বামী, শতকরা ১২টি মেয়ের এক জীবিত স্বামী (অন্য স্বামীরা মৃত), শতকরা প্রায় ৩১টি মেয়ের দুই স্বামী, শতকরা প্রায় ১৫টি মেয়ের তিন স্বামী, শতকরা প্রায় ৪টি মেয়ের চার স্বামী, শতকরা প্রায় ৫টি মেয়ের পাঁচ স্বামী।** এস্থলে প্রত্যেক মেয়ের আলাদা আলাদা ভাবে স্বামী-সংখ্যা ধরা হয়েছে। (৫৯৩টি মেয়ের বিবরণ)।

৬০৫ টি মেয়ের বিবরণে ৩২০টি মেয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নাই, ২৮৫টি মেয়ের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ১৯৫টি মেয়ের একবার, ৫৮টি মেয়ের দুবার, ২৩টি মেয়ের তিনবার, ৯টি মেয়ের চারবার বা বেশিবার বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। (p. 222, Races and Cultures of India, D. N. Majumdar, 1961.)

(১০) লোহারি গ্রামে ৫৭টি পরিবারের মধ্যে ২৮টি বহু পতিত্ব-যুক্ত; এদের ভিতরে আবার ৬টিতে স্বামীসংখ্যা ও পত্নী সংখ্যা সমান, বাকী-গুলিতে স্বামী সংখ্যা বেশি ও পত্নীসংখ্যা কম। ৭টি পরিবার বহু পত্নীযুক্ত (polygynous), যেখানে এক স্বামীর একাধিক পত্নী। ২২টি পরিবারে এক স্বামী ও এক স্ত্রী এবং সন্তানেরা।

লোহারি গ্রামের ২৯টি রাজপুত পরিবারের মধ্যে ২০টি বহু পতিত্ব-যুক্ত। যৌথ বিবাহের (group marriage) দৃশ্য ২০টিতেই;—৪টিতে সমসংখ্যক স্বামী ও স্ত্রী, ১৬টিতে বিষম সংখ্যক স্বামী ও স্ত্রী। ৫টি পরিবার বহু স্ত্রীযুক্ত। ৪টি পরিবারে এক স্বামী ও এক স্ত্রী-মূলক দাম্পত্য সংগঠন (monogamy)।

লোহারি গ্রামের কোল্টাদের মধ্যে ৮টি পরিবার বহু পতিযুক্ত। এদের মধ্যে দুটিতে সমসংখ্যক স্বামী ও স্ত্রী। দুটি পরিবার বহু স্ত্রীযুক্ত। ১২টি পরিবারে এক স্বামী ও এক স্ত্রী-মূলক সংগঠন।

কোন ক্ষেত্রে পিতা বহু পতিত্ব-যুক্ত পরিবারের অন্যতম স্বামী, পুত্র দ্বি-স্ত্রী-বিবাহ কারী। কোন দৃষ্টান্তে পিতা বহু স্ত্রীবিবাহকারী; পুত্রেরা একটি স্ত্রীকে যৌথভাবে গ্রহণ করেছে। [Ibid., pp. 224, 225.]

এস্থলে লক্ষণীয় যে একই অঞ্চলে একই গোষ্ঠীতে বহু পতিবিবাহ,

বহু স্ত্রীবিবাহ ও একবিবাহ রীতি পাশাপাশি বিরাজ করছে। (তুলনীয় তিব্বতী ও এস্‌কিমো দৃষ্টান্ত)।

নায়ার পরিবার

নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ, নায়ার, তিয়া প্রভৃতি জাত্ (caste) মালাবার অঞ্চলে (কেরল রাজ্যে) বাস করে।

(১) নম্বুদ্রী রীতি হচ্ছে জ্যেষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকার (primogeniture)। নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই জমিদার বা জায়গীরদার। এদের ভিতরে প্রায় সবাই শিক্ষিত। পরিবারে বড় ছেলেই সম্পত্তির অধিকারী হয়। অন্য ছেলেরা জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকে। বড় ছেলে সম্পত্তিবান্, তাই ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতে তারই অধিকার স্বীকৃত। অন্য ছেলেরা সম্পত্তিহীন, তাই ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতে পারে না। বিশেষ ক্ষেত্রে ছোট ছেলেরা হয়ত স্বতন্ত্র রোজগারের পথ বেছে নেয় কিংবা অন্য জাতের ধনী ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ ক'রে সংসার পাতে।

নম্বুদ্রী জাতের মধ্যে বড় ছেলে বাদে অন্য ছেলেদের স্বাভাবিক বিবাহ হয় না, এর ফলে মেয়েদেরও বহুক্ষেত্রে বিবাহ হয় না। ব্রাহ্মণ কন্যারা চিরকুমারী থাকতে বাধ্য হয়, তাদের কারও কারও পদস্খলনও হয়। ইদানীন্তন কালে নম্বুদ্রী ছেলের সঙ্গে নম্বুদ্রী মেয়ের শাস্ত্রীয় বিবাহ দেওয়ার আন্দোলন হয়েছে।

বহু নম্বুদ্রী কুমারী বিপথগামিনী হয় না, কিন্তু কিছু সংখ্যক হয়। ভ্রষ্টারা ব্রাহ্মণগৃহে স্থান পায় না, তারা তিয়া জাতের মান্নানারের বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করে। তিয়ারা অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য। ইউরোপীয়দের উপপত্নী হত কোন কোন তিয়া মেয়ে। তিয়ারা নায়ারদের ধোপার কাজ করে। ঋতুমতী নায়ার মেয়ের কাপড় কেচে দেয়।

(২) অবিবাহিত নম্বুদ্রী ছেলেরা নায়ার কন্যার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এই যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধম্ বিবাহ-প্রণালী-রূপে বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে পরিদর্শন করে, স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করে না। (সম্বন্ধম্—visiting marriage)।

নম্বুদ্রী পতি নায়ার স্ত্রীর হাতের অন্নজল পর্যন্ত খায় না। তাই পতি পত্নীর সম্পর্ক শুধু যৌন সংসর্গকালে আবদ্ধ। বিবাহজাত সন্তানের দায়িত্ব নায়ার পত্নী গ্রহণ করে।

নায়ার সমাজে মাতৃধারায় বংশগণনা, মাতৃধারায় উত্তরাধিকার (মা থেকে মেয়েতে), অভ্রাতৃমূলক বহুপতিত্ব (non-fraternal polyandry), ভ্রাতৃমূলক বহুপতিত্ব (fraternal polyandry), বহু পতিমূলক পরিবার

(polyandrous family),রক্ত সম্পর্কিত পরিবার (consanguineous family, যেখানে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের প্রাধান্য) পরিলক্ষিত হয়। মাতৃ-আবাসিক যুক্ত পরিবার (matrilocal joint family) দেখা যায়। কন্যারা বিবাহের পরে বাসস্থান ছেড়ে যায় না, তারা মাতার সঙ্গে থাকে। গৃহকর্তা মাতুল। পিতার ও পতির কোন প্রাধান্য নেই। জমির মালিকানা জননী থেকে কন্যায় সঞ্চারিত হয়। বর্তমানে এই প্রথার পরিবর্তন হয়েছে।

কোন নায়ার জাতের লোক ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করার অধিকারী নয়। শুধু মাত্র অবিবাহিত নম্বুদ্রী পুরুষ ও নায়ার কন্যার সহবাসকালে এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। এরূপ সহবাস-জাত সন্তান পরিপালনের দায়িত্ব নায়ার পত্নীই গ্রহণ করে।

একটি বিবরণ অনুসারে নায়ারদের মধ্যে ভ্রাতৃ-মূলক বহুপতিত্বই প্রচলিত। কিন্তু অনেকেই বলেন যে এদের ভিতরে অভ্রাতৃ-মূলক ও ভ্রাতৃমূলক উভয় প্রকার বহুপতিত্বই চলতী। সব স্বামীর সঙ্গে নায়ার স্ত্রী যুগপৎ যৌন সম্পর্ক রক্ষা করে না। কিছুদিন একজনের সঙ্গে, তারপরে আর এক স্বামীর সঙ্গে সংযুক্তা থাকে। এক স্বামীর সঙ্গে যখন তার সংযোগ-কাল চলতে থাকে, তখন অন্য স্বামীরা তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার অধিকার পায় না।

নায়ার ছেলের সঙ্গে নায়ার মেয়ের নামে মাত্র বিবাহ, অবিবাহিত নম্বুদ্রী পুরুষের সঙ্গে নায়ার কন্যার যৌন সম্পর্ক, নায়ার কন্যার বহুপতিত্ব বিষয়ক বিবিধ বিবরণ প্রচারিত হয়েছে।

(৩) নায়ারেরা আদিম গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্তর-ভুক্ত নয়। নায়ার মাতৃতান্ত্রিক পারবার আঞ্চলিক এককও (territorial unit) বটে এবং তরবদ নামে পরিচিত। এর পরিচালক পুরুষকে বলা হয় করনবন। কয়েকটি তরবদ নিয়ে গঠিত একটি তর। কয়েকটি তর নিয়ে একটি নদ্ গঠিত। কয়েকটি নদ্ নিয়ে সিমে গঠিত। (Tarawad, Tara, Nad, Sime.)

(৪) কেরলের রাজবংশে জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়ের উত্তরাধিকার প্রথা (মরুমক থায়ম্ প্রথা) প্রচলিত। পুত্রের পরিবর্তে ভাগিনেয় এক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হয়।

(৫) দাক্ষিণাত্যের টোডা (Toda), কোটা (Kota), তিয়া (Tiyans), নায়ার প্রভৃতি গোষ্ঠী বহুপতিত্ব-যুক্ত। এরূপ গোষ্ঠীতে জৈব পিতৃত্ব বিচার্য হয় না, সামাজিক পিতৃত্বই আদৃত। নায়ারদের মধ্যে সামাজিক পিতা, উত্তর প্রদেশের খশদের মধ্যেও সামাজিক পিতা দৃষ্ট হয়।

[Ibid., pp. 143, 144, 200-203 ; মানব সমাজ, রাহুল

সাংকৃত্যায়ন, সুবোধ চৌধুরী-কৃত অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ১৩৬৮, পৃ৪৬-৪৮ ; প্রাচীন ভারতে নারী, ক্ষিতি মোহন সেন, ১৩৫৭, পৃ৮২, ৮৩ ; Mother Right in India, O. R. Ehrenfels, 1941, p. 54.]

আধুনিক পরিবার

(ক)

১৯২০ সালে রুশিয়ায় আলেকজান্দ্রা কোলোণ্টাই বলেছিলেন,—"পূর্বে যেমন পরিবারের আবশ্যকতা ছিল, বর্তমানে রাষ্ট্রের পক্ষে পরিবার তেমন প্রয়োজনীয় নয়।" তাঁর মতে শ্রমিক পরিচালিত রাষ্ট্রের পক্ষে নূতন যৌন সম্পর্ক-বিশিষ্ট পরিবার আবশ্যক, যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শ্রমিক এবং উভয়েই স্বাধীন। ১৯৬৭ সালের একটি আনুমানিক হিসাব অনুসারে সোভিয়েট দেশের শ্রমিক-শক্তির অর্দ্ধাংশই নারী। শুনা যায় যে বর্তমান চীনদেশে শ্রমিক শক্তির শতকরা ৩০ বা ৪০ জন নারী।

১৯৫৫ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহিতা নারীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ছিল কর্মে নিযুক্ত। বিবাহিতা মেয়েরা ক্রমশ অধিক সংখ্যায় ঘরের বাইরে চাকরী নিচ্ছে। ইংলণ্ড ও ওয়েলস সম্বন্ধীয় একটি সংবাদে বিবৃত হয়েছে যে বিবাহিতাদের মধ্যে চাকুরিয়ার সংখ্যা ক্রম-বর্ধমান এবং চাকরী গ্রহণের হার সবচেয়ে বেশি ২০-২৫ বৎসর বয়স্কাদের ভিতরে; (১৯১১-১৯৫১ সালের সমাচার।) বর্তমানের ঝোঁক অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে পরিণয়ের দিকে। চাকরী করার ফলে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সমান মর্যাদা প্রায় স্বীকৃত।

প্রাক্-শিল্প যুগে ইউরোপে রক্ত-সম্পর্কিত যুক্ত পরিবারের প্রচলন ছিল, কিন্তু শিল্পায়নের ফলে দম্পতী-মূলক ক্ষুদ্র পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে। চীনে ও ভারতেও রক্ত-সম্পর্কিত পরিবার উঠে যাওয়ার পথে এবং ক্ষুদ্র পরিবার গঠিত হচ্ছে। শহুরে সমাজে রক্ত সম্পর্কের প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পায় এবং ছোট পরিবার গড়ে উঠতে থাকে। পূর্বেকার কৃষি-প্রধান গ্রাম্য ব্যবস্থায় "ঘর" কেন্দ্রীভূত সামাজিক একক। ঘরের পরিবেশে আবদ্ধ থাকে ধর্মীয় জীবনের বহুলাংশ, শিক্ষা-জীবন, ক্রীড়ামোদ, অবসর-যাপন ; অর্থাৎ, ঘর-কেন্দ্রিক সামাজিক তথা অর্থনৈতিক জীবন। "ঘর" বা রক্ত-সম্পর্কিত পরিবার প্রয়োজনের তাগিদে কতকগুলি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছিল, যা পুরুষের কর্তৃত্বের বা জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা-পালনের উপর নির্ভরশীল। ইউরোপের গ্রামাঞ্চলে কদাচিৎ গীর্জা নির্মিত হত ; গীর্জার সাংস্কৃতিক ভূমিকা আংশিকভাবে থাকত। বঙ্গভূমিতেও চণ্ডীমণ্ডপ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশ নিত। কিন্তু গ্রাম্য সংস্কৃতিতে মোটামুটি আলেখ্য ঘরের প্রাধান্য। কৃষি, হস্তশিল্প, মানসিক সংস্কৃতির ব্যাপারগুলি ঘরোয়া দায়িত্ব। শহুরে সভ্যতায় এই

দৃশ্যপট সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত। ঘরোয়া জীবনকে গ্রাস করছে বহির্জীবন। গৃহস্থালী আর আকর্ষণ-কেন্দ্র নয়। ইস্কুল, কলেজ, অফিস, ক্লাব, সংঘ, সমিতি, রাজনৈতিক দল প্রভৃতির আবির্ভাবের ফলে বহির্জীবন হয়েছে আবশ্যকীয়, তা ঘরের বাধ্যবাধকতাকে বিনাশে উদ্যত। যুক্ত পরিবার প্রায় বিলোপ-মুখীন। ক্ষুদ্র পরিবার আধুনিক প্রয়োজনের উপযোগী। কিন্তু এরূপ পরিবারেও স্ত্রীলোকের ভূমিকা চাকরীতে প্রবেশের প্রেরণায় গৃহবন্ধন সংরক্ষণের অনুকূল নয়। ঘরোয়া জীবনের তুলনায় বহির্জীবনের পরিমাণ ও গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে শৈথিল্য এসেছে। আমেরিকায় শহুরে পরিবারগুলির শতকরা প্রায় পঞ্চাশটিতে সন্তানেরা বাপ-মার সঙ্গে থাকে না। সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্তি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, সন্তানের সংখ্যাল্পতা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিতে আয়ুবৃদ্ধি, গৃহ-কর্মের যান্ত্রিকীকরণ, রন্ধনকর্মের সরলীকরণ,—গৃহস্থালীগত কর্মসূচীকে সংকুচিত করছে। ঘর প্রায় ফাঁকা নীড়ে পরিণত এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে পর্যবসিত। কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা ও সন্তানের নিবিড় সম্পর্কের সুবিধা অপগত ; পিতার চাকরীস্থলের দূরত্ব ও দৈনন্দিন কর্মস্থলে গমনের জন্য দীর্ঘ সময়পাত এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করেছে। পারিবারিক আয় কম হলে সন্তানের জননী চাকরীতে প্রবেশ করে। চাকুরিয়া জননীদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের সন্তান ছয় বছরের নিম্ন বয়স্ক। শিক্ষিতা জননীদের চাকরী করবার প্রবৃত্তি অধিক দেখা যায়। ১৯৫৬ সালের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী আমেরিকার জর্জিয়া অঞ্চলে হাই স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র চাকুরিয়া পত্নী কামনা করে না, অন্যদিকে ছাত্রীরা বিবাহের পরে চাকরী করার অভিমত ব্যক্ত করেছে। বেশ বোঝা যায় যে চাকুরিয়া বউ অনেক পুরুষের মনোমত নয়। যে সকল জননীর সন্তানেরা ইস্কুলে গমনের উপযোগী বয়ঃপ্রাপ্ত নয়, সে সব মায়েদের চাকরী গ্রহণের বিরুদ্ধে জনমত রয়েছে। নারীর অর্থার্জন স্ত্রীস্বাধীনতাকে আকারিত করলেও গৃহগত সমস্যা মাথা চাড়া দিয়েছে। ক্ষুদ্র পরিবার, নারীর বহির্জীবন, জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রভাব হ্রাস, যান্ত্রিক জীবন, কৃত্রিম পরিবেশ, দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন, আদর্শগত মতভেদ, স্বামীর ভূমিকা (role) বা স্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণার অনৈক্য থেকে নূতন একটি ব্যাধি আবির্ভূত ; তা হচ্ছে পারস্পরিক অসহনশীলতা। ঈদৃশ ব্যাধির চরম রূপ বিবাহবিচ্ছেদ। ১৯০০—১৯৬০ সালের বিবরণে বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদ-প্রবণতার ক্রমিক বৃদ্ধি পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিপুল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। পূর্বেকার ব্যবস্থায় জ্ঞাতি-সম্পর্কের প্রভাব ও পরিবারের অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কার্যকরিতা দম্পতীকে বিচ্ছিন্ন হতে দিত না। কিন্তু শিল্প-সমাজে পরিবারের কার্যকরিতা খর্ব হওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর বস্তু-গত বন্ধন তথা ভাব-গত

মিল অনেকটা ব্যাহত। স্বামীস্ত্রীর বন্ধন-সূত্র সন্তান ;—আমেরিকায় ১৯৫৮ সালের ১২টি অঞ্চলের বিবাহবিচ্ছেদের পঞ্জী থেকে অবগতি হয় যে বিচ্ছিন্ন দম্পতীদের প্রায় ৪০ শতাংশ সন্তানহীন এবং ২২ শতাংশ এক সন্তান-যুক্ত। সন্তানের সঙ্গে বাপ-মার বন্ধন আলগা হলে স্বভাবতই দাম্পত্য জীবনেও ফাটল ধরে। আমেরিকার গ্রাম অপেক্ষা শহরে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বেশি ; (ভারতেও বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্তগুলি সাধারণত শহরে সীমাবদ্ধ।) এতে প্রমাণিত হয় গ্রাম্য পরিবেশ বা পুরাতন জ্ঞাতিভিত্তিক মানসিকতা পারিবারিক শান্তিরক্ষার অনুকূল। শিল্প-সভ্যতা মানবীয় জীবনকে বহিরঙ্গে সজ্জিত করেছে, কিন্তু তার ভাব-সাম্য অনেকাংশেই বিপর্যস্ত। [Hand-book of Sociology, Ogburn and Nimkoff, 1966, pp. 498-509.]

দ্রষ্টব্য : শিল্পযুগের সূচনায় বিগত একশত বৎসরে হিন্দু সমাজে প্রচুর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। (১) হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইন ১৫নং, ১৮৫৬ সাল ; (২) হিন্দু বিবাহ আইন ২৫নং, ১৯৫৫ সাল ; স্বামীর বা স্ত্রীর একবিবাহ বাধ্যতামূলক, সেকসন ৫ ; স্বামীর বা স্ত্রীর তরফে কারণ প্রদর্শন পূর্বক বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার, সেকসন ১৩। (৩) ১৯৭২ সালের আইনে হাসপাতালে কুমারীর বা বিবাহিতার গর্ভপাত বৈধরূপে স্বীকৃত হয়েছে।

(খ)

সোভিয়েট অর্থনীতিতে নারী সমান অংশীদার। শ্রমিক-শক্তির প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হচ্ছে নারী। অনেক শ্রম-বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে মেয়েরা যোগদান করেছে। ১৯২২সালের আইনে খনিতে নারী শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আইনের বাধা সত্ত্বেও উপযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যার অভাবের দরুণ এই দুষ্ট প্রথা এখনও প্রচলিত, যদিও ব্রিটেনে একশত বৎসর পূর্বেই এরূপ প্রথার নিরসন ঘটেছে। রাস্তায় টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপনের জন্য খনন-কর্ম, কংক্রীটের কর্ম, ব্যবসা, পরিবহণ, নির্মাণ-কর্ম, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতিতে স্ত্রীলোকের শ্রম অপরিহার্য। এ. জি. খার্চেভের বিবরণ অনুসারে শিল্পক্ষেত্রে সাধারণত পুরুষের মজুরী অপেক্ষা নারীর মজুরী কম। সোভিয়েট দেশের আইন অনুসারে নিম্নতম মাসিক মজুরী ৬০ রুবল। কিন্তু ১৯৭০ সালে প্রকাশিত একটি পত্র থেকে জানা যায় যে একজন গ্রাম্য নাপিতানীর মাসিক রোজগার ৪০ রুবল। শ্রমিক পরিবারে প্রয়োজনের তাগিদে নারী অর্থ রোজগারে ব্রতিনী হয়, স্বামী-স্ত্রীর রোজগার মিলিয়ে সংসার চলে : এর ফলে নারীর ঘাড়ে দুতরফা বোঝা চেপেছে ,—চাকরীর বোঝা আর সেই সঙ্গে গৃহস্থালীর কর্ম, যার সামান্য অংশই স্বামী গ্রহণ করে। অতিরিক্ত শ্রমের ফলে নারীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। অধিক সন্তান সে চায় না। অধিকাংশ পরিবারের কাম্য একটি বা দুটি সন্তান, তার বেশি

নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের লক্ষ্যীভূত অধিক সন্তান, তাই গর্ভ-নিরোধক ব্যবস্থাদি সহজলভ্য নয়, এমন কি এরূপ ব্যবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধানের সুবিধা নেই। অবৈধভাবে গর্ভপাতের দিকে ঝোঁক দেখা দেওয়ায় ১৯৫৫ সালে হাসপাতালে গর্ভপাত-করণ বৈধ ঘোষিত হয়েছে। এস্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সোভিয়েট দেশের লক্ষ্য লোকসংখ্যাবৃদ্ধি এবং চীনদেশের সমস্যারূপে বিবেচিত লোকসংখ্যা; তাই চৈনিক সরকার গর্ভনিরোধক ব্যবস্থাগুলিকে জনপ্রিয় করতে চেষ্টিত। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য যাই হোক, ব্যক্তিগত স্তরে পরিবারের ভিতরে সাধারণত সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রবৃত্তি পরিস্ফুট। সম্ভবত শহুরে সমাজের অন্যতম প্রবণতাই হল সীমিত পরিবার সৃষ্টি, যার শর্ত-স্বরূপ অল্পসংখ্যক সন্তান।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বিপ্লবের পর থেকে ধর্মীয় বিবাহের পরিবর্তে সিভিল ম্যারেজ বা আইনী বিবাহ চালু হয়েছে। এরূপ বিবাহের শর্ত পঞ্জীকরণ (registration)। ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে পঞ্জীকরণ বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যকীয় নয়। যে সকল যৌন সম্পর্ক পঞ্জীকৃত হয় না, সে ক্ষেত্রেও বিবাহ সংক্রান্ত অধিকার ও কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে। একটি পরিসংখ্যানে লক্ষিত হয় যে অপঞ্জীকরণের দিকে প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। ১৯৪৫ সালে অবিবাহিত জননীর সংখ্যা ছিল ২৮২,০০০ এবং ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৭০০,০০০। এই সূত্রেই প্রদর্শিত হয়েছে বিবাহ-বিচ্ছেদের হালচাল। লেনিনগ্রাড অঞ্চলে বিবাহ-বিচ্ছেদের শতকরা ২৮ ভাগ দাম্পত্য বিশ্বাস ঘাতকতা-জনিত, শতকরা ২১ ভাগ প্রীতির অভাব-জনিত এবং শতকরা ১৭ ভাগ প্রজননের অক্ষমতা-জনিত।

১৯২৬ সালের আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ সরলীকৃত হয়। দম্পতীর একজন রেজিস্ট্রি অফিসে আবেদন দ্বারা বিবাহ নাকচ করতে পারে। এর ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদের ও তরুণকৃত অপরাধের (delinquency) মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৬ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদের শর্ত হয় স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের আবেদন-পত্র। ১৯৪৪ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদের শর্ত আরও কঠোর করা হয়; গণ-আদালতে (people's court) দশ রুবল ফি-সহ দরখাস্ত-করণ ও উভয় পক্ষের শুনানী আবশ্যক হয়। ১৯৬৫ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদ পদ্ধতির সরলীকরণের ফলে আদালতের কাজে জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় ১৯৬৬ সালে ডাইভোর্সের দ্বিগুণ সংখ্যা-বৃদ্ধি।

বিপ্লবোত্তর-কালীন ব্যবস্থায় (১) স্বামীর সঙ্গে একত্র বাস করতে বা (২) স্বামীর কুল-নাম (surname) গ্রহণে স্ত্রীর বাধ্যতা নাই; (৩) স্বামীর ও স্ত্রীর সম্পত্তি পৃথকীকৃত। ১৯২৬ সালের সংশোধন-আইনে বিবাহ-জাত সম্পত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অধিকার এবং একজন উপার্জন-ক্ষম না হলে তার

ভরণপোষণে অপরজনের দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ঈদৃশ বাধ্যবাধকতা শুধুমাত্র রেজিস্ট্রীকৃত বিবাহের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে পরবর্তী ১৯৪৪ সালের সংশোধন-বিধি। এই বিধানে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা জননীদের অধিকারে কোন তফাৎ করা হয় নাই। এর উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদনে উৎসাহ দান। অনূঢ়া মাতা মাসিক সরকারী ভাতা পায় এক সন্তানের জন্য ৫ রুবল, দুই সন্তানের জন্য ৭.৫ রুবল, তিন সন্তানের জন্য ১০ রুবল। অনূঢ় পিতার নাম সন্তানের জন্ম-পরিচিতিতে (birth certificate) উল্লেখের পূর্ববর্তী রীতি বর্তমানে নাই; সার্টিফিকেটে অনূঢ় পিতা সংক্রান্ত বিবরণ-স্থান শূন্য রাখা হয়। অনূঢ় জনকের নাম বা অর্থে জননীর ও সন্তানদের কোন দাবি নেই। এতে অসংযত পুরুষের যেমন স্ত্রী-সঙ্গ সহজ, তেমনি যে কোন সময়ে সম্পর্কভঙ্গের সুবিধা। পঞ্জীকৃত বিবাহ যেস্থলে বিচ্ছিন্ন হয়, সে ক্ষেত্রেও আবাস সংক্রান্ত সমস্যা আছে। সরকারী আবাস-কক্ষ সহজলভ্য না হওয়ায় বিচ্ছিন্ন স্বামী স্ত্রী বহুস্থলে একই ঘরে থাকতে বাধ্য হয়।

বর্তমানের সোভিয়েট সরকারী নীতিতে সম্ভবত পরিবার নিছক যৌন বন্ধন-রূপে গণ্য, সন্তানের শিক্ষা-কেন্দ্র-রূপে পরিবারের ভূমিকা লুপ্তপ্রায়। যৌথ ভোজনালয়ের ব্যবস্থা দ্বারা পরিবারের দায়িত্ব সংকুচিত। রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতা ও পার্টিকেন্দ্রিকতার নব্য আদর্শ রূপায়ণে পরিবারের স্বতন্ত্র মূল্য মেনে নেওয়া চলে না,—এরূপ ধারণার প্রসার ঘটছে। বর্তমান চীনের কমিউন-গত আদর্শেও কন্‌ফিউসিয়াস-এর বংশরক্ষা ও পিতৃপূজার প্রাচীন নীতি স্বীকৃতি পায় নাই; দেশব্যাপী পেন্‌সন ব্যবস্থার ফলে বৃদ্ধ বয়সে অশন-বসনের জন্য পুত্রের মুখাপেক্ষিতা দূরীভূত হওয়ায় এবং সংকীর্ণ কোয়ার্টারে বৃহৎ পরিবারের অসংকুলানের প্রশ্ন থাকায় ছোটখাটো পরিবারই হয়েছে ঈপ্সিত। চীনদেশেও প্রাথমিক শিক্ষা-স্তর থেকেই সন্তানদের মানসিক গঠনে রাষ্ট্রই দায়িত্ব নিয়েছে এবং পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে ভাব-বন্ধন ছিন্নপ্রায়। অর্থাৎ, সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের এরূপ ব্যাখ্যায় পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব যৌন অর্থ-ব্যঞ্জক মাত্র, কোনপ্রকার আবেগময়তার তাৎপর্য সূচিত করে না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন চাপা পড়ে যায়,—শুধুমাত্র মাসিক বেতন প্রাপ্তি ও সন্তান উৎপাদনের দায়িত্ব পালন দ্বারা মাতৃত্বের সকল প্রয়োজন মিটবে কি? আর একটি প্রশ্ন অসঙ্গত নয়,—যৌথ প্রতিষ্ঠানে সন্তানের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষণ কি সম্ভব? রক্ত সম্পর্ক স্বাভাবিক বন্ধন, অন্যদিকে রাষ্ট্র-গত বা পার্টি-গত বা কমিউন-গত বন্ধন কৃত্রিম এবং বিশেষ স্বার্থ বোধের উৎসজাত। স্বাভাবিক বন্ধনকে এড়িয়ে কৃত্রিম সাংগঠনিক বন্ধন-সূত্র সত্যিকার সামাজিক কল্যাণ সাধনে সক্ষম হবে কিনা চিন্তার বিষয়। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বা রূপায়ণে

এ পর্যন্ত ফুটে উঠেছে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গী। সমাজতন্ত্রের জৈব ব্যাখ্যা (biological interpretation of socialism) থেকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সংক্রান্ত ধ্বনিগুলির আড়ালে অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজনকে প্রচ্ছন্ন রাখবার প্রবৃত্তি কেন এত সজাগ তা বুঝে ওঠা কঠিন। এই ব্যাখ্যায় অতীতের উত্তরাধিকার ভীতির বিষয়-রূপে চিহ্নিত; যথা,—বংশধারা, পূর্বপুরুষদের ইতিকথা, ঐতিহ্য, পরিবারের রক্ত-সম্পর্কিত রূপ (consanguineous form of family), জনশ্রুতি, প্রবাদ, পূর্বতন সংস্কৃতির আবেগময় অংশ। সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষণগুলিতে গড়ে উঠছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার এবং বেশি সংখ্যক পরিবারই ভাঙন-বিমুখ। বৃহৎ পরিবেশ (macro-environment), অর্থাৎ, সমাজ, রাষ্ট্র, পার্টি প্রভৃতি সংগঠন,—ব্যক্তিকে যেন গিলে খেতে চায়, যদিও ব্যক্তির মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত। তাই ক্ষুদ্র পরিবেশ (micro-environment), অর্থাৎ, পিতা-মাতা-যুক্ত পারিবারিক সংস্থা, আত্মীয়-সম্পর্ক, ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের পক্ষে এখন পর্যন্ত বিকল্প-রহিত আবশ্যকীয় উপকরণ।

[দ্রষ্টব্য—Problems of communism, March-April, 1965, The family, B. Rudden, pp. 104-110 ; ibid., July-Aug., 1971, Women in the USSR, Lotta Lennon, pp. 47-58 ; ibid.,May-June, 1969, Housing in the USSR, D. D. Barry and K. Wadekin, pp. 1-14.

The Revolution and its Moral Mission, S. Krapivensky, Moscow, pp. 84-87.]

(২) বিবাহ

বিবাহ-পদ্ধতি

আর্যদের মধ্যে আটপ্রকার, বস্তুত দশপ্রকার, বিবাহ-রীতি (ways of acquiring mates) প্রচলিত ছিল। এই বিবাহ-রীতিগুলির মধ্যে কোন-কোনটি বর্তমানের হিন্দুসমাজে অবলুপ্ত, কোন-কোনটি ভারতীয় বা অভারতীয় কৌমীসমাজে লক্ষিত হয়। এই রীতিগুলি ছাড়াও বিবিধ বিবাহ-প্রণালী বিভিন্ন সমাজে গড়ে উঠেছে। ঈদৃশ বৈচিত্র্যের কারণ গোষ্ঠীগত বা বাহ্য প্রভাব-গত।

পত্নী-নির্বাচনের প্রকারভেদ:

(১) বিনিময় বিবাহ—marriage by exchange ;

(২) বীর্যশুল্কা প্রথা—marriage by a test of prowess ;
(৩) রাক্ষস বিবাহ—marriage by capture ;
(৪) আসুর বিবাহ—bride purchase ;
(৫) দাস্য-বিবাহ—marriage by service ;
(৬) অনুপ্রবেশ-বিবাহ—marriage by intrusion ;
(৭) পরীক্ষামূলক বিবাহ—probationary marriage অথবা trial marriage ;
(৮) কুমারী ব্যূহ হতে পত্নীনির্বাচন ;
(৯) গান্ধর্ব বিবাহ—love marriage ;
(১০) কণ্ঠীবদল—বঙ্গীয় বোষ্টম প্রথা ;
(১১) সাহচর্য মূলক বিবাহ—Companionate marriage.

পতি ও পত্নীর সংখ্যা অনুসারেও বিবাহের আকৃতিভেদ হয়। যথা, বহুবিবাহ (polygamy)। বহুবিবাহ দুইপ্রকার বা তিনপ্রকার। যথা,—
(১) বহুস্ত্রীবিবাহ (polygyny) ;
(২) বহুপতিবিবাহ (polyandry) ;
(৩) যৌথবিবাহ (group marriage), যে ক্ষেত্রে একাধিক স্বামীর ভোগ্যা একাধিক স্ত্রী একই পরিবারের মধ্যে।

দ্বিপত্নী বিবাহ (bigamy) এবং একবিবাহ (monogamy) অধিক ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

বিবাহের ক্ষেত্রে বাছিতা-বিচারও (preferential mating) লক্ষিত হয়েছে। যথা,—উত্তরাধিকার-সূত্রে বিধবা বিবাহ (inheritance of widows), দেবরবিবাহ (levirate), শ্যালিকাবিবাহ (sororate), বিষম কাজিন বিবাহ (cross cousin marriage)।

বিবাহের ব্যাপারে বিশেষ যৌন সম্পর্কের প্রতিষেধ-রীতিও দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। প্রতিষেধের নমুনা বহির্বিবাহ-রীতি (exogamy)। এর বিপরীত রীতি হচ্ছে অন্তর্বিবাহ (endogamy)। অন্তর্বিবাহের নমুনা সমান্তরাল কাজিন বিবাহ (parallel cousin marriage বা ortho-cousin marriage)। অন্তর্বিবাহের আর এক নমুনা সহোদরা-বিবাহ। ট্রাইব-সংগঠন সাধারণত অন্তর্বিবাহ-কারী, কিন্তু ক্ল্যান বহির্বিবাহ কারী। ভারতীয় বর্ণ বা জাত (caste) অন্তর্বিবাহকারী।

বিবাহ-বিহীন যৌন সম্পর্কের প্রকারভেদ :

(১) উপপত্নী প্রথা (concubinage) ;
(২) প্রাক্-বিবাহ স্বেচ্ছাচার (premarital license) ;
(৩) বিবাহোত্তর ব্যভিচার (extramarital sex relations) ;

(৪) অতিথিকে পত্নীর দ্বারা আপ্যায়ন (lending of wife to entertain a guest);

(৫) উৎসব-কালীন স্বেচ্ছাচার (ceremonial license);

(৬) বেশ্যাপ্রথা (prostitution);

(৭) দেবদাসী প্রথা (temple prostitution);

(৮) পত্নী বিনিময় (exchange of wives)।

[Majumdar and Madan, op. cit., pp. 86-92 ; Primitive Society, Lowie, pp. 26-38 ; Elements of Social Anthropology, B. C. Mazumdar, 1936, pp. 87-94 ; Society, R. M. MacIver and C. H. Page, 1953, pp. 240-243.]

অঞ্চলভেদে গোষ্ঠীভেদে বিবাহ সংক্রান্ত লোকাচার, স্ত্রী-আচার বৈচিত্র্য-যুক্ত। বাঙ্গালী হিন্দু বিবাহের বৈশিষ্ট্য স্ত্রী-আচার, যেগুলি অতি প্রাচীন কালের স্মৃতি-বিজড়িত। বাংলাদেশে দিনে বিবাহ-অনুষ্ঠান হয় না, গোধূলিতে বা নৈশ লগ্নে হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দিবা-বিবাহ বিধি-সম্মত। পাণিগ্রহণ-সপ্তপদী গমন বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী বিবাহের অঙ্গীভূত। ইদানীং বাঙ্গালী মেয়েদের নানা কারণে অধিক বয়সে বিবাহ হচ্ছে। কয়েক দশক পূর্বে ঠিক এমনটি ছিল না, বেশ অল্পবয়সেই কন্যা বিবাহ হত। সে সময়কার একটি প্রথা ছিল দ্বিতীয় বিবাহ। বিবাহের পরে যখন বধূর রজোদর্শন হত, তখন **দ্বিতীয় বিবাহ** নামে একটি আচার পালিত হত। এই আচারের অঙ্গ ছিল ঋতুমতী বধূর ব্রহ্মচর্য পালন, ক্ষার-লবণহীন ভিক্ষান্ন ভোজন এবং মহিলা-মহলের অশ্লীল গান। বাংলা বিবাহ-রীতির একটি বৈশিষ্ট্য **"কাল রাত্রি"** পালন। বিবাহের রাত্রে বাসর, পরদিন কাল রাত্রির ব্রহ্মচর্য বর ও কনের তরফে। এর সঙ্গে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীটি জড়িত রয়েছে। বিবাহ-সম্পর্কিত লোকাচারগুলি এখন পর্যন্ত টিকে রয়েছে বটে, তবে শহুরে সভ্যতার আঘাতে এগুলির রূপান্তর বা বিলুপ্তি আসন্ন। [প্রাচীন ভারতে নারী, পৃ২৯, ৪৭-৪৯ ; রঘুনন্দন-ধৃত মনু-বচন, উদ্বাহতত্ত্বম্ ৪]

বিনিময়-বিবাহ বা পাল্টাঘর

বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে বহুকাল ধরে বিনিময়-বিবাহ বা বদল-বিবাহ (marriage by exchange) প্রচলিত। এজাতীয় বিবাহ দুই পরিবারের মধ্যে একটা চুক্তিবিশেষ, যার দ্বারা উভয় পক্ষ কন্যা বিনিময় করে, একপক্ষের কন্যা অন্যপক্ষে বধূরূপে স্বীকৃত হয়। এই প্রথায় উভয় পক্ষই বর-পণ শর্ত থেকে অব্যাহতি পায়। অনেক সময়ে একই গৃহাঙ্গনে যুগপৎ দুইটি বিবাহের

অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এরূপ বিবাহ-জনিত কুটুম্ব-সম্পর্ক (affinal kin) অদ্ভুত ধরণের হয়। শ্যালক-ভগ্নীপতিতে, ননদ-ভ্রাতৃবধূতে কোন তফাৎ থাকে না। [Lat. affinis, বিবাহ সম্পর্কিত।]

উল্লিখিত বিবাহ-প্রণালী প্যালেস্টাইনের আরবীয়দের ভিতরে সমাদৃত। "তুমি আমার ভগিনীকে নাও এবং আমায় তোমার ভগিনীটি দাও"—এই নীতি এরা অনুসরণ করে। কিছু কিছু অস্ট্রেলীয় কৌমের ক্ষেত্রে বদল-বিবাহের রূপটি হচ্ছে উভয়পক্ষেই বিষম কাজিন বিবাহ বা মামাত-পিসাত ভাইবোনের বিবাহ (cross cousin marriage)। "ক" বরটি যদি তার মামাত বোনকে বিবাহ করে, তাহলে তার মামাত ভাই তার ভগ্নীকে, অর্থাৎ, নিজের পিসাত বোনকে বিবাহ করবে।

মেলানেসিয়ায় শ্যালকের সঙ্গে নিজের বোনকে বিবাহ দেওয়ার রীতি রয়েছে বাংলাদেশের ধরণে। [Social Organization, Lowie, pp. 95, 96 ; Social Organization, W. H. R. Rivers, 1932, pp. 74-77.]

বীর্যশুল্কা

প্রাচীন ভারতে বীর্য প্রদর্শন পূর্বক বিবাহের প্রথা ছিল। এ স্থলে বীরত্ব হচ্ছে শুল্ক-সদৃশ। বীর্যশুল্কা সীতাকে লাভ করতে রাম হরধনু ভঙ্গ করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে বীরত্ব প্রকাশের ক্ষেত্র ছিল ধনুক-নিক্ষিপ্ত বাণের দ্বারা লক্ষ্যভেদ। অর্জুন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ ছিল প্রত্যাশিত, কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। [বিষ্ণু ৪।৪।৪২ ; মহা ১।১৮৫।৩৩-৩৬ ; ১।১৮৮। ২০, ২১ ; ১। ১৯৫।২৩]

মধ্য ভারতের ভীল কৌমের মধ্যে বীরত্বপ্রদর্শন পূর্বক বিবাহ-প্রথা পরিলক্ষিত হয়। হোলি উৎসবের সময়ে তরুণ-তরুণীরা একত্র জড়ো হয়ে লোকনৃত্যে অংশ গ্রহণ করে। একটি বৃক্ষের শীর্ষে গুড় ও নারিকেল বেঁধে রাখা হয়। মেয়েরা বৃক্ষটিকে ঘিরে নাচতে থাকে। মেয়েদের ঘিরে ছেলেরা নাচতে থাকে। যে যুবক বধূ লাভে ইচ্ছুক সে মেয়েদের ব্যূহ ভেদ ক'রে গাছে উঠে নারিকেল ভেঙ্গে গুড় সহযোগে খায়। মেয়েরা বধূ প্রার্থীর কেশ টেনে, বস্ত্র ছিঁড়ে বাধা দেয়, ঝাঁটা নিয়ে তাড়না করে। সাহসী বীর এই সব বাধা অতিক্রম ক'রে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায়। ঐ মেয়েদের ভিতর থেকেই সে বধূ নির্বাচন করে। [Majumdar and Madan, p. 88]

রাক্ষস বিবাহ

প্রাচীন ভারতে রাক্ষস বিবাহ বা হরণ পূর্বক বিবাহ-প্রথার কিছু

কিছু নিদর্শন ছিল (marriage by capture)। এরূপ নিদর্শন অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ এবং কৃষ্ণ-কর্তৃক রুক্মিণী হরণ। বর্তমানে কৌমী সমাজে রাক্ষস বিবাহ আনুষ্ঠানিক ভাবে কোথাও কোথাও প্রচলিত। দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী মধ্য ভারতের গোন্দ গোষ্ঠীতে কন্যার পিতার অনুরোধে কন্যা-হরণ আচরিত হয়। মধ্য ভারতের খারিয়াদের মধ্যে কন্যাপ্রার্থী মেলায় বা জমায়েতে অকস্মাৎ কন্যার ললাটে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এটা বিবাহেরই সামিল। [মহা ১।২২০। ৬-৮ ; ৫।১৫৭।১১]

মধ্যভারতের হো কৌমের মধ্যে রাক্ষস বিবাহের নাম ওপোরতিপি (Oportipi)। নাগাভূমিতে নাগাদের মধ্যে এককালে প্রকৃত রাক্ষস বিবাহ আচরিত হত। সাধারণত ভারতীয় কৌমগুলিতে পূর্ব থেকে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক হরণ (Ceremonial capture) হচ্ছে বর্তমান রীতি।

ইউরোপে যুগোস্লাভদের মধ্যে রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত ছিল। নিউগিনির কোন কোন অঞ্চলে বর হরণের প্রথা (groom capture) দেখা যায়। [Social Organization, Lowie, pp. 96, 97]

আসুর বিবাহ বা কন্যাপণপ্রথা

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে আসুর বিবাহের (marriage by purchase বা bride purchase) সর্বাধিক প্রচলন ছিল। পাণ্ডুর সহিত মাদ্রীর বিবাহ আসুরবিবাহের অন্যতম দৃষ্টান্ত। মাদ্রীর সহমরণে সতী প্রথার দৃষ্টান্তও মেলে। [মহা ১।৯৫।৬৪,৬৫ ; ১।১১৩।১৮]

'মদ্ররাজ শল্য ভীষ্মকে বলেছেন যে তাঁর কুলপ্রথাই হচ্ছে শুল্ক গ্রহণ পূর্বক কন্যাদান।' ভীষ্ম শুল্ক দ্বারা তাঁর ভগিনী মাদ্রীকে ক্রয় করলেন। [মহা ১। ১১৩।৫-১৭]

নাগাদের ভিতরে কন্যাশুল্ক হচ্ছে নগদ টাকা বা দ্রব্য। হো গোষ্ঠীতে কন্যাপণ এত বেশি যে বহু যুবক যুবতীর বিবাহ হয় না। যারা কন্যাপণ দিতে পারে না তারা রাক্ষস বিবাহের আশ্রয় নেয়।

প্যালেস্টাইনের আরবীয়দের মধ্যে আসুর বিবাহ চিরাচরিত প্রথা। সেমিটিক গোষ্ঠীগুলিতে আসুর বিবাহ বরাবরই ছিল।

সাইবেরিয়ার কিরগিজদের মধ্যে বাগ্‌দানের (betrothal) পর থেকেই বরের পিতা কন্যাপণ গোধন সংগ্রহ করতে থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার থঙ্গা (Thonga) গোষ্ঠীতে কন্যাপণের নাম লোবোলা (lobola)। কন্যাপণ হচ্ছে গোধন বা কোদালি (hoe)। নিউগিনির কাই (Kai) গোষ্ঠীতে কন্যার মামাকে ও ভাইকে কন্যাপণ-

রূপে দিতে হয় বরাহের দাঁত, বরাহ ইত্যাদি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হিদাৎসা গোষ্ঠীতে কন্যাপণের প্রচলন রয়েছে।

বহুক্ষেত্রে কন্যাপণ (bride price) হচ্ছে যৌতুকের (dowry) সামিল। অর্থাৎ, কন্যাপণের মধ্যে ক্রয়ের তাৎপর্য নেই। বাংলাদেশে বর্তমানে বরপণ আইনত নিষিদ্ধ হয়েও গোপনে চলতী রয়েছে, কিন্তু বরপণ ও যৌতুকের মধ্যে তফাৎ ফুটে ওঠে না। [Primitive Society, pp. 20-22]

দাস্য-বিবাহ

দাস্য বিবাহ (marriage by service) কোন কোন ভারতীয় কৌমের মধ্যে প্রচলিত। মধ্য ভারতের বৈগা গোষ্ঠীতে যে বর কন্যাপণ সংগ্রহ করতে পারে না, সে ভাবী শ্বশুরের গৃহে গতর খাটে। তাকে বলা হয় গহরিয়া। কয়েক বছর পরে প্রার্থিতা কন্যার সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে স্বামী বউ নিয়ে স্বগৃহে প্রস্থান করে।

নেপালী গুর্খারা খশদের সমাজে কারও গৃহে ভৃত্যের কর্মে নিযুক্ত হয়ে কোন খশ মেয়েকে বধূ রূপে লাভ করে। (Majumdar and Madan, pp.89,90)

সাইবেরিয়ার কোরিয়াকদের (Koryak) মধ্যে ভৃত্যের কর্ম দ্বারা বধূ লাভের প্রথা দৃষ্ট হয়। বাইবেলের জেনেসিস অংশে য়িহুদীদের মধ্যে প্রচলিত এ ধরণের বিবাহের আভাস পাওয়া যায়। ইয়াকুব (Jacob) এই প্রকারে বধূ লাভ করেছিলেন।

মাতৃধারাবিশিষ্ট হিদাৎসাদের মধ্যে এ জাতীয় প্রথার সাক্ষাৎ মেলে।

অনুপ্রবেশ-বিবাহ

ভারতীয় কৌমী সমাজে কোথাও কোথাও অনুপ্রবেশ-বিবাহ (marriage by intrusion) চলতী। হো গোষ্ঠীতে এজাতীয় বিবাহের নাম হচ্ছে অনাদর (anader)। অনাদর রীতির তাৎপর্য অবহেলা। কোন অনিচ্ছুক তরুণের প্রতি আকৃষ্টা তরুণী এই রীতিকে আশ্রয় করে। তরুণীটি প্রার্থিত বরের গৃহে নিজেই উপস্থিত হয়ে বাস করতে শুরু করে, লাঞ্ছিতা ও বিতাড়িতা হয়েও সেখান থেকে প্রত্যাগমন করে না। অগত্যা বাধ্য হয়েই প্রার্থিত বর তাকে গ্রহণ করে। [Ibid., 90, 91]

পরীক্ষামূলক বিবাহ

আসামের কুকি সমাজে পরীক্ষামূলক বিবাহ (probationary marriage) লক্ষিত হয়। কন্যার পিতার অনুমোদন সহকারে কোন তরুণ

তাঁর গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করে, কন্যার সঙ্গে মেলামেশা করে। তারপর তরুণ তরুণী যদি পরস্পরকে পছন্দ করে, তবে বিবাহ হয়। একজন অপরজনের অপছন্দ হলে বিবাহ হয় না। [Ibid., p. 87]

বর্তমানে পাশ্চাত্য সমাজে এক প্রকার পরীক্ষণ-মূলক বিবাহ (trial-marriage) বিষয়ে অনুকূল জনমত গড়ে উঠছে। এতে তরুণ-তরুণী পরস্পরের যৌন সামঞ্জস্য পরীক্ষা করে।

কুমারী-ব্যূহ হতে পত্নী-নির্বাচন

প্রাচীন ভারতে নারীর তরফে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল। স্বয়ম্বর সভার ব্যবস্থা করত কন্যার পিতা। সভায় উপস্থিত রাজাদের মধ্যে একজনকে রাজকন্যা স্বামীরূপে বরণ করত তার গলায় মালা পরিয়ে। অর্থাৎ, প্রথাটা রাজকীয় এবং স্বয়ম্বরা হত কন্যা। এরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত, পৃথা বা কুন্তী পাণ্ডুকে বরণ করেন ; দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর অনুষ্ঠিত হয় ; দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-প্রথায় বিবাহ হয়।

বস্তার অঞ্চলের (মধ্যপ্রদেশ) পর্জা বা ধ্রুব গোষ্ঠীতে পুরুষের তরফে পত্নী নির্বাচনের প্রথা (marriage by choice) কিছুদিন পূর্বে প্রচলিত ছিল। একটি ঘরে কন্যার পিতারা তাদের অবিবাহিতা দুহিতাদের রেখে দিত। রাত্রিকালে বিবাহার্থী যুবকেরা ঘরে ঢুকত, কুমারী-ব্যূহ হতে একজনকে পত্নীরূপে নির্বাচন করত। হাত থেকে পিতলের বলয় খুলে নির্বাচিতা কন্যার হস্তে দিত। কন্যার পিতা নির্বাচন-কারীকে বলয়ের সাহায্যে সনাক্ত করত এবং তারপর বিবাহ অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানেও দশহরা উৎসবের প্রাক্কালে কুমারীরা একটি কুটীরে জমায়েৎ হয়, গ্রামস্থ বা পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী যুবকেরা এই কুটীরে এসে নিজ মনোমতো তরুণীর সঙ্গে উপহার-বিনিময় করে, তারপর বিবাহ হয়। এই প্রসঙ্গে বরের পিতা কনের পিতাকে সুরাপাত্র ও চাউল উপহার দেয়। উপহার প্রত্যাখ্যাত হলে বিবাহ হয় না। [মহা ১।১১২।৩-১১ ; ১।১৮৫।১১, ১২ ; ৩।৫৭।১-৯, ২৫,২৬ ; Races and Cultures of India, pp. 190, 191.]

গান্ধর্ব বিবাহ

প্রাচীন ভারতে গান্ধর্ব বিবাহের বেশ প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ এই ধরণের। বাৎস্যায়ন এজাতীয় প্রেম-মূলক বিবাহকে অনুমোদন করেছেন। বর্তমানে পাশ্চাত্য সমাজে কোর্টশিপ (courtship) চলতী। বিবাহের উদ্দেশ্য নিয়ে যুবক-যুবতী পরস্পরের সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত হয় (wooing)। হালের বাঙ্গালী সমাজে কোর্টশিপ-মূলক বিবাহ ঘটছে।

প্রেমের পালাটা ভাবী বর ও ভাবী বধূর ছাত্রাবস্থাতেই অনেক সময়ে অভিনীত হয়। [মহা ১।৭৩।১-২০; কামসূত্র ৩।৫।৩০—অনুরাগাত্মকত্বাৎ চ গান্ধর্বঃ প্রবরঃ মতঃ।]

কণ্ঠী বদল

চৈতন্যোত্তর যুগে বাংলাদেশে বোষ্টম বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা বর্ণ (religious sect বা caste)। এদের মধ্যে কণ্ঠীবদল পূর্বক বিবাহ সংঘটিত হয়। কখনও কখনও বর ও কন্যার অভিভাবকরা বিবাহ স্থির করে। আবার, বর কন্যাকে বা কন্যা বরকে নিজেই নির্বাচন করে। বেশ কিছুদিন পূর্বে সমাজে পতিত ও পতিতারা বোষ্টম সমাজে গৃহীত হত, মালাবদলের ভিতর দিয়ে এরূপ নারী পুরুষের বিবাহ হত।

সহজিয়াদের মধ্যে সাধক-সাধিকা জোড়া বেঁধে থাকত। এরা অবিবাহিত দম্পতীর মতো আচরণ করত। স্বামী সাধনার সঙ্গী, স্ত্রী সাধনার সঙ্গিনী। এদের বিরুদ্ধে অনাচার ব্যভিচারের অনেক অভিযোগ বর্ষিত হলেও এদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না।

সহজ সাধন বা শৃঙ্গার সাধনের অঙ্গীভূত বজ্রোলী মুদ্রা। বজ্রোলী মুদ্রার প্রকারভেদ সহজোলী ও অমরোলী। এই জাতীয় মুদ্রায় ঊর্ধ্বরেতাঃ হওয়ার লক্ষ্য পরিস্ফুট।

মেরুদণ্ডের বামে ইড়া নাড়ী, ডান দিকে পিঙ্গলা নাড়ী, মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ী (spinal cord)। ইড়া জ্ঞানাত্মিকা, পিঙ্গলা কর্মাত্মিকা নাড়ী। ইড়া নাড়ীতে প্রবহমাণ বায়ু ঊর্ধ্বমুখীন, পিঙ্গলায় প্রবহমাণ বায়ু নিম্নমুখীন। সাধারণ মৈথুনে পিঙ্গলা দিয়ে বিন্দু অধোমুখী হয়। বজ্রোলী মুদ্রার সাহায্যে পতনোন্মুখ বিন্দু ইড়া নাড়ীতে আকর্ষিত হয়ে মস্তিষ্কের সহস্রার চক্রে (cortex) আনীত হয়। কাম-বায়ু ডানদিকের পিঙ্গলাপথে নীচে মূলাধার-চক্রে (pelvic plexus) এসে পুনরায় বামদিকের ইড়াপথে চালিত হয়ে সহস্রারে উপনীত হয়। এর ফলে সাধন-কালীন মৈথুনে বিন্দুপাত ঘটে না। পতনোন্মুখ বিন্দু প্রাণায়ামের দ্বারা (পূরক দ্বারা) ঊর্ধ্বে আকৃষ্ট হয়। এই সময়ে শ্বাস গ্রহণ কালে ক্লীং (কামবীজ বা কৃষ্ণ বীজ) মন্ত্র জপ করতে হয়। পূরক হচ্ছে বামনাসায় ইড়ায় শ্বাস গ্রহণ। কুম্ভক গৃহীত শ্বাসের অবরোধ। রেচকের বা শ্বাসত্যাগের স্থান ডান নাসায় পিঙ্গলাতে। প্রাণায়ামের অঙ্গ রেচক, কুম্ভক ও পূরক। কুম্ভকের সহায়তায় কামবায়ু পিঙ্গলা থেকে ইড়ায় এবং ইড়া থেকে পিঙ্গলায় গমনাগমন করে, সুষুম্নামার্গ খুলে যায় এবং অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রস অনুভূত হয়। এই হচ্ছে সহজ সাধন বা

শৃঙ্গার সাধন বা রস সাধনের রহস্য। [হঠযোগ প্রদীপিকা ৩।২৬-৩০; শিবসংহিতা ৪।৭৮-১০৭; pp. 62,63, 78, Post-Caitanya Sahajiya Cult of Bengal, M. M. Bose, 1930.]

জনশ্রুতি অনুসারে সহজিয়া সাধক চণ্ডীদাসের নায়িকা ছিল রামী রজকিনী। রামানন্দ রায়েরও নাকি নায়িকা ছিল। এস্থলে যৌন সম্পর্ক সাহচর্য-মূলক। এর উদ্দেশ্য সাধন-ভজন।

পাশ্চাত্য অঞ্চলে সম্প্রতি একপ্রকার সাহচর্য-মূলক বিবাহ (companionate marriage) প্রচলিত হয়েছে। এতে জন্মনিরোধ ও কাম উপভোগ হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, বিবাহের অঙ্গীভূত কোন সামাজিক উদ্দেশ্য নেই।

বহু বিবাহ

বহু বিবাহ বহু গোষ্ঠীতেই লক্ষিত হয়। বহু বিবাহ (polygamy) দুই প্রকার। যথা,—

(১) বহু পতিবিবাহ (polyandry);

(২) বহু স্ত্রীবিবাহ (polygyny)।

বহু পুরুষ (গ্রীক আনের, aner) যদি এক স্ত্রীর সঙ্গে থাকে, তাহলে বহু পতিত্বের নিদর্শন মেলে। বহু পতিত্ব দুই প্রকার। যথা,—(১) ভ্রাতৃমূলক বহু পতিত্ব (fraternal polyandry); (২) অভ্রাতৃমূলক বহুপতিত্ব (non-fraternal polyandry)।

কয়েক ভাই এক সঙ্গে একটি স্ত্রীকে বিবাহ করলে সকলেই স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কের অধিকারী হয়। এই প্রথার নাম ভ্রাতৃমূলক বহুপতিত্ব। মহাভারতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। এই বিবাহটি ভ্রাতৃমূলক বহুপতিত্বের নিদর্শন। জটিলা গৌতমীর বহু পতিবিবাহ এই জাতীয় কিনা বোঝা যায় না। [মহা ১।১৯৫।২৩; ১।১৯৬।১৪; ১।২০০।১]

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ের মহিষ-পালক গোয়ালা গোষ্ঠী টোডাদের মধ্যে, উত্তর প্রদেশের খশদের মধ্যে ভ্রাতৃমূলক বহুপতিত্ব দৃষ্ট হয়। টোডাদের মধ্যে যে ধনুর্বাণের অনুষ্ঠান করে সেই সন্তানের সামাজিক পিতা (Social father) রূপে গণ্য হয়। আমাদের সাধারণ ধারণায় জৈব পিতা (biological father) ও সামাজিক পিতা একই ব্যক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু কৌমী সমাজে জৈব পিতৃত্বের উপর জোর দেওয়া হয় না, সামাজিক পিতৃত্বকেই মর্যাদা দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে মাতৃধারা বিশিষ্ট নায়ারদের মধ্যে অভ্রাতৃমূলক এবং ভ্রাতৃমূলক উভয় প্রকার বহু পতিত্বই দেখা যায়।

তিব্বতীদের মধ্যে দরিদ্র পরিবারে ভ্রাতৃমূলক বহুপতিত্ব, মাঝারি

অবস্থার পরিবারে একবিবাহ (monogamy) এবং ধনী পরিবারে বহু-পত্নীত্ব (polygyny) চল্‌তী ছিল। [Society, p. 239]

গ্রীণল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলের এস্‌কিমোদের মধ্যে বহুপতিত্ব, একবিবাহ এবং বহুপত্নীত্ব এই তিন প্রকার বিবাহ-প্রথাই ক্ষেত্রবিশেষে অনুমোদন পায়। [Primitive Society, pp. 40, 41, 45]

টোডা এবং এস্‌কিমো বহুপতিত্ব নারী শিশু হত্যার সহিত যুক্ত ছিল। তিব্বতীয় বহুপতিত্ব দরিদ্র পরিবারের ভূসম্পত্তি অবিভক্ত রাখবার প্রেরণা থেকে উদ্ভূত। তিব্বতীদের মধ্যে নারী শিশু হত্যার কোন রেওয়াজ ছিল না।

বাৎস্যায়ন বলেছেন যে "গ্রামনারী" নামক প্রদেশে, স্ত্রীরাজ্যে এবং বাহ্লীক (Balkh, Bactria) অঞ্চলে একজন মহিলার আশ্রিত বহু যুবক অন্তঃপুরেই অবস্থান করে। এস্থলে বহুপতিত্বের আভাস মেলে। [কামসূত্র ২। ৬। ৪৫]

নীলকণ্ঠ বলেছেন যে নীচবর্ণের সমাজে দ্বিপতিবিবাহ ও ত্রিপতিবিবাহ প্রচলিত ছিল। [মহা ১।১০৪।৩৫, ৩৬]

হিমালয় অঞ্চলের কৌমগুলিতে কিছু কিছু বহুপতিত্বের দৃষ্টান্ত এখনও দেখা যায় এবং এদের মধ্যে যৌন শিথিলতা উল্লেখযোগ্য। তবে পরিবার প্রথা এবং সামাজিক পিতৃত্ব সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়।

বহুপতিত্ব যে একটি আদিম বিবাহ-প্রথা একথা বলা যায় না। এরূপ বিবাহের অনুবর্তীদের মধ্যে রয়েছে তিব্বতী, নায়ার, উত্তর ভারতের কিছু কিছু ব্রাহ্মণ-কুল ও রাজপুত-কুল, যাদের সংস্কৃতি আদিম স্তর-ভুক্ত নয়। সিংহলে বহুপতিত্ব প্রচলিত ছিল।

বহুপতিত্ব-যুক্ত গোষ্ঠী :—

(১) মাদ্রাজ রাজ্যের টোডা ও কোটা এবং তিয়া। টোডাদের মধ্যে বহুপতিত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে যৌথবিবাহের (group marriage) চেহারা-যুক্ত। কয়েক ভাইয়ের দুই বা তিন স্ত্রী থাকার সংবাদ ইদানীং পাওয়া যায়।

(২) মালাবারের নায়ার।

(৩) উত্তর প্রদেশের খশ। এদের মধ্যেও বহুপতিত্ব ক্ষেত্রবিশেষে ছোট আকারের যৌথ বিবাহে পরিণতি লাভ করছে।

(৪) তিব্বতী, সিকিম বাসী, লাডাকী বোটা।

(৫) লোহারি অঞ্চলের রাজপুত।

(৬) উত্তর প্রদেশের কোল্টা।

উত্তর প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে পিতা হয়ত বহুপতিত্ব প্রথার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু পুত্রের দুই স্ত্রী, আবার পিতার হয়ত একাধিক স্ত্রী,

কিন্তু পুত্রেরা এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করে। একই গোষ্ঠীতে বহুপতিত্ব ও দ্বিস্ত্রীবিবাহ বা বহুস্ত্রীবিবাহ সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

এই সব নিদর্শন থেকে সূচিত হয় যে বিবাহ প্রথা আঞ্চলিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বহু পতিবিবাহের পরে বহু স্ত্রীবিবাহ, বহু স্ত্রীবিবাহের পরে একবিবাহ বিবর্তিত হয়েছে এই পর্যায় বিভাগ যুক্তিসহ নয়।

দ্বিপত্নী বিবাহ

প্রাচীন ভারতে ধনী ও অভিজাতদের মধ্যে বহু স্ত্রীবিবাহ (polygyny) সাধারণ রীতি ছিল। কিন্তু দ্বিপত্নীবিবাহের নিদর্শনও ছিল। যথা,—

(১) যযাতির দুই স্ত্রী, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী—মহা ১।৮১।৩৬,৩৭ ;৮২।২৪, ২৫

(২) বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী, অম্বিকা ও অম্বালিকা—মহা ১।১০২।৬৫ ;

(৩) পাণ্ডুর দুই স্ত্রী, কুন্তী ও মাদ্রী—মহা ১।১১২।১৩ ; ১।১১৩। ১৮ ;

(৪) ধৃতরাষ্ট্রের এক স্ত্রী গান্ধারী এবং এক বৈশ্যা উপপত্নী—১।১১০।১২ ; ১।১১৫। ৪২, ৪৩ ;

(৫) যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী—বৃহ উপ ৪।৫।১ ;

(৬) ইক্ষাকুবংশীয় সগরের দুই স্ত্রী—বিষ্ণুপুরাণ ৪।৪।১।

এগুলি দ্বিপত্নীবিবাহের (bigamy) দৃষ্টান্ত।

বহু স্ত্রীবিবাহ

শতপথ ব্রাহ্মণে রাজার চারিটি স্ত্রীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা, মহিষী (প্রধান পত্নী বা পাটরাণী), বাবাতা (প্রিয়তমা পত্নী), পরিবৃক্তা (অপ্রীতিভাজনা পত্নী), পালাগলী (দূত পুত্রী)। [শ ব্রা ১৩।৫।২।৫-৮ ; ১৩।৪।১।১]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে রাজা হরিশ্চন্দ্রের শত জায়া ছিল। [ঐ ব্রা ৭।৩।১]

রাজা দশরথের ছিল তিন পত্নী,—কৌসল্যা, কৈকয়ী ও সুমিত্রা। (রামা ১।১৮।১০-১৪)

দশরথ-জাতকের মতে দশরথের ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী ছিল।

যদুবংশীয় বসুদেবের রোহিণী, দেবকী প্রভৃতি বহু পত্নী ছিল। (বিষ্ণু-পুরাণ ৪।১৫।১১)

রোহিণীর পুত্রকন্যা বলভদ্র (বলরাম), শারণ, সুভদ্রা প্রভৃতি। সুভদ্রা অর্জুনের পত্নী। দেবকীর পুত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণ নন্দ-পত্নী যশোদার দ্বারা প্রতিপালিত। জনশ্রুতিতে কৃষ্ণের পত্নী সংখ্যা ষোল হাজারের উপরে। এদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আটজন প্রধান। [বিষ্ণু ৪।১৫।১২-১৯ ; মহা ১।২১৯।১৭]

মহাভারত অনুসারে অর্জুন বহুপতিবিবাহে এবং বহুস্ত্রীবিবাহে

অংশীদার। অর্জুনের ব্যক্তিগত তিন পত্নী সুভদ্রা, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা। [মহা ১।২২০।৭ ; ১।২২১।১৩ ; ১।২১৪।১৮-৩৪ ; ১।২১৫।১৩-২৬]

দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী, সুতরাং ভীমেরও পত্নী। ভীমের আর এক পত্নী হিড়িম্বা। [মহা ১।১৫৫।১৯-২১]

ভীমের দ্বিতীয়া পত্নী কাশী। [বিষ্ণু ৪।২০।১১]

দুষ্মন্তের পুত্র ভরত। ভরতের বহু স্ত্রী ছিল। এই সকল স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রেরা ভরত-কর্তৃক নিন্দিত হওয়ায় ভার্যাদের দ্বারা নিহত হয়। (শিশু-হত্যার নিদর্শন।) ঐ ভার্যাদের ভয় ছিল যে তাঁরা স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্তা হতে পারেন। (স্বামীর স্বৈরতন্ত্রের নিদর্শন।) [বিষ্ণু ৪।১৯।৪]

ভরতের বংশীয় অজমীঢ়ের তিন পত্নী ছিল,—নীলিনী, কেশিনী ও ধূমিনী। (বায়ু ৯৯।১৬৭)

রাজাদের মধ্যে বহু পত্নীত্বের জনশ্রুতি থাকলেও ত্রিবিবাহকারী, দ্বিবিবাহকারী বা একস্ত্রীবিবাহকারী রাজাও ছিলেন। পৌরাণিক বংশ-তালিকায় পত্নীসংখ্যা সর্বত্র উল্লিখিত হয়নি। সব রাজারই একাধিক পত্নী থাকত একথা বলা যায় না নজীরের অভাবে। তবে হিন্দু স্মার্ত মতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ অনুমোদিত ছিল।

ইসলামের মতে এক সঙ্গে চারিটি স্ত্রী পর্যন্ত অনুমোদিত হয়, তার অধিক নয়। দুই বোনকে যুগপৎ বিবাহ করা চলে না। মৃতা পত্নীর সহোদরাকে বিবাহ করা চলে। অপৌত্তলিক অমুসলমানের কন্যাকে বিবাহ অনুমোদনপ্রাপ্ত। বিধবাবিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ (তলাক্) অনুমোদিত হয়ে থাকে। বস্তুত একবিবাহকারীর সংখ্যাই বেশি দেখা যায় মুসলমানদের মধ্যে।

খৃস্টীয় সম্প্রদায়ে একবিবাহ অনেকটা বাধ্যতামূলক, তবে লুথারের সমকালীন দ্বিপত্নীবিবাহের দৃষ্টান্তও রয়েছে। রাজা অষ্টম হেনরী বিবাহ-বিচ্ছেদ করতেন এবং পত্নী হত্যা করতেন নূতন পত্নী আমদানির জন্য।

কোন কোন আদিম কৌমের ক্ষেত্রে একবিবাহ বাধ্যতামূলক। যথা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হোপি (Hopi) গোষ্ঠীতে, ব্রেজিলের ক্যানেলা (Canella) গোষ্ঠীতে। [Social Organization Lowie, p. 113]

লাউই-এর মতে—

"Very few peoples in human history, then, practice monogamy on principle, but de facto the majority of persons in most societies live monogamously." (p. 114, ibid.)

অর্থাৎ, নীতিগতভাবে একস্ত্রীবিবাহ বা একবিবাহ খুব কম গোষ্ঠীতেই স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু বস্তুত অধিকাংশ গোষ্ঠীতে বেশি সংখ্যক লোক হচ্ছে একবিবাহকারী।

আসামের খাসি গোষ্ঠীতে বহুপতিবিবাহ কিংবা বহুস্ত্রীবিবাহ নেই। খাসিরা একবিবাহকারী গোষ্ঠী।

আসামের নাগা গোষ্ঠীগুলিতে, মধ্য ভারতের গোন্দ গোষ্ঠীতে, বৈগা গোষ্ঠীতে বহুস্ত্রীবিবাহ লক্ষিত হয়।

পূর্ব ভারতের সাঁওতাল ও দক্ষিণ ভারতের কাদারদের মধ্যে একবিবাহই চলতী।

আফ্রিকায় বহুস্ত্রীবিবাহের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এখানে সাধারণত গরীবেরা একবিবাহকারী, কিন্তু সম্পন্ন অবস্থার লোকেরা দুই বা তিন স্ত্রী বিবাহ করে। ধনীদের বহুদার গ্রহণ, ছয় থেকে দশ পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণও অশোভন নয়, কারও কারও বিশ-ত্রিশটি স্ত্রী পর্যন্ত গৃহস্থালীতে নিযুক্তা। (Ibid., p. 118)

কয়েক সহোদরাকে বিবাহের রীতি, অর্থাৎ, ভগিনী-মূলক বহুপত্নীত্ব (Sororal polygyny) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাতৃধারাবিশিষ্ট ক্রো এবং হিদাৎসা গোষ্ঠীতে অনুমোদন পেয়ে এসেছে। (Ibid., p. 119)

মধ্য এশিয়ার কাজাক (Kazak) গোষ্ঠীতে মৃতা পত্নীর সহোদরাকে বা শ্যালিকাকে বিবাহ (Sororate) সমর্থিত হত, কিন্তু ভগিনীমূলক বহুস্ত্রী বিবাহ ছিল নিন্দনীয়।

কৌমী সমাজে বহুস্ত্রীবিবাহের মূল কারণগুলি এইরূপ :—

(১) স্ত্রী বন্ধ্যা হলে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের প্রেরণা দেখা দেয়।

(২) কৌমী সমাজে বহু পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায় বহু স্ত্রী লাভের ঝোঁক পরিস্ফুট হয়। বহু পুত্রের দ্বারা সাংসারিক সমৃদ্ধি ঘটে।

(৩) অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একাধিক পত্নী সুবিধাজনক। তাদের শ্রমের ফল স্বামী উপভোগ করে।

(৪) কোথাও কোথাও সন্তান প্রসবের পরে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক পত্নী কাম্য।

একবিবাহ

প্রাচীন সাহিত্যে একবিবাহের বহু নজীর পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করছি।

(১) রাম ও সীতার বিবাহ। সীতা ছিলেন বীর্যশুল্কা। এটি বীর্য প্রদর্শন-পূর্বক বিবাহের দৃষ্টান্ত। —বিষ্ণু ৪।৪।৪২।

(২) ঋচীক ও সত্যবতীর বিবাহ। সত্যবতী গাধির কন্যা।
—বিষ্ণু ৪।৭।৫-৮।

(৩) জমদগ্নি ও রেণুকার বিবাহ। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি।
—বিষ্ণু ৪.৭।১৬।

(৪) চ্যবন ও সুকন্যার বিবাহ। —মহা ৩।১২২।২৬-২৮।
(৫) অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার বিবাহ। —মহা ৩।৯৭.৭।
(৬) বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর বিবাহ। —মহা ১।১৭৪।৫।
(৭) শক্তি ও অদৃশ্যন্তীর বিবাহ। বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি।
—বায়ুপুরাণ ৭০।৮৩।
(৮) দ্রোণ ও কৃপীর বিবাহ। ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণ।
—বিষ্ণু ৪।১৯।১৮।
(৯) বিদুরের একবিবাহ। —মহা ১।১১৪।:২, ১৩।
(১০) মান্ধাতা ও বিন্দুমতীর বিবাহ। —বিষ্ণু ৪।২।১৯।
(১১) পুরুকুৎস ও নর্মদার বিবাহ। —বিষ্ণু ৪।৩।১৩।
[পুরুকুৎস মান্ধাতার পুত্র।]
(১২) বলভদ্র (বলরাম) ও রেবতীর বিবাহ। —বিষ্ণু ৪।১৫।১২।
(১৩) নল ও দময়ন্তীর বিবাহ। —মহা ৩।৫৭।৪১।
(১৪) সত্যবান্ ও সাবিত্রীর বিবাহ। —মহা ৩।২৯৪।৮-১৭।
(১৫) জ্যামঘ ও শৈব্যার বিবাহ। জ্যামঘ যদুবংশীয় রাজা। তাঁর পত্নী শৈব্যা ব্যক্তিত্বশালিনী ছিলেন এবং প্রথম জীবনে নিঃসন্তান ছিলেন। এই কারণে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য একটি কন্যাকে আহরণ করেন, কিন্তু স্ত্রীর রোষ-বচনে তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হয় না। শৈব্যার পুত্র হলে তার সঙ্গেই ঐ কন্যার বিবাহ হয়। —বিষ্ণু ৪।১২।৬-১৪।

উল্লিখিত উদাহরণগুলি রাজকুল বা পুরোহিতকুল সম্পর্কীয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহে বাধা দিতেন। একবিবাহ (monogamy) সাধারণ লোকদের মধ্যে সম্ভবত প্রচলিত রীতি ছিল, কিন্তু একাধিক স্ত্রী গ্রহণে বাধাও ছিল না।

যৌথ বিবাহ

যৌথ বিবাহের (group marriage) একটি প্রকল্প মর্গান উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁর মতে যৌন সম্পর্কের কতগুলি পর্যায় হচ্ছে আবশ্যকীয় সামাজিক স্তর। যথা,—

(১) অবাধ যৌনতা (promiscuity) ;
(২) যৌথবিবাহ (group marriage) ;
(৩) শিথিল যৌনতা-যুক্ত যুগ্ম-পরিবার (pairing family) ;
(৪) একবিবাহ (monogamy)।

[Ancient Society, L. H. Morgan, 1958, pp. 505, 506.]

যৌথ বিবাহের পরবর্তী স্তরে বহুপতিবিবাহ প্রকট হয় মর্গানবাদীদের

মতে। আরও পরের স্তরটি হচ্ছে বহুপত্নীবিবাহ। সর্বাধুনিক হচ্ছে এক-বিবাহের স্তর। কিন্তু আমরা বাস্তব উদাহরণে বহুপতিবিবাহ, বহুস্ত্রীবিবাহ এবং একবিবাহ রীতির একত্রাবস্থিতি দেখতে পাই। মহাভারতীয় সমাজে তিনটি রীতির পাশাপাশি অবস্থান লক্ষণীয়। হিমালয়ের কৌমগুলিতে বর্তমানে এ জাতীয় দৃশ্যই পরিস্ফুট যৌন সম্পর্কের বিচারে।

নারীর সংখ্যাল্পতার জন্য টোডাদের মধ্যে পূর্ববর্তী প্রথা ছিল ভ্রাতৃ-মূলক বহুপতিবিবাহ। নারীশিশু হত্যা নিবারণের ফলে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুপতিবিবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহুস্ত্রী বিবাহ। সুতরাং ছোট আকারের যৌথ বিবাহ-কারী পরিবার গড়ে উঠেছে। এক পরিবারে কয়েক ভাইয়ের হয়ত দুই বা তিনটি স্ত্রী।

খশদের মধ্যেও বহুপতি বিবাহের পরবর্তী স্তরে বা পরিপূরক-রূপে ক্ষুদ্র আকারের যৌথ বিবাহ বিকশিত হচ্ছে। [Majumdar and Madan, p. 77]

পলিনেসিয়ার **মার্কয়েসস দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে** যৌথ-বিবাহের অস্তিত্ব অনেকে সন্দেহ করেছেন। প্রকৃত ব্যবস্থাটা এই প্রকার। গৃহস্থালীর কর্তা যতক্ষণ গৃহে থাকে ততক্ষণ তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে সেই অধিকারী। তার অনুপস্থিতিতে গৃহস্থিত অন্যান্য পুরুষ তার স্ত্রীকে উপভোগ করতে পারে। এস্থলে শিথিল যৌনতা-যুক্ত একবিবাহই প্রতিভাত হচ্ছে। [A Handbook of Sociology, W.F. Ogburn and M. F. Nimkoff, 1966, p. 493]

ব্রেজিলের **বোরোরো গোষ্ঠীতে** ব্যক্তিগত বিবাহের (individual marriage) পাশাপাশি যৌন সাম্যবাদ (sexual communism) লক্ষিত হয়েছে। বিবাহিত দম্পতীরা আলাদা আলাদা ঘরে থাকে। অবিবাহিত তরুণেরা একটি আস্তানায় থাকে এবং আহৃত কন্যাদের সমানভাবে উপভোগ করে। আমাদের সমাজেও ব্যক্তিগত বিবাহের পরিবারগুলি রয়েছে এবং পাশাপাশি রয়েছে গণিকালয় (যৌন সাম্যবাদের নিদর্শন)।

আফ্রিকার মাসাই (Masai) গোষ্ঠীতে অবিবাহিত তরুণ সৈনিকেরা আলাদাভাবে থাকে। প্রত্যেক সৈনিকের নায়িকা (mistress) আছে। সৈনিকের অনুপস্থিতিতে নায়িকা অপর পুরুষের সহিত সঙ্গতা হতে পারে। সামরিক জীবনের সমাপ্তিতে সৈনিক তার বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর সঙ্গে গৃহস্থালী পাতায়। অর্থাৎ, অবিবাহিতদের জন্য যৌন সাম্যবাদের ব্যবস্থা, কিন্তু গৃহস্থালী শুধু দম্পতীকে নিয়ে। [Primitive Society, pp. 50, 51]

সাইবেরিয়ার **চাকচিদের (Chukchi)** মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাহ চলতী, কিন্তু পারস্পরিক আতিথ্যের নিদর্শন-স্বরূপ পত্নী-বিনিময় (exchange of wives) অনুমোদিত। স্বামী কিছুদিনের জন্য নিজের স্ত্রীকে নিজ বান্ধবের

সঙ্গে থাকতে অনুমতি দেয়, কিন্তু আবার তার স্ত্রী তার নিকটে প্রত্যাবর্তন করে। এটা ঠিক যৌথ বিবাহ নয়। যৌথবিবাহে একই গৃহস্থালীতে একাধিক স্বামীর সঙ্গে একাধিক স্ত্রীর যৌথভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। [Ibid., pp. 51, 52]

অস্ট্রেলিয়ার **ডিয়েরি (Dieri)** গোষ্ঠীতে একটি পুরুষের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী একজন। এক মেয়ে দুজনের বাগ্‌দত্তা হতে পারে না। মাতামহীর ভ্রাতার দৌহিত্রীর কিংবা মাতামহের ভগিনীর দৌহিত্রীর সঙ্গে বিবাহ রীতিসম্মত। (১) বিবাহের পরে স্ত্রী অন্য পুরুষের উপপত্নী হতে পারে। (২) আত্মীয় অতিথি এলে তার সঙ্গে আতিথ্য হিসেবে স্ত্রীকে সাময়িকভাবে সহবাস করতে দেওয়া হয়। এতে স্ত্রীর উপর থেকে স্বামীর স্থায়ী অধিকার চলে যায় না। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক অব্যাহতই থাকে। প্রথাটি হচ্ছে monogamy with licensed cohabitation with other men, অর্থাৎ, শিথিল যৌনতাযুক্ত একবিবাহ। (৩) সাময়িক উপপতি (concubitant) উপপত্নীকে (concubine) নিয়ে যেতে পারে না। উপপত্নীটি স্বামীকে ত্যাগ ক'রে যায় না। উপপতিটি সাধারণত গোষ্ঠী-প্রধানদের দ্বারা বা স্বামীর দ্বারাই নির্বাচিত। (৪) অর্থাৎ, ব্যক্তিগত বিবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উপপত্নী প্রথা (concubinage)। (৫) দুচারিটি ক্ষেত্রে হয়ত কয়েক ভাই স্ত্রীদের সঙ্গে যৌথ যৌন সম্পর্ক অনুযায়ী চলে। এস্থলে যৌথ বিবাহ সীমিত আকারের। স্ত্রীরা পরস্পরের ভগিনী। [Ibid., pp. 52-55]

এমন কোন গোষ্ঠী দেখা যায় না, যেখানে ব্যক্তিগত পরিবার নেই, শুধু মাত্র যৌন সাম্যবাদই আছে। যেখানে যৌন স্বেচ্ছাচার অনুমোদিত, সেখানেও ব্যক্তিগত বিবাহ-প্রথার অভাব নেই। [এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্রষ্টব্য, বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, ১ম ভাগ, পৃ ৩-৫৯।]

অবাধ যৌনতা প্রকল্প

অবাধ যৌনতা প্রকল্প (promiscuity hypothesis) মর্গানবাদের অন্তর্গত। অবাধ যৌনতার তাৎপর্য কোন প্রকার যৌন নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি, অর্থাৎ, সর্বপ্রকার রক্ত সম্পর্কের মধ্যেও যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। প্রাক্‌-বিবাহ স্বেচ্ছাচার (pre-marital license), বিবাহোত্তর ব্যভিচার (extra-marital sex relation), পত্নীর তরফে উপপত্নীর ভূমিকা (concubinage), অতিথিকে পত্নীদান (lending of wives), উৎসবকালীন স্বেচ্ছাচার (ceremonial license)— আদিম তথা সভ্য সমাজেও দেখা যায়, কিন্তু এসব প্রথার সঙ্গে পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিবাহ-প্রথাও বিদ্যমান। লাউই-এর মতে অবাধ যৌনতার একটা আদিমানবীয় স্তর প্রকল্পিত হতে

পারে, কিন্তু কোন আদিম গোষ্ঠীতে এধরণের কোন নজীর নেই। [Social Organization, Lowie, pp. 87, 88]

উত্তরাধিকার-সূত্রে বিধবা-বিবাহ

যে স্থলে স্ত্রীলোক নিছক সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হয়, সেখানে উত্তরাধিকার-সূত্রে বিধবাকে পত্নী-রূপে লাভ করার রীতি (inheritance of widows) রয়েছে।

সেম নাগা (Sema Naga) গোষ্ঠীতে একজনের মৃত্যুর পরে তার বিধবা পত্নীকে কোন ছেলে স্ত্রীরূপে লাভ করে। অর্থাৎ, গর্ভধারিণী ব্যতীত কোন বিধবা বিমাতাকে কোন ছেলে পত্নীরূপে লাভ করে। (বিমাতা বিবাহ)

মধ্য ভারতীয় গোষ্ঠীগুলিতে বিধবা জ্যেষ্ঠভ্রাতার জায়াকে কনিষ্ঠভ্রাতা বিবাহ করবার অধিকারী। খারিয়া গোষ্ঠীতে বিধবা বিবাহের নাম সগাই (sagai)। স্বামীর বড় ভাইকে বা স্ত্রীর বড় বোনকে বিবাহ করা যায় না। স্বামীর ছোট ভাইকে বিবাহ করা চলে স্বামীর মৃত্যুর পরে।

আফ্রিকার পিতৃধারাবিশিষ্ট বহুস্ত্রীবিবাহকারী গোষ্ঠীগুলিতে বিধবা বিমাতাকে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ছেলে পত্নীরূপে লাভ করে। এক-বিবাহকারী পরিবারে শুধু গর্ভধারিণীই বর্তমান, কোন বিমাতা থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং বিমাতাকে বিবাহের প্রশ্নই ওঠে না।

(১) মোঙ্গোলদের মধ্যে বিমাতা বিধবাকে বিবাহের রীতি ছিল।

(২) আফ্রিকার পিতৃধারাবিশিষ্ট থঙ্গা (Thonga) গোষ্ঠীতে সৎ-ছেলে (stepson) বিধবা বিমাতাকে পত্নীরূপে লাভ করে কিংবা বিধবা মাতুলানীকে ভাগিনেয় বিবাহ করে। (মাতুলানী-বিবাহ)

(৩) আফ্রিকার ইওরুবা (Yoruba) গোষ্ঠীতে বিধবা বিমাতাদের ছেলেরা ভাগ ক'রে নেয়। এক এক ছেলের ভাগে পড়ে এক এক বিমাতা। বড় ভাইয়ের বিধবা বউ দেবরের ভাগে পড়ে। [Ibid., pp. 102, 103 ; Primitive Society, p. 38]

দেবর-বিবাহ

দেবর-বিবাহ (levirate) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। [সংস্কৃত দেবৃ ; গ্রীক ডায়ের, daer ; লাতীন লেভির, levir।)

ঋগ্বেদে দেবরের সহিত বিধবা ভ্রাতৃজায়ার যৌন সম্পর্কের নজীর রয়েছে। যদি এই যৌন সম্পর্ক অস্থায়ী হয়, অর্থাৎ পুত্রলাভের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়, তাহলে নিয়োগ-প্রথার প্রতীতি হয়। আবার দেবর বিবাহের তাৎপর্যও ধরে নেওয়া যায়। (ঋ ১০। ৪০।২)

মহাভারতে দেবর-বিবাহের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু নিয়োগের নজীর থাকলেও দেবর-বিবাহের কোন নজীর নেই। (মহা ১২।৭২।১২ ; ১৩।৮।২২)

কৌমী সমাজে দেবর-বিবাহের ভিতর দিয়ে বিধবা ভ্রাতৃজায়ার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়। বিধবা ও তার সন্তানের ভার দেবর (brother-in-law) গ্রহণ করে। এই প্রথার মূলে রয়েছে কৌমী বিবাহ-গত ধারণা। কৌমী বিবাহ দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, নিছক দুটি ব্যক্তির মধ্যে নয়। তাই স্বামী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীর দায়িত্ব গোষ্ঠী গ্রহণ করে। বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ মানে তার দায়িত্ব গ্রহণ।

(১) সাইবেরিয়ার **কিরগিজদের** মধ্যে স্বামীর ছোট ভাই নাবালক হলেও বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বধূরূপে লাভ করে।

নিউগিনির **কাই** (Kai) গোষ্ঠীতে স্বামীর অবিবাহিত ভাই বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। ক্যালিফোর্ণিয়ার **শাস্তা** (Shasta) গোষ্ঠীতে শুল্ক দিয়ে বধূকে কিনতে হয়, শুল্ক-সূত্রে বিধবা ভ্রাতৃজায়া দেবরের ভাগে পড়ে। এই সব ক্ষেত্রে নারী হচ্ছে ক্রীত অস্থাবর সম্পত্তি (chattel) মাত্র, দেবর-বিবাহ রীতিতে তাই পরিস্ফুট।

(২) সাধারণত স্বামীর ছোট ভাই বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করে। কনিষ্ঠ দেবর-বিবাহ রীতি (junior levirate) একটা ধারণা থেকে উদ্ভূত। স্বামীর বড় ভাই হয়ত ইতিপূর্বে বিবাহিত হয়েছে, ছোট ভাই অবিবাহিত থাকা সম্ভব। যার বউ রয়েছে তার তরফে আর একটা বউ অনাবশ্যক ; যার বউ নেই তারই বউয়ের প্রয়োজন। তাই ছোট ভাই বিধবা ভ্রাতৃবধূকে লাভ করতে পারে।

মধ্য ভারতের খারিয়াদের মধ্যে ভাশুরকে বিবাহ নিষেধ-যুক্ত। মধ্য-ভারতে কনিষ্ঠ দেবর-বিবাহই স্বীকৃতি পায়।

শ্যালিকা-বিবাহ

অনেক ক্ষেত্রে দেবর-বিবাহ ও শ্যালিকা-বিবাহ প্রথা (sororate) পাশাপাশি বিরাজ করে। কিন্তু সর্বত্র নয়। শ্যালিকা-বিবাহ দুই প্রকার। (১) স্ত্রী বেঁচে থাকতেই স্ত্রীর ছোট বোনকে বিবাহ করা চলে। কিংবা (২) স্ত্রী মারা গেলে তার ছোট বোনকে বিবাহ করার অধিকার জন্মে। (সংস্কৃত স্বসৃ, ভগিনী ; লাতীন সোরোর, soror, ভগিনী।)

সাধারণত স্ত্রীর বড় বোনকে কখনোই বিবাহ করার অধিকার থাকে না।

(১) সাইবেরিয়ার কোরিয়াক (Koryak) গোষ্ঠীতে দেবর-বিবাহ এবং শ্যালিকা বিবাহ উভয় প্রথাই প্রচলিত। কিন্তু প্রতিবেশী চাকচিদের মধ্যে দেবর-বিবাহ আছে, শ্যালিকা বিবাহ নাই।

(২) আমেরিকার প্যুয়েব্লো গোষ্ঠীগুলিতে (হোপি, জুনি প্রভৃতি গোষ্ঠীতে) দেবর-বিবাহও নেই, শ্যালিকা বিবাহও নেই।

(৩) ক্যালিফোর্ণিয়ার শাস্তা গোষ্ঠীতে দেবর-বিবাহ চল্‌তী, পাশাপাশি শ্যালিকা-বিবাহও চল্‌তী। যে মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, তার সন্তান না হলে কন্যাপক্ষের তরফ থেকে ঐ মেয়ের ভগিনীকে দান করা হয়।

(৪) বাংলাদেশে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠা শ্যালিকা-বিবাহ ঠিক প্রথা হিসেবে চল্‌তী না হলেও সমর্থিত হয়, কিন্তু দেবর-বিবাহ অপ্রচলিত।

দেবর-বিবাহ ও শ্যালিকা-বিবাহের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রতিপাদিত হতে পারে না, তবে উভয় প্রথা অনেক ক্ষেত্রে যুক্তভাবে রয়েছে।

উভয় প্রথার দ্বারা জ্ঞাতি গণনারীতি (Kinship terminology) প্রভাবিত হয়েছে। (১) বাবা, কাকা এক শ্রেণীভুক্ত হয়। (২) মা, মাসী একশ্রেণীতে পড়ে। (৩) নিজের ছেলে ও ভাইয়ের ছেলের মধ্যে স্বামীর তরফ থেকে তফাৎ থাকে না। (৪) নিজের সন্তান ও বোনের সন্তানের মধ্যে তফাৎ থাকে না স্ত্রীর তরফ থেকে। ক্যালিফোর্ণিয়ার ইয়াহি (Yahi) গোষ্ঠীতে এ ধরণের জ্ঞাতি গণনা-রীতি দৃষ্ট হয়। এই রীতি থেকে সন্তানের তরফে একাধিক বাবা-মা থাকার বিভ্রম সৃষ্ট হয়। বাবা-বাচক পদ মানেই সম্ভাব্য পিতা (potential step-father), যে দেবর-বিবাহের সূত্রে পিতা হওয়ার যোগ্য। মা-বাচক পদ মানে সম্ভাব্য মাতা (potential step mother), যে শ্যালিকা-বিবাহের সূত্রে মাতা হওয়ার যোগ্যা। একাধিক বাবা-মার তাৎপর্য যৌথবিবাহের পরিস্থিতি নয়। এই ব্যাপারটা লাউই চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্যালিকা-বিবাহ রীতির মূলে একটি বিবেচনা বিদ্যমান। স্ত্রী মরে গেলে তার স্থান পূরণ করতে কন্যাপক্ষ বাধ্য। এই বিবেচনাকে শ্যালিকা ছাড়া স্ত্রীর তরফের অন্য আত্মীয়ার ক্ষেত্রেও কখনও কখনও প্রসারিত করা হয়েছে। (১) উত্তর আমেরিকার ওমাহা (Omaha) গোষ্ঠীতে শ্যালকের মেয়েকে, স্ত্রীর পিসীকে বিবাহ করা চলে। (২) ক্যালিফোর্ণিয়ার মিয়োক (Miwok) গোষ্ঠীতে শ্যালকের মেয়েকে বিবাহ অনুমোদিত হয়ে থাকে। [Social Organization, Lowie, pp. 103, 104]

বাঞ্ছিত যৌন সম্পর্কের রীতি

কৌমী সমাজে বাঞ্ছিত যৌন সম্পর্কের রীতি (preferential mating) কোথাও কোথাও প্রচলিত। দেবর-বিবাহ ও শ্যালিকা-বিবাহ এই রীতির অন্তর্গত। এর আর একটা রূপ হচ্ছে বিষম কাজিন বিবাহ (cross-cousin marriage)।

কাজিন দুই প্রকার :—(১) সমান্তরাল কাজিন এবং (২) বিষম কাজিন। সমান্তরাল কাজিন (parallel cousin) হচ্ছে দুই ভাইয়ের বা দুই বোনের সন্তানেরা, অর্থাৎ,—কাকাত-জ্যেঠাত ভাই বোন, অথবা মাসতুত ভাইবোন। বিষম কাজিন (cross-cousin) হচ্ছে ভাই-বোনের সন্তানেরা, অর্থাৎ, মামাত-পিসাত ভাই বোন।

আরবীয়দের মধ্যে সগোত্র বিবাহ বা অন্তর্বিবাহ (endogamy) সমর্থিত। এই রীতি থেকেই অনুমোদিত হয়েছে সমান্তরাল কাজিন বিবাহ (parallel cousin marriage), অর্থাৎ, কাকাত-জ্যেঠাত ভাইবোনের বিবাহ। তুরস্কের কুর্দদের (Kurds) মধ্যেও এরূপ প্রথা রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কাদারদের মধ্যেও এই রীতি।

সাধারণত বিষম কাজিন বিবাহের অধিক প্রচলন দেখা গিয়েছে। এই প্রথার দুটি রূপ হতে পারে। যথা, (১) মামাত বোনকে বিবাহ, (২) পিসাত বোনকে বিবাহ। প্রথম রীতিটিই বেশি চল্‌তী। বিষম কাজিন বিবাহ রীতি অসগোত্র বিবাহ-রীতি (exogamy) থেকে উদ্ভূত।

দক্ষিণ ভারতে তেলুগুভাষীদের মধ্যে **মেনরিকম্‌** বা মামাত বোনকে বিবাহের কিংবদন্তী প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। স্মৃতিকার বৌধায়ন এই রীতির খবর রাখতেন। [বৌ ধ সূ ১।১।২।১,৩ ; Totemism and Exogamy, J. G. Frazer, 1910, vol. II, pp. 225-227.]

ক্যালিফোর্ণিয়ার **মিয়োক** গোষ্ঠীতে মামাত বোনকে বিবাহ করবার রীতি রয়েছে, কিন্তু পিসাত বোনকে বিবাহের রীতি নেই।

খাসিদের মধ্যে পিসাত বোনকে বিবাহের রীতি। সিংহলের বেদ্দদের মধ্যে একবিবাহ, পিসাত বোনকে বিবাহের রীতি সমাদৃত।

টোডাদের মধ্যে মামাত বোনকে বা পিসাত বোনকে বিবাহ করাই বিধিসম্মত।

কোথাও কোথাও বিষম কাজিন বিবাহ প্রায় বাধ্যতামূলক, অর্থাৎ, এর বিকল্প বিবাহ-রীতি নেই, যেমন, অস্ট্রেলিয়ার ক্যারিয়েরা (Kariera) গোষ্ঠীতে। কোথাও বা বিষম কাজিন বিবাহ-প্রথার সঙ্গে বিকল্প বিবাহ-রীতিও বর্তমান, যেমন, টোডা ও মিয়োকদের ক্ষেত্রে।

টাইলর বিষম কাজিন বিবাহকে ময়টি (moiety) বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ময়টি হচ্ছে অর্ধকৌম। একটি কৌম দুইটি ময়টিতে বিভক্ত হয়। এক ময়টির মেয়েকে অন্য ময়টির পুরুষ বিবাহ করে। বর-বধূ হয় পরস্পরের বিষম কাজিন। **রিভার্স দেখিয়েছেন যে মেলানেসিয়ায় যে ক্ষেত্রে ময়টি বিভাগ নেই, সেক্ষেত্রেই বিষম কাজিন বিবাহ রয়েছে।** টোডাদের মধ্যে ময়টি বিভাগ আছে, কিন্তু ময়টির মধ্যেই বিবাহ

(endogamy) হয়, সুতরাং এদের ক্ষেত্রে টাইলরের প্রকল্প প্রযোজ্য নয়।

একটি ব্যাখ্যা অনুসারে শালার মেয়েকে বিবাহের রীতি প্রথমে ছিল। পরবর্তী কালে নিজের ছেলের সঙ্গে শালার মেয়ের বিবাহ দেওয়ার রীতি বিকশিত হয়েছে। (মিয়োক দৃষ্টান্ত)

বিষম কাজিন বিবাহ-রীতির দ্বারা আত্মীয়-গণনা-রীতি প্রভাবিত হয়েছে। যথা,—(১) মামাত বোনকে বিবাহের ক্ষেত্রে মামা ও শ্বশুর একই ব্যক্তি, তাই মামার ও শ্বশুরের বাচক একই নাম দেখা যায়। পিসাত বোনকে বিবাহের ক্ষেত্রে পিসী ও শ্বাশুরীর মধ্যে তফাৎ থাকে না, সুতরাং পিসীর ও শ্বাশুরীর বাচক নাম একই হয়ে থাকে। (২) পুরুষজাতীয় বিষম কাজিন ও স্বামীর বাচক নাম একই হয়। স্বামী-বাচক আলাদা শব্দ থাকে না। তেমনি নারীজাতীয়া বিষম কাজিন ও পত্নীর বাচক নাম একই হয়। পত্নী-বাচক পৃথক্ শব্দ থাকে না।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য সমাজে মামাত বোনকে বিবাহ টাবু-যুক্ত ছিল, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ বিবাহ অনুষ্ঠিত হত। এর প্রমাণ অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ। ঈশান চন্দ্র ঘোষের মতে ক্ষত্রিয় রাজকুলে এরূপ বিবাহ নিন্দিত ছিল না, তিনি বড্ঢকি-সূকর-জাতক প্রভৃতির নজীর উল্লেখ করেছেন। [পৃ ২৯১, জাতক-মঞ্জরী, ১৯৩৪]

[বসুদেবের ভগিনী কুন্তীর পুত্র অর্জুন বসুদেবের কন্যা সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণু ৪.১৪.১০।]

অন্তর্বিবাহ

অন্তর্বিবাহ (endogamy) হচ্ছে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে নর-নারীর বিবাহ-রীতি। অন্তর্বিবাহ তিন প্রকার হতে পারে। যথা,—

(১) ট্রাইব বা কৌমের মধ্যে বিবাহ ;

(২) ময়টি (moiety) বা অর্ধকৌমের মধ্যে বিবাহ ;

(৩) বর্ণের (caste) মধ্যে বিবাহ।

প্রাচীন আর্য সমাজে অসগোত্র বিবাহ (exogamy) এবং সবর্ণ বিবাহ (caste endogamy) ছিল প্রশস্ত, যদিও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহে বাধা ছিল না।

কৌমী সমাজে কৌম-গত অন্তর্বিবাহ সাধারণত নিয়মানুগ, তবে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। টোডাদের মধ্যে ময়টি-গত অন্তর্বিবাহ চলতী।

অন্তর্বিবাহের একটি রূপ সগোত্র বিবাহ। এতে কাকাত-জ্যেঠাত ভাই-বোনের বিবাহ সমর্থন লাভ করে। (আরবীয়, কুর্দ ও কাদার প্রথা)।

সগোত্র বিবাহ কোন কোন ক্ষেত্রে সহোদরা-বিবাহের রূপ গ্রহণ করে। [গ্রীক এণ্ডন, endon, ভিতরে ; গ্যামোস, gamos, বিবাহ ; গ্রীক একসো, exo, বাইরে।]

সহোদরা-বিবাহ

সহোদরা-বিবাহ বা ভাইবোনের বিবাহ একটি অভিজাত-প্রথা, রক্ত-বিশুদ্ধি রক্ষার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং কুল-মর্যাদা-বোধ থেকে উদ্ভূত। কুলের বাইরে বিবাহ হলে রক্তগত বিশুদ্ধি নষ্ট হয় এবং কুল-গৌরব রক্ষা করা যায় না, এইরূপ চেতনা থেকে কোন কোন গোষ্ঠীতে উন্নত সংস্কৃতির পরিবেশে ভাই-বোনের বিবাহ আদৃত হয়েছে। এরূপ রীতিতে ব্যক্তিগত বিবাহই পরিস্ফুট এবং যৌথ বিবাহের কোন তাৎপর্য চোখে পড়ে না। অর্থাৎ, ঈদৃশ প্রথা কোন প্রকারেই আদিম চেহারা-যুক্ত নয়। এর দ্বারা মর্গান-কথিত consanguine family বা যৌথ যৌনতা-যুক্ত একরক্তের পরিবার সূচিত হয় না। [লাতীন সাংগুইস, sanguis, রক্ত।]

প্রাচীন আর্যদের মধ্যে কোন এক সময়ে আভিজাত্যের নিদর্শন সম্ভবত ছিল সহোদরা-বিবাহ। ঋগ্বেদীয় যম-যমী-সংবাদে এরূপ আভাস পাওয়া যায়। যমীর মৈথুন-প্রস্তাবকে সহোদর যম প্রত্যাখ্যান করেন। ইরাণীয় জনশ্রুতিতে যিম (Yima) এবং যিমেহ্ (Yimeh) দুই ভাইবোন এবং স্বামী-স্ত্রীও বটে। বুদ্ধের জন্ম হয় শাক্য কৌমের ভিতরে। শাক্য কৌমের উৎপত্তি হয়েছিল সহোদরা-বিবাহ থেকে, —এরূপ জনশ্রুতি আছে। দশরথ-জাতকে রাম ও সীতা দুই ভাইবোন, তাঁদের বিবাহ সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের জনশ্রুতি অন্যপ্রকার। কাজেই রাম-সীতার উদাহরণ এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। [ঋ ১০।১০ ; Vedic Mythology, A. A. Macdonell, 1897, p.173.]

প্রাচীন মিশরে (Egypt) রাজকীয় স্তরে সহোদরা-বিবাহ অনুমোদিত হত। পেরু (Peru) অঞ্চলে এই প্রথা ছিল। পলিনেসিয়ার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অভিজাত সমাজে ভাই-বোনের বিবাহের খবর পাওয়া গিয়েছে। [Primitive Society, p. 58]

বহির্বিবাহ

বহির্বিবাহ রীতি (exogamy) হচ্ছে পরিবারের বাইরে বা ক্ল্যানের বাইরে বিবাহ। এর নামান্তর অসগোত্র বিবাহ। ভারতীয় আর্যদের মধ্যে অসগোত্র বিবাহ প্রথাই ছিল প্রচলিত রীতি। আদিম কৌমগুলিতে সাধারণত বহির্বিবাহ সমর্থিত হয়। যেখানেই ক্ল্যান-বিভাগ আছে, সেখানেই প্রায় বহির্বিবাহ আছে। ক্ল্যান হচ্ছে বহির্বিবাহকারী এক রক্তের গোষ্ঠী, যদিও

সমশোণিতবোধ নিতান্তই বিশ্বাসগত, প্রমাণযোগ্য নয়। ক্ল্যান (clan) ও জ্ঞাতিগোষ্ঠী একার্থক নয়। জ্ঞাতিগোষ্ঠী কুলের (lineage) অর্থব্যঞ্জক ; এস্থলে আদিপুরুষ আদিপিতা বা আদিমাতা থেকে বংশধারা টানবার রীতি এবং এই বংশধারা প্রমাণযোগ্য। যথা, বাংলাদেশে নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ, অদ্বৈত প্রভুর বংশ। যে বংশধারা বিশ্বাসের বিষয়, কিন্তু প্রমাণযোগ্য নয়, তাকে বলা হয় কিন (kin) গোষ্ঠী, যা প্রায় গোত্রের সমতুল্য। বহির্বিবাহ-কারী কিন-গোষ্ঠী হচ্ছে ক্ল্যান বা গোত্র। বর্তমানে ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ গোত্রের মেয়েকে বিবাহ করে না, যেহেতু আদি পিতা ভরদ্বাজ থেকে বংশধারা টানে, কিন্তু এক্ষেত্রে বংশধারা প্রায়-ক্ষেত্রেই অলীক বিশ্বাস মাত্র।

ভারতীয় কৌমী সমাজের বহির্বিবাহকারী ক্ল্যান-যুক্ত গোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত :—

(১) মধ্যভারতের আদি-অস্ট্রেলীয় হো, সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, খারিয়া ইত্যাদি। (ক্ল্যানের নাম কিলি, Killi।)

(২) ভীল, কামার, ভূমিজ প্রভৃতি মধ্য ভারতীয় কৌম।

(৩) আসামের নাগা গোষ্ঠী, খাসি কৌম।

(৪) দক্ষিণ ভারতের টোডা গোষ্ঠী।

বহির্বিবাহ রীতি-বিহীন ক্ল্যান-বিহীন গোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত :—

(১) আন্দামানের আদিবাসী।

(২) কোচিনের কাদার।

(৩) আরবীয় গোষ্ঠী, কুর্দ গোষ্ঠী।

(৪) বহির্বিবাহ রীতি-বিহীন জাপানীরা।

(৫) পলিনেসীয়রা।

এই সব ক্ল্যান-বিহীন গোষ্ঠীতে অন্তর্বিবাহ চলতী। আরবীয়, কুর্দ, জাপানী ও পলিনেসীয়দের মধ্যে একধারাবিশিষ্ট কিন-গোষ্ঠী আছে। কাদার ও আন্দামানবাসীদের মধ্যে কোন একধারাবিশিষ্ট সংগঠন নাই। [Social Organization, Lowie, pp. 248, 259, 260]

শিকারজীবী এস্কিমো, টিয়েরা'ডেল ফুয়েগোর শিকারজীবী ইয়াঘান (Yaghan), ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলের পশুপালক ল্যাপ (Lapps) প্রভৃতি গোষ্ঠীদের মধ্যে বহির্বিবাহ-বিশিষ্ট ক্ল্যান নাই। সাইবেরিয়ার শিকারজীবী চাকচি (Chukchi) গোষ্ঠীতে বহির্বিবাহ রীতি নাই এবং ক্ল্যানও নাই। কিন্তু শিকারজীবী অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে ক্ল্যান সংগঠন রয়েছে।

রক্ষিতা-সম্পর্ক

প্রাচীন আর্য বা হিন্দুসমাজে উপপত্নী প্রথা (Concubinage) ছিল।

বৈদিক আর্যদের গৃহস্থালীতে দাসী-অসুরী-শূদ্রা, অর্থাৎ, অনার্য জাতীয়া উপপত্নী থাকত, দাসীপুত্র বা অসুরীপুত্র সবর্ণাজাত পুত্রের সমান মর্যাদা পেত না। কণ্বের শূদ্রা বা অসুরী উপপত্নী ছিল। কবষ দাসী-পুত্র ছিলেন। অনন্যপূর্বা পরিচারিকা, অর্থাৎ, যার অন্য পুরুষের সহিত সম্পর্ক হয়নি, —নায়িকা হিসেবে গণ্য হয়েছে ঘোটকমুখের মতে। [প ব্রা ১৪। ৬। ৬ ; জৈ ব্রা ৩। ২৩৪, ২৩৫ ; ঐ ব্রা ২। ৩। ১ ; কৌ ব্রা ১২। ৩ ; কামসূত্র ১।৫।২৪]

বাংলাদেশে ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে নব-বাবু-বিলাস ও নব-বিবি-বিলাস নাগরিক পরিবেশে দেখা দিয়েছিল।

নব বাবুরা শহুরে সভ্যতার সদ্যোজাত বিলাসী বুর্জোয়া বা মধ্যশ্রেণী। "মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমী দান, আড়িঘুড়ি কানন-ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ"। এই বাবুদের মধ্যে একাংশ গণিকাসক্ত ছিল, একাংশ রক্ষিতা পোষণ করত। কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ষিতা গণিকার নামান্তর। কিন্তু বহুক্ষেত্রে রক্ষিতা ছিল উপপত্নী (mistress), একমাত্র পারিপালকের রতিসঙ্গিনী। তার সামাজিক মর্যাদা না থাকলেও তার সন্তানেরা জন্মদাতা "বাবুর" দ্বারা সমাজে পিতৃপরিচয় দিত। এখনও সমাজ থেকে রক্ষিতা-সম্পর্ক উঠে যায়নি। [পৃ ২০, নব বাবু বিলাস, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩৪]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে ভদ্রলোকেরা নিগ্রো ক্রীতদাসীকে উপপত্নীরূপে ব্যবহার করতেন। সম্পন্ন শহরবাসীরা রক্ষিতা পোষণ করতেন। বিবাহিত জীবনের বাইরে যৌন শিথিলতার অনুমোদন হচ্ছে double moral standard বা দ্বৈত নৈতিকতার নিদর্শন। ঈদৃশ দ্বৈত নৈতিকতা সভ্য ও অসভ্য নির্বিশেষে সকল সমাজেই দৃষ্ট হয়।

(৩) আত্মীয়তা

আত্মীয়-সম্বন্ধ (জ্ঞাতি ও কুটুম্ব)

আত্মীয় সম্বন্ধ (kinship) প্রজনন-বৃত্তি থেকে উদ্ভূত। এই বৃত্তির ফলে দুই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যথা,—(১) স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ (bond between spouses) এবং (২) পিতামাতা ও সন্তানের (siblings) সম্বন্ধ।

বিবাহ-জাত আত্মীয় হচ্ছে কুটুম্ব (affinal kin, affinity)। যথা, স্বামীর তরফে শ্যালক বা স্ত্রীর ছোট ভাই, সম্বন্ধী বা স্ত্রীর বড় ভাই, শ্বশুর বা স্ত্রীর পিতা, শাশুরী বা স্ত্রীর মাতা, শ্যালকের পুত্রকন্যা ইত্যাদি। স্ত্রীর তরফে দেবর, ভাশুর, ননদ, ননাস বা স্বামীর বড় বোন ইত্যাদি।

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ হচ্ছে রক্ত-সম্পর্ক। রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয় হচ্ছে জ্ঞাতি বা সজাত (consanguineous kin, consanguinity)। পিতামহ, পিতা, পুত্র, পৌত্র ইত্যাদি জ্ঞাতি। জ্যেঠা, কাকা, জ্যেঠাত ভাই বোন, কাকাত ভাই বোন, নিজের ভাই বোন—এরা সব পরস্পরের জ্ঞাতি।

নিজের পিতা প্রাথমিক জ্ঞাতি (primary consanguineous kin)। নিজের কাকা-জ্যেঠা একান্তর জ্ঞাতি (secondary consanguineous kin)। নিজের স্ত্রী প্রাথমিক কুটুম্ব (primary affinal kin)। নিজের শ্যালক একান্তর কুটুম্ব (secondary affinal kin)। [Majumdar and Madan, pp. 98, 99]

বংশ, কুল, গোত্র

বংশ বা কুল (lineage) একধারাবিশিষ্ট (unilateral)। মাতার ধারায় বংশ গণনা হয়, কিংবা পিতৃধারায় হয়। প্রথমটিতে বংশ মাতৃ-ধারাবিশিষ্ট (matriliny); দ্বিতীয়টিতে বংশ পিতৃধারাবিশিষ্ট (patriliny)। প্রথমটিতে পিতার ধারা উপেক্ষিত, দ্বিতীয়টিতে মাতার ধারা উপেক্ষিত। আমরা পিতৃধারাবিশিষ্ট বংশের সঙ্গে পরিচিত। আসামের খাসি কৌমে মাতৃধারার বংশই চল্‌তী।

বংশধারায় রক্ত-সম্পর্ক প্রমাণযোগ্য। এ স্থলে আদি পিতা (ancestor) বা আদি মাতা (ancestress) থেকে যে বংশধারা টানা হয়, তা প্রমাণ করা যায়। যথা, ঐতিহাসিক রাজ-বংশগুলি, বাঙ্গালী বৈষ্ণবমহলে অদ্বৈত-বংশ, নিত্যানন্দ-বংশ ইত্যাদি।

লাউই সঙ্কীর্ণ অর্থে কিন্‌ (kin) সম্বন্ধ ধরেছেন। কিন্‌ হচ্ছে অপ্রমাণযোগ্য বংশধারা। এ স্থলে আদি পিতা বা আদি মাতা থেকে বংশধারা কল্পিত হয়। এ ধরণের কিন্‌-এর বাচক বাংলা বা সংস্কৃত শব্দ নেই। কিন্‌-এর প্রায় সমার্থক জ্ঞাতি। লাউইর সংজ্ঞানুসারে কিন্‌ হচ্ছে অপ্রমাণযোগ্য একধারাবিশিষ্ট বংশধারা।

কিন্‌ যদি বহির্বিবাহ-রীতিকে (exogamy) অনুসরণ করে, তাহলে ক্ল্যান-রূপে (clan) বিবেচিত হয়। লাউইর মতে ক্ল্যান হচ্ছে বহির্বিবাহ-রীতিযুক্ত অপ্রমাণযোগ্য একধারাবিশিষ্ট বংশধারা। আর্য গোত্র হচ্ছে ক্ল্যান-সংগঠন।

প্রকৃত বা কল্পিত রক্ত-সম্পর্কিত গোষ্ঠী :—

(১) কিন্‌ বা জ্ঞাতি (kin);

(২) ক্ল্যান বা গোত্র।

ক্ল্যান হচ্ছে বহির্বিবাহ-রীতি-যুক্ত কল্পিত এক রক্তের গোষ্ঠী। এজাতীয় গোষ্ঠীর বাচক কয়েকটি শব্দ উল্লিখিত হচ্ছে। যথা,—

(১) সংস্কৃত গোত্র ;

(২) গ্রীক গেনোস, genos ;

(৩) লাতীন জেন্স, gens (মর্গান-প্রযুক্ত) ;

(৪) অ্যাংলো-স্যাকসন সিব, sib (লাউই-প্রযুক্ত) ;

(৫) আইরিশ সেপ্ট, sept ;

(৬) গথিক কুনি, kuni, বংশ ;

(৭) স্কটিশ ক্ল্যান, clan ;

(৮) আলবেনীয় ফ্রারা, phrara ;

(৯) মধ্যভারতীয় কৌমগুলির কিলি, killi (হো, মুণ্ডা, সাঁওতাল সংগঠন)।

অ্যাগ্‌নেট ও কগ্‌নেট আত্মীয়

পিতৃধারাবিশিষ্ট জ্ঞাতি হচ্ছে অ্যাগ্‌নেট (agnate)। আভিধানিক অর্থে পিতার বা মাতার ধারাবিশিষ্ট জ্ঞাতি হচ্ছে কগ্‌নেট (cognate)। আইনের কেতাবে মাতৃধারার বা নারীর ধারার আত্মীয়েরা কগ্‌নেট-রূপে বিবেচিত। যথা,—

(১) আত্মবন্ধু—নিজের মামাত, পিসাত, মাসতুত ভাই ;

(২) পিতৃবন্ধু—পিতার মামাত, পিসাত, মাসতুত ভাই ;

(৩) মাতৃবন্ধু—মাতার মামাত, পিসাত, মাসতুত ভাই ;

(৪) নিজের মাতুল, মাতামহ, দৌহিত্র ইত্যাদি। [মিতাক্ষরা দায়-বিভাগ, সুখময় ভট্টাচার্য্য, ১৩৫৪, পৃ ২৮]

মিতাক্ষরা-কথিত বন্ধু বা ভিন্নগোত্র সপিণ্ডেরা হচ্ছে কগ্‌নেট আত্মীয়। নিজের গোত্র হচ্ছে পিতৃধারার গোত্র। নিজের গোত্র থেকে ভিন্ন কগ্‌নেটদের গোত্র। নিজের গোত্র ও অ্যাগনেটদের গোত্র অভিন্ন। গোত্রজ সপিণ্ডেরা হচ্ছে অ্যাগ্‌নেট আত্মীয়। যথা, পিতামহ, পিতৃব্য, তাঁর পুত্র ইত্যাদি। (যাজ্ঞবল্ক্য ২। ১৩৫, ১৩৬, মিতাক্ষরা)

মিতাক্ষরা-কথিত বন্ধু-তালিকায় নয়টি সম্বন্ধ উল্লিখিত হয়েছে। এই তালিকায় আরও সম্বন্ধ সূচিত হয়। মামাত ভাই যদি বন্ধু-রূপে গণ্য হয়, তাহলে মাতুলও বন্ধু-রূপে বিবেচনার যোগ্য। মাতুলকে বন্ধু-রূপে বিবেচনা করলে মাতামহকেও বন্ধু বলতে হবে। এই বিচারে ভাগিনেয়ও বন্ধু। প্রকৃতপক্ষে দৌহিত্রও বন্ধু। কিন্তু উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মিতাক্ষরার মতে দৌহিত্রকে গোত্রজ সপিণ্ডদের সঙ্গে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

(Principles of Hindu Law, D. F. Mulla, 1919, pp. 36, 47-49.)

বৌধায়ন-কথিত সপিণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত সকলেই পরস্পরের অ্যাগ্‌নেট আত্মীয়। এই গোষ্ঠীতে **স্বয়ং, নিজের উপরের তিন প্রজন্ম** (degrees) এবং নীচের তিন প্রজন্ম অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং এই সপিণ্ড গোষ্ঠী পিতৃধারাবিশিষ্ট। (বৌ ধ সূ ১। ৫। ১১। ৭)

নিজের ভাই, বাবা, কাকা, ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার ভাই, নিজের ছেলে, পৌত্র ইত্যাদি অ্যাগ্‌নেট আত্মীয়।

সগোত্র ও সপিণ্ড

সগোত্র গোষ্ঠী হল এক ক্ল্যানের সব লোকেরা। আর্য সংগঠন হিসেবে সগোত্র গোষ্ঠী পিতৃধারাবিশিষ্ট।

ভরদ্বাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত সব লোক পরস্পরের সগোত্র। বিশ্বামিত্র গোত্রের সব লোক পরস্পরের সগোত্র। এক্ষেত্রে ভরদ্বাজ আদি পিতা, বিশ্বামিত্র আদিপিতা। ভরদ্বাজগোত্রীয় মানে ভরদ্বাজের বংশধর। বিশ্বামিত্রের গোত্রীয় মানে বিশ্বামিত্রের বংশধর। এই বংশগত আত্মীয়তায় বিশ্বাস অপ্রমাণযোগ্য।

বৌধায়ন-কথিত সপিণ্ড গোষ্ঠীতে সকলেই একগোত্রের লোক। এই গোষ্ঠীতে নিজেকে ধরে সাত প্রজন্ম অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই সপিণ্ড গোষ্ঠীর আয়তন সগোত্র গোষ্ঠীর আয়তন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। সগোত্র গোষ্ঠীতে প্রজন্মের সংখ্যা সীমিত নয়। সপিণ্ড গোষ্ঠীতে প্রজন্মের সংখ্যা সীমিত। সগোত্র গোষ্ঠী অসীম, সপিণ্ড গোষ্ঠী সীমাবদ্ধ,—বংশধারার বিচারে।

মিতাক্ষরার মতে সপিণ্ড দুই প্রকার,—(১) গোত্রজ সপিণ্ড এবং (২) ভিন্নগোত্র সপিণ্ড বা বন্ধু। গোত্রজ সপিণ্ডরা হল অ্যাগ্‌নেট আত্মীয়। বন্ধুরা হল কগ্‌নেট আত্মীয়। ব্যাপক অর্থে সপিণ্ড গোষ্ঠীর মধ্যে অ্যাগ্‌নেট ও কগ্‌নেট উভয়বিধ আত্মীয়ই অন্তর্গত। সংকীর্ণ অর্থে গোত্রজ সপিণ্ডরাই হল সপিণ্ড। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এরূপ সপিণ্ডের দাবি আগে বিবেচ্য, তার পরে সমানোদকের দাবি বিবেচ্য। সমানোদকের পরে বন্ধুদের দাবি বিবেচ্য। গোত্রজ সপিণ্ড ও সমানোদক উভয়েই এক গোত্রভুক্ত। বন্ধুরা হল অন্যগোত্রভুক্ত সপিণ্ড।

দায়ভাগের মতে সপিণ্ড গোষ্ঠীতে অ্যাগ্‌নেট ও কগ্‌নেট উভয় প্রকার আত্মীয়ই আছে। এরূপ গোষ্ঠীতে নিজের গোত্রজ আছে, আবার অন্য গোত্রজও আছে। সকুল্য গোষ্ঠীতে শুধু নিজের গোত্রজ আছে। সমানোদক গোষ্ঠীতেও শুধু নিজের গোত্রজ অন্তর্ভুক্ত। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে সপিণ্ড, তারপর সকুল্য, তারপর সমানোদক বিবেচ্য।

সপিণ্ড ও সকুল্য

দায়ভাগের বিচারে শ্রাদ্ধকর্মের পিণ্ডদানে ও পিণ্ডগ্রহণে যে যোগ্য বিবেচিত হয় সেই সপিণ্ড। মিতাক্ষরার মতে পিণ্ড দেহ-বাচক, সপিণ্ড হচ্ছে এক দেহের সঙ্গে, অর্থাৎ, এক রক্তের সঙ্গে যুক্ত আত্মীয় বিশেষ সীমার মধ্যে। [দায়ভাগ ১২৫ ; Mulla, pp. 26, 83-87.]

দায়ভাগ অনুসারে সপিণ্ড গোষ্ঠীতে স্বয়ং, নিজের উপরের তিন প্রজন্ম, নীচের তিন প্রজন্ম, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, দৌহিত্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, এরূপ গোষ্ঠীতে অ্যাগ্‌নেট ও কগ্‌নেট উভয় প্রকার আত্মীয়ই অন্তর্ভুক্ত। দায়ভাগ-কথিত সকুল্য গোষ্ঠীতে প্রপিতামহের উপরের তিন প্রজন্ম এবং প্রপৌত্রের নীচের তিন প্রজন্ম অন্তর্ভুক্ত। এরূপ গোষ্ঠীভুক্ত সকলেই পরস্পরের অ্যাগ্‌নেট। সকুল্য পূর্ব পুরুষ পিণ্ডলেপ পাবার যোগ্য। সমানোদক হল সকুল্যদের উপরে সাত প্রজন্ম এবং নীচে সাত প্রজন্ম। এরা সবাই নিজের অ্যাগ্‌নেট আত্মীয়। সমানোদক পূর্বপুরুষ বংশধরের তর্পণজল পাবার যোগ্য। [জীমূতবাহনের মত ; দায়ভাগ ১২৫, ১২৬, ১৬৯]

মিতাক্ষরার মতে ব্যাপক অর্থে সপিণ্ড গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত স্বয়ং, নিজের উপরের ছয় প্রজন্ম এবং নীচের ছয় প্রজন্ম, আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু, মাতৃবন্ধু, মাতামহ, মাতুল ইত্যাদি, অর্থাৎ, এরূপ গোষ্ঠীতে অ্যাগ্‌নেট ও কগ্‌নেট উভয় প্রকার আত্মীয়ই গৃহীত হয়েছে। [বিজ্ঞানেশ্বরের মত]

বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির মিতাক্ষরা-টীকা রচনা করেন, অপরপক্ষে জীমূতবাহন-কৃত দায়ভাগ স্বতন্ত্র গ্রন্থ। দায়ভাগের মত বঙ্গদেশে প্রচলিত। মিতাক্ষরার মত উত্তর ভারতে প্রচলিত। মিতাক্ষরার মতে সপিণ্ড দুইপ্রকার। যথা, (১) গোত্রজ সপিণ্ড এবং (২) ভিন্নগোত্র সপিণ্ড বা বন্ধু। গোত্রজ সপিণ্ডরা অ্যাগ্‌নেট আত্মীয়। বন্ধুরা কগ্‌নেট আত্মীয়। ব্যাপক অর্থে সপিণ্ডের মধ্যে গোত্রজ এবং বন্ধুরা অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সপিণ্ডের মধ্যে অ্যাগ্‌নেট এবং কগ্‌নেট উভয়েই রয়েছে। মিতাক্ষরার বন্ধু-তালিকাটি অসম্পূর্ণ। পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা অনুসারে বন্ধু-তালিকায় মাতামহ, মাতুল ও ভাগিনেয় ধর্তব্য। দৌহিত্রও বন্ধু হওয়া উচিৎ। কিন্তু উত্তরাধিকার-সূত্রে দৌহিত্রকে গোত্রজ সপিণ্ডদের সঙ্গে স্থাপিত করা হয়েছে। সংকীর্ণ অর্থে গোত্রজ সপিণ্ডরাই হল সপিণ্ড, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত—(১) স্বয়ং ; (২) নিজের উপরের ছয় পুরুষ বা প্রজন্ম ; (৩) নিজের নীচের ছয় প্রজন্ম। অর্থাৎ, ১৩ পুরুষ সপিণ্ড। সপিণ্ডদের উপরে সাত পুরুষ এবং নীচে সাত পুরুষ হল সমানোদক। অর্থাৎ, ১৪ পুরুষ সমানোদক। [Mulla, pp. 26-28 ; Marriage and Family in India, K. M. Kapadia, 1968 pp. 241-244]

দায়ভাগের মতে ধনাধিকারের জন্য উক্তপ্রকারে সপিণ্ড ও সকুল্য বিচার করা হয়েছে। অশৌচের জন্য সপিণ্ড এবং সকুল্য উভয়েই সপিণ্ড-রূপেই ধার্য হবে। সুতরাং অশৌচাদির ক্ষেত্রে সাতপুরুষ সপিণ্ড সম্পর্ক ধরা হচ্ছে। এরূপ ক্ষেত্রে নিজেকে ধরে উপরে সাত পুরুষ এবং নীচে সাত পুরুষ সপিণ্ড। (দায়ভাগ ১২৬)।

অধস্তন পুরুষ বা প্রজন্ম হল পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র, অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র, অত্যতি বৃদ্ধপ্রপৌত্র ইত্যাদি। ঊর্ধ্বতন পুরুষ হল পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ইত্যাদি।

মিতাক্ষরার মতে উত্তরাধিকার-ক্রম এই প্রকার ;—সপিণ্ডদের মধ্যে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা স্ত্রী, কন্যা, দৌহিত্র ইত্যাদি ; এর পরে সমানোদক ; এর পরে বন্ধু। প্রথমে আত্মবন্ধু, তারপরে পিতৃবন্ধু, তারপরে মাতৃবন্ধু। অর্থাৎ, নিজের পিসাত ভাই বা পিতামহের দৌহিত্র পূর্বে অধিকারী, তার পরে অধিকারী পিতার পিসাত ভাই বা প্রপিতামহের দৌহিত্র। নিজ দৌহিত্রের অনেক পরে অধিকারী পিতামহের দৌহিত্র এবং তার পরে প্রপিতামহের দৌহিত্র। এই তালিকায় তাৎপর্য অনুসারে পিতামহের দৌহিত্রের পূর্বে পিতার দৌহিত্র ধর্তব্য। সপিণ্ডদের সঙ্গে নিজ দৌহিত্র স্থান পেয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে স্থান পেয়েছে পিতার দৌহিত্র, পিতামহের দৌহিত্র, প্রপিতামহের দৌহিত্র। **দায়ভাগের মতে** উত্তরাধিকারের ক্রম হচ্ছে ;—পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা স্ত্রী, কন্যা, দৌহিত্র ; এর কয়েক ধাপ পরে পিতার দৌহিত্র ; আরও কিছু ধাপ পরে পিতামহের দৌহিত্র ; আরও কতিপয় ধাপ পরে প্রপিতামহের দৌহিত্র। এরা সকলেই সপিণ্ড ; এদের পরে অধিকারী সকুল্য ; তার পরে অধিকারী সমানোদক। এবিষয়ে কৃষ্ণ তর্কালংকার-কৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ; দায়ভাগ ১৭৩।

মিতাক্ষরায় স্ত্রীর ও কন্যার উত্তরাধিকার-প্রাপ্ত ধনে ভোগ-স্বত্ব স্বীকৃত হয়েছে। দায়ভাগেও তাই। স্বামীর ধনে স্ত্রীর বা পিতার ধনে কন্যার দান-বিক্রয়াধিকার নাই। উভয় মতেই কন্যার পরে দৌহিত্রের অধিকার। দৌহিত্রের পূর্ণস্বত্ব। **মিতাক্ষরার তালিকায়** পিতার দৌহিত্র, পিতামহের দৌহিত্র ও প্রপিতামহের দৌহিত্র নামে মাত্র উত্তরাধিকারী, যেহেতু এরা বন্ধু-রূপে গণ্য। বন্ধুদের উত্তরাধিকারের বাস্তব সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। **দায়ভাগের তালিকায়** পিতার এবং পিতামহের ও প্রপিতামহের দৌহিত্ররা সপিণ্ড-রূপে গণ্য। অনেক কম ধাপ ডিঙিয়ে এরা উত্তরাধিকারী হতে পারে। এদের উত্তরাধিকারের বাস্তব সম্ভাবনা অংশত আছে। দৌহিত্রগণের প্রতি দায়ভাগের এই পক্ষপাত এবং সপিণ্ডের ব্যাখ্যা থেকে

সম্ভবত একটি সামাজিক পরিস্থিতি সূচিত হয়। বাংলাদেশে কৌলীন্যের মূলীভূত ছিল অনুলোম বিবাহ-রীতি (hypergamy)। এই রীতিতে বহুস্ত্রী-বিবাহ আবশ্যকীয় হত এবং বিবাহের পরে বহু কন্যা পিতৃগৃহে থাকত। এইসূত্রে কন্যার ও বিভিন্ন প্রকার দৌহিত্রের উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি আবশ্যক হয়েছিল,—এরূপ অভিমত পণ্ডিত-মহলে ব্যক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য প্রথা থেকে পারিবারিক ব্যবস্থাও বদলেছে। যথা, মাতৃ-আবাসিক বিবাহ (matrilocal marriage) চালু হয়েছে,—বিবাহের পরে স্ত্রী পিতৃগৃহেই থাকত এবং সেখানেই স্বামী এসে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। তার সন্তানেরাও তার সঙ্গে থাকত। পিতার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ থাকত না বলা চলে। এরূপ পরিস্থিতিতে মেয়েদের কিছু কিছু অধিকার নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে স্বীকৃতি পেয়েছে। নারীর প্রতি অবহেলা ও অনাদর এবং কন্যাজন্মের প্রতি বিতৃষ্ণাও বোধ হয় ঈদৃশ কারণ-প্রসূত, বিশেষত ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে। [Mulla, pp. 31–36, 47—49, 58—61, 89—91.]

বিবাহের ক্ষেত্রে ও শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রে সপিণ্ড আত্মীয়ের গণনা করার ব্যবস্থা হয়েছে। পিতৃধারার আত্মীয়-আত্মীয়াকে বিবাহে বর্জনীয় করবার উদ্দেশ্যে সগোত্র-গণনা। পিতার ও মাতার উভয়ের সম্পর্কিত আত্মীয়-আত্মীয়াকে বিবাহে বর্জনীয় করবার উদ্দেশ্যে সপিণ্ড-গণনা। শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রে সপিণ্ড আত্মীয় পিণ্ড পাবার যোগ্য, সকুল্য আত্মীয় পিণ্ডলেপ পাবার যোগ্য এবং সমানোদক আত্মীয় তর্পণ-জল পাবার যোগ্য।

সপিণ্ডীকরণ

মৃত্যুর একবৎসর পরে করণীয় শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ নামে কথিত হয়। এর তাৎপর্য প্রেত পুরুষকে সপিণ্ড-রূপে মর্যাদা দান। এই শ্রাদ্ধকর্মের ফলে প্রেত পুরুষ (পিতা), পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষ সপিণ্ড-রূপে গণ্য হন। এই সময় থেকে শ্রাদ্ধকারীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রাদ্ধকর্মের বিচারে সপিণ্ড-তালিকা থেকে বাদ পড়েন। বাঙালী হিন্দু সমাজে সপিণ্ডীকরণ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান-রূপে গণ্য। শ্রাদ্ধাদি কর্ম পূর্ব পুরুষ-পূজার (ancestor-worship) নিদর্শন।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হল একজনের উদ্দেশে, অর্থাৎ, মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান এবং পিণ্ডদান। এর দ্বারা মৃতের প্রেতত্ব বিমোচন হয় না। এক বছর পরে যে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তার দ্বারা প্রেতত্ব থেকে নিষ্কৃতি হয়। এই অনুষ্ঠানে বৃদ্ধ প্রপিতামহ, প্রপিতামহ ও পিতামহের জন্য তিন পিণ্ড এবং প্রেতের জন্য একটি পিণ্ড প্রস্তুত হয়। প্রেতের পিণ্ডটিকে ভাগ ক'রে ঐ তিন পিণ্ডের সঙ্গে মিশান হয়। এর নাম পিণ্ড-সমন্বয়। এর

দ্বারা প্রেতাত্মা সপিণ্ড পিতৃ-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। এস্থলে সপিণ্ড মানে পিতৃগণের সঙ্গে পিণ্ড পাবার যোগ্য।

বিবাহাদিতে আবশ্যক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অন্য নাম নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধে পিত্রাদি তিন পুরুষের পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান ছিল প্রাচীনবিধি, যেহেতু পিত্রাদি তিন পুরুষ, অর্থাৎ, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ হলেন অশ্রুমুখ পূর্বপুরুষ এবং তাঁদের পূর্বপুরুষেরা হলেন নান্দীমুখ পূর্বপুরুষ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে নান্দীমুখ পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদত্ত হয়। [Social and Religious life in the Grihya Sutras, V. M. Apte, 1954, pp. 256-259.]

বঙ্গদেশীয় বৃদ্ধশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে নান্দীমুখ পূর্বপুরুষরূপে গণ্য পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ইত্যাদি। বিবাহের আদিতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করতে হয়। পিতা বেঁচে থেকে যদি কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহলে তিনি নিজ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতিকে পিণ্ড দান করেন. রঘুনন্দনের মতে। পিতার মৃত্যু হলে বিবাহ্য ব্যক্তির পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করণীয়। (উদ্বাহতত্ত্বম্ ৪১, ৪২)

পিতৃধারা ও মাতৃধারা

কৌমা সমাজে প্রায় সর্বত্র পিতৃধারাবিশিষ্ট ক্ল্যান-বিভাগ অথবা মাতৃধারা-বিশিষ্ট ক্ল্যান-বিভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। পিতৃধারায় আদি পিতা থেকে বংশ গণনার ব্যবস্থা। মাতৃধারায় আদিমাতা থেকে বংশ গণনার রীতি।

পিতৃধারাবিশিষ্ট গোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত ঃ—

(১) ভারতীয় আর্যগণ। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়গণ।

(২) চীনের অধিবাসীগণ।

(৩) প্রাচীন য়িহুদীগণ।

(৪) আফ্রিকার জুলু, Zulu গোষ্ঠী ; থঙ্গা, Thonga গোষ্ঠী।

(৫) আফ্রিকার বহিম, Bahima গোষ্ঠী।

(৬) ক্যালিফোর্ণিয়ার শাস্তা, Shasta ; মিয়োক, Miwok ; য়োকুট্স, Yokuts গোষ্ঠী।

(৭) উত্তর আমেরিকার ওমাহা, Omaha গোষ্ঠী ; ওজিবোয়া, Ojibwa গোষ্ঠী।

(৮) ব্রেজিলের শেরেন্টে, Sherente গোষ্ঠী।

(৯) অস্ট্রেলিয়ার মার্ণগিন, Murngin গোষ্ঠী ; ক্যারিয়েরা, Kariera গোষ্ঠী।

(১০) মধ্যভারতের ওরাওঁ, হো, খারিয়া প্রভৃতি গোষ্ঠী, নাগাল্যাণ্ডের নাগা গোষ্ঠী।

(১১) আরবীয়গণ, তুরস্কের কুর্দগণ, Kurds।
(১২) সাইবেরিয়ার কিরগিজ, Kirgiz; টুঙ্গুস, Tungus প্রভৃতি গোষ্ঠী।
[সাইবেরিয়ায় মাতৃধারার কোন দৃষ্টান্ত নেই।]

মাতৃধারাবিশিষ্ট গোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত :—

(১) আসামের খাসি গোষ্ঠী, গারো গোষ্ঠী ; মালাবারের নায়ার গোষ্ঠী।
(২) মেলানেসিয়ার ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ।
(৩) ব্রেজিলের ক্যানেলা, Canella গোষ্ঠী ; বোরোরো, Bororo গোষ্ঠী।
(৪) নিউইয়র্ক স্টেটের ইরোকয়, Iroquois গোষ্ঠী ; মণ্টানার ক্রো, Crow গোষ্ঠী ; উত্তর আরিজোনার হোপি, Hopi গোষ্ঠী ; নিউ মেক্সিকোর জুনি, Zuni গোষ্ঠী ; উত্তর আরিজোনার নাভাহো, Navaho গোষ্ঠী ; উত্তর ডাকোটার হিদাৎসা, Hidatsa গোষ্ঠী ; নেব্রাস্কার পণি, Pawnee গোষ্ঠী ; আলাবামার ক্রিক, Creek গোষ্ঠী।
(৫) গায়েনার আরাওয়াক, Arawak গোষ্ঠী।
(৬) অস্ট্রেলিয়ার ডিয়েরি, Dieri গোষ্ঠী।
(৭) সিংহলের বেদ্দ, Vedda গোষ্ঠী।

কতকগুলি গোষ্ঠীতে পিতার ও মাতার উভয়ের ধারাই গণনা করা হয়। এ জাতীয় উভয় ধারাবিশিষ্ট গোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত :—

(১) নীলগিরি পাহাড়ের টোডা গোষ্ঠী ;
কোচিনের কাদার, Kadar গোষ্ঠী ;
উত্তর প্রদেশের খশ গোষ্ঠী ;
দায়ভাগ-বর্ণিত সপিণ্ড ;
মিতাক্ষরা-বর্ণিত সপিণ্ড (ব্যাপক অর্থে)।
(২) আফ্রিকার হেরেরো, Herero গোষ্ঠী।
(৩) কলম্বিয়ার চিবচা, Chibcha গোষ্ঠী।
(৪) আফ্রিকার আসান্তি, Ashanti গোষ্ঠী।
(৫) অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীগণ।

টোডাদের ভিতরে মাতৃধারাবিশিষ্ট সংগঠনের দ্বারা বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়, আবার অন্য প্রয়োজনে পিতৃধারাবিশিষ্ট সংগঠনও রয়েছে। এদের মধ্যে বহুপতিবিবাহ প্রচলিত। বৃত্তিতে এরা গোয়ালা, মহিষপালক। টোডা মেয়েরা অশুচি-রূপে গণ্য, এরা গোয়ালের ধারে যেতে পারে না, দুধ দুইতে পারে না, দুগ্ধজাত কোন দ্রব্য প্রস্তুত করাও এদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু তাই বলে এরা ঘৃণার পাত্রী নয়।

পিতৃশাসন ও মাতুল-প্রাধান্য

প্রাচীন আর্যদের মধ্যে ও বর্তমান কালের হিন্দুদের মধ্যে পিতৃধারা-যুক্ত পিতৃশাসন (patriarchy) পারিবারিক বৈশিষ্ট্য-রূপে প্রতিভাত হয়। বৈদিক পরিবারে পিতাই ছিলেন কর্তা বা পরিচালক। এখনকার হিন্দু পরিবারেও সেই ব্যবস্থাই চালু। ইতিহাসের দুই একটি রাণী-শাসনের নজীরকে মাতৃ-কর্তৃত্বের প্রমাণ হিসেবে খাড়া করা যায় না। ইংলণ্ডে রাণী-শাসনের কালে পারিবারিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে না, তা পিতৃশাসিতই থেকে যায়। মাতৃ-ধারাবিশিষ্ট গোষ্ঠীগুলিতেও মাতৃ-কর্তৃত্ব (matriarchate) বড় দেখা যায় না, তার পরিবর্তে দৃষ্ট হয় মাতুল-প্রাধান্য (avunculate)। খাসি সমাজে পুরুষেরা চাষ করে, মেয়েরা কাপড় বোনে, তবে অর্থনীতিতে ও ধর্মাচরণ প্রভৃতিতে মেয়েদের প্রতিপত্তি পুরুষের তুলনায় বেশি এবং কতকটা মাতৃকর্তৃত্বের কাছাকাছি যায়। খাসি পরিবারে স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই কর্তা, স্ত্রী নয়। খাসি স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে তাকে তার স্বামী মেরে ফেলতে পারে। মাতৃধারাবিশিষ্ট ইরোকয়দের মধ্যে মেয়েরা গোষ্ঠী-প্রধানকে মনোনীত করে বটে, কিন্তু গোষ্ঠী-প্রধানটি একজন পুরুষ।

বস্তুতপক্ষে মাতৃধারাবিশিষ্ট গোষ্ঠীতে যথার্থ নারী-শাসন আবিষ্কৃত হয়নি, পুরুষের হীনাবস্থাও দেখা যায়নি। পিতৃশাসিত সমাজে বাহ্য দৃষ্টিতে পুরুষের অধীনতা-পাশে আবদ্ধা নারী, তবে স্ত্রৈণ পুরুষও আছে, গৃহিণী-পণায় নারীর সুবিধাসুযোগও (prerogatives) স্বীকৃত, বহুক্ষেত্রেই নারী নিচক পুতুলের ঘরের পুত্তলিকা-মাত্র নয়। বহুস্ত্রীযুক্ত (polygynous) আরবীয় পরিবারে মেয়েদের স্বাধীন চাল-চলন বিষয়ে বিবরণ পরিবেষিত হয়েছে। [Social Organization, Lowie, pp. 262, 263]

মাতৃধারাবিশিষ্ট সমাজে বহুক্ষেত্রে পুরুষ আত্মীয়দের তালিকায় মাতুলের স্থানটি অগ্রগণ্য। এরূপ ব্যবস্থার নাম মাতুল-প্রাধান্য (avunculate)। (লাতীন avunculus, অ্যাভাঙ্কুলাস, মাতুল।) কোথাও কোথাও পিসীর প্রাধান্য (amitate) লক্ষিত হয়। যথা, বাঙ্গালী পরিবারে বিধবা পিসীর প্রাধান্য। (লাতীন amita, অমিতা, পিসী।) পিতৃধারাবিশিষ্ট সমাজে পিসীর প্রাধান্য স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু কখনও কখনও মাতৃধারাবিশিষ্ট সমাজেও পিসীর প্রাধান্য লক্ষিত হয়েছে, যথা, তোপি গোষ্ঠীতে, ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপবাসীদের মধ্যে। আবার, পিতৃধারাবিশিষ্ট পিতৃশাসিত গোষ্ঠীতেও মাতুলের প্রাধান্য বিষয়ক নজীর রয়েছে, যথা, অস্ট্রেলিয়ার মার্ণগিন গোষ্ঠীতে। বঙ্গদেশীয় অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে মাতুল শিশুর মুখে ভাত দেয়। এই রীতিও মাতুলকে স্বীকৃতি দানের দৃষ্টান্ত।

একটি ব্যাখ্যা অনুসারে মাতৃধারার ক্ষেত্রে পিসীর প্রাধান্যের এবং পিতৃ-

ধারার ক্ষেত্রে মামার প্রাধান্যের পিছনে সম্ভাব্য কারণ হল কোন রক্ত সম্পর্ক উপেক্ষিত না হয় এরূপ বিবেচনা। মাতৃধারায় পিসী যেমন উপেক্ষিত হতে পারে, তেমনি পিতৃধারায় মাতুল অবজ্ঞাত হতে পারে।

আত্মীয়তা সম্পর্কীয় আচার

আত্মীয়তা সম্পর্কিত বিবিধ আচার (kinship usages) বিভিন্ন সমাজে চালু রয়েছে। এ জাতীয় কয়েকটি আচার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(১) **আঁতুড়ে পিতৃসংযমের রীতি** (couvade)। আঁতুড় হচ্ছে সূতিকাগার, যেখানে সন্তান প্রসূত হয়। আঁতুড় সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে এককালে পালিত হত, বর্তমানে প্রায় হয় না। পূর্বে মৃতাশৌচের (death impurity) মতো জন্মাশৌচ (birth impurity) পালিত হত ঘরে ঘরে। বর্তমানে হাসপাতালে প্রসবের ব্যবস্থা হওয়ায় জন্মাশৌচ প্রায় উঠে গেছে, মৃতাশৌচ পালনের রীতিতেও পরিবর্তন আসন্ন। খাসি ও টোডা গোষ্ঠীতে আঁতুড়ে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীকেও নানাবিধ সংযম পালন করতে হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে স্বামী-স্ত্রী কর্ম-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে। স্বামী রোগীর আহার্য খায় এবং নিষেধ বা টাবু পালন করে। খাসি স্বামী-স্ত্রী এই সময়ে নদী পার হয় না বা কাপড় ধোয় না।

কারও কারও মতে এই রীতি মাতৃধারা ও পিতৃধারার সংমিশ্রণের স্মারক। এই রীতির প্রচলন হয়, যখন মাতৃধারা বিলুপ্তির মুখে, পিতৃধারা গড়ে উঠছে। মাতৃধারায় পিতৃত্ব নিশ্চিত নয়, পিতৃধারায় পিতৃত্ব নিশ্চিত। পিতৃধারার বিকাশ-কালে পিতৃত্ব বিষয়ে নিশ্চয়তা-সূচক রীতি হিসেবে কাউভেড্ চালু হয়েছে।

এই মতের বিরুদ্ধে বলা চলে যে পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীতেও কাউভেড্ প্রথা চলতী। এরূপ গোষ্ঠীতে কোন কালে মাতৃধারা ছিল এমন আভাসও মেলে না। তাই পিতৃত্ব প্রমাণের জন্য কাউভেড্ প্রচলিত হয়েছে একথা যুক্তিযুক্ত নয়।

একমতে কাউভেড্ হচ্ছে বিবাহিত জীবনকে সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্য-প্রসূত রীতি। [Majumdar and Madan, p. 107]

(২) **পরিহার-সম্পর্ক** (avoidance)। বিভিন্ন প্রকার আত্মীয়ের মধ্যে পরিহার-সম্পর্ক বহুস্থলে দেখা যায়। সিংহলের বেদ্দ গোষ্ঠীতে ভাই বোনকে পরিহার করে। ভাইবোন এক ঘরে শোয় না, একসঙ্গে খায় না। ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপবাসীদের মধ্যে ভগ্নীর প্রেম-বিষয়ক আচরণ দেখা ভাইয়ের

পক্ষে নিষিদ্ধ। সাইবেরিয়ার য়ুকাগির (Yukaghir) গোষ্ঠীতে বধূ শ্বশুরের বা ভাশুরের মুখ দেখতে পারে না, জামাই শ্বশুর ও শ্বাশুরীর মুখ দেখে না। সাইবেরিয়ার ওস্‌টিয়াক (Ostyak) গোষ্ঠীতে বধূ শ্বশুরের সম্মুখে এবং জামাই শ্বাশুরীর সামনে কখনও যায় না· সাইবেরিয়ার কিরগিজ (Kirgiz) গোষ্ঠীতে বধূ শ্বশুরের মুখ দেখে না। বেদ্দদের মধ্যে জামাই শ্বাশুরীকে এড়িয়ে চলে।

মেলানেসিয়ার ব্যাঙ্কস্ দ্বীপাঞ্চলে জামাই শ্বশুর-শ্বাশুরীর নামোচ্চারণ করে না, বউ শ্বশুরের নাম মুখে নেয় না। (Name Taboo)

অস্ট্রেলিয়ায় জামাই ও শ্বাশুরী পরস্পরকে বর্জন করে। ক্যারিয়েরা গোষ্ঠীতে এ বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি।

আফ্রিকায় জুলু গোষ্ঠীতে জামাই শ্বাশুরীর উপস্থিতিতে নিজের মুখ আবৃত করে। আফ্রিকার বাণ্টু গোষ্ঠীগুলিতে ও মাসাই গোষ্ঠীতেও এরূপ রীতি।

উত্তর আমেরিকার ক্রো গোষ্ঠীতে জামাইয়ের পক্ষে শ্বশুর-শ্বাশুরীর সঙ্গে আলাপন নিষিদ্ধ। কিন্তু এই গোষ্ঠীতে বউর তরফে শ্বশুরের সহিত আলাপন নিষিদ্ধ নয়। নাভাহো গোষ্ঠীতে শ্বাশুরী ও জামাইয়ের মধ্যে পরিহার-রীতি।

টাইলরের ব্যাখ্যায় এরূপ রীতির উদ্ভব হয়েছে বাসস্থানের ব্যবস্থা থেকে। মাতৃ-আবাসিক রীতিতে জামাই আগন্তুক, তাই তাকে পরিহার রীতি। পিতৃ-আবাসিক ব্যবস্থায় বউ আগন্তুক, তাই তাকে পরিহারের রীতি। কিন্তু এই মত গ্রাহ্য নয়। অস্ট্রেলিয়ার ও দক্ষিণ আফ্রিকার পিতৃ-আবাসিক ব্যবস্থাতেও জামাই পরিহারের রীতি দৃষ্ট হয়। মাতৃ-আবাসিক হোপি গোষ্ঠীতে জামাই-শ্বাশুরীর পরিহার-রীতি নেই। (Primitive Society, pp. 84-96)

(৩) পরিহাস-সম্পর্ক (joking relationship)। বিভিন্ন আত্মীয়-আত্মীয়ার মধ্যে পরিহাস-সম্পর্ক অনেকস্থলে চলতী। ক্রো গোষ্ঠীতে শ্যালিকার সঙ্গে ভগ্নীপতি অশ্লীল তামাসা করতে অভ্যস্ত। এদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ অনুমোদিত ছিল· থঙ্গা গোষ্ঠীতে দেবর ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে, মামী ও ভাগ্‌নের মধ্যে পরিহাস-সম্পর্ক, কিন্তু ভাশুর ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে পরিহার-রীতি। এর মূলে রয়েছে দেবর-বিবাহ রীতি এবং মামী ও ভাগ্‌নের বিবাহ-রীতি। বড় শালীকে বিবাহ করা যায় না, তাই তার সঙ্গে পরিহাস-সম্পর্কও নেই। [Ibid., pp. 102.103]

ওরাওঁ গোষ্ঠীতে দাদু ও নাত্‌নীর বিবাহের একটি দৃষ্টান্ত, বৈগা গোষ্ঠীতে দিদিমা ও নাতির পরিণয়ের একটি খবর আমাদের গোচর হয়েছে।

এরূপ ক্ষেত্রে পরিহাস সম্পর্কও বর্তমান। [Majumdar and Madan, p. 105]

(৪) **সন্তানের নাম দ্বারা পরিচয়-রীতি** (teknonymy)। খাসিদের মধ্যে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউগিনিতে, চীনদেশে, সাইবেরিয়ায়, আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে, পিতামাতার নাম উল্লেখ না ক'রে অমুকের বাবা, অমুকের মা—এই প্রকার সন্তানের নামের সাহায্যে আহ্বান-রীতি বা পরিচয়-রীতি গড়ে উঠেছে। ক্ষেন্তির মার বা পটলের বাবার সাক্ষাৎ আমরাও পেয়ে থাকি বাংলার পল্লী অঞ্চলে।

টাইলরের মতে এই প্রথার সঙ্গে জড়িত মাতৃ-আবাসিক রীতি। এরূপ রীতিতে জামাই নেহাৎ আগন্তুক মাত্র, তাকে পত্নী-পক্ষায়েরা আপন বলে মনে করে না, তাই তাকে কোন প্রকার প্রাধান্য দেয় না এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তাকে নিছক সন্তানের পিতা-রূপেই গণ্য করে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা টেকে না, যেহেতু পিতৃ-আবাসিক ব্যবস্থাতেও এই প্রথা প্রচলিত।

গ্রীক টেকনোন, teknon মানে শিশু। এই সূত্র ধরে টেকনোনিমি হল সন্তানের নাম দ্বারা পরিচয়-রীতি।

আত্মীয় বা জ্ঞাতি-গণনা রীতি

মর্গানের মতে দুই প্রকার আত্মীয়-গণনা রীতি লক্ষিত হয় বিভিন্ন সমাজে। যথা,—

(১) শ্রেণীমূলক পদ্ধতি, classificatory system;

(২) বর্ণনামূলক পদ্ধতি, descriptive system।

সমশোণিত ভুক্ত জ্ঞাতি হতে পারে একরৈখিক জ্ঞাতি বা সাক্ষাৎ জন্মসূত্রের জ্ঞাতি (lineal kin) এবং সমান্তর জ্ঞাতি বা পরোক্ষ জ্ঞাতি (collateral kin)। একরৈখিক জ্ঞাতির দৃষ্টান্ত পিতামহ, পিতা, পুত্র, পৌত্র ইত্যাদি। প্রথম সমান্তর জ্ঞাতির দৃষ্টান্ত ভাই, ভাইপো, ভ্রাতুষ্পৌত্র ইত্যাদি। দ্বিতীয় সমান্তর জ্ঞাতি হল পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র, পিতৃব্যপৌত্র ইত্যাদি। শ্রেণীমূলক পদ্ধতিতে বিভিন্নপ্রকার জ্ঞাতি কিংবা কুটুম্ব এক শ্রেণীভুক্ত হয়। ইংরাজদের মধ্যে এরূপ রীতির নমুনা "আঙ্কল" "ইন্-ল" (uncle, in-law) আত্মীয়-শ্রেণী।

ইংরাজী রীতিতে আঙ্কল-শব্দ-বাচ্য আত্মীয় কাকা, জেঠা, মামা। আন্ট (aunt) হচ্ছে কাকী, জেঠী, মামী, মাসী, পিসী। নেফিউ হচ্ছে ভাইপো, ভাগনে। নিস (niece) হচ্ছে ভাইঝি, ভাগ্নী। ইন্-ল শব্দ-বাচ্য আত্মীয় আত্মীয়া হচ্ছে ভাজ, ভগ্নীপতি, শ্বশুর, শ্বাশুরী, দেবর, ভাশুর, ননদ, ননাস, শ্যালক, শ্যালিকা, জামাই, পুত্রবধূ। (শ্রেণী-মূলক জ্ঞাতি বা আত্মীয়)

ফাদার, মাদার, সন (son), ডটার বর্ণনা-মূলক জ্ঞাতি। এরূপ শব্দের দ্বারা বিশেষ জ্ঞাতিটিকে বুঝতে পারা যায়।

বাংলা রীতিতে শ্রেণী-মূলক আত্মীয়বাচক দাদা, দিদি, দাদু, নাতি, নাতনী, বৌদি। দাদা হচ্ছে জেঠাত, কাকাত, মামাত, পিসাত, মাসতুত বা সহোদর বড় ভাই। দিদিও এধরণের বড় বোন। দাদু হচ্ছে পিতামহ বা মাতামহ। নাতি ছেলের বা মেয়ের ছেলে। নাতনী ছেলের বা মেয়ের মেয়ে। বৌদি যে কোন ধরণের দাদার স্ত্রী।

বাংলা রীতি প্রধানত বর্ণনা-মূলক। যথা:—(১) বাবা, মা, ভাই, বোন, ঠাকুর্দা (পিতার পিতা), ঠাকুরমা (পিতার মাতা), কাকা, কাকীমা, জেঠা, জেঠীমা, কাকাত ভাইবোন, জেঠাত ভাইবোন।

(২) দাদামশায় (মায়ের পিতা), দিদিমা (মায়ের মাতা), মামা, মামী, মাসী, মেসো, মামাত ভাইবোন, মাসতুত ভাইবোন।

(৩) পিসা, পিসী, পিসাত ভাইবোন।

(৪) ভগ্নীপতি, ভাগ্‌নে, ভাগ্‌নী।

(৫) শালা, সম্বন্ধী (স্ত্রীর বড় ভাই), শালী।

(৬) দেবর (স্বামীর ছোট ভাই), ভাশুর (স্বামীর বড় ভাই), ননদ (স্বামীর ছোট বোন), ননাস (স্বামীর বড় বোন)।

সংস্কৃত ভাষায় কাকা ও জেঠার বাচক শব্দ পিতৃব্য; দেবৃ স্বামীর ছোট ভাই ও বড় ভাইয়ের বাচক। মনুসংহিতায় দেবরের পক্ষে ভ্রাতৃজায়া গুরুতুল্যা কিংবা স্নুষাতুল্যা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেবর হচ্ছে স্বামীর কনিষ্ঠ ভাই কিংবা জ্যেষ্ঠভ্রাতা। (মনু ৯। ৫৯-৬২)

ননান্দৃ স্বামীর ছোট বোন ও বড় বোনের বাচক। শ্যাল স্ত্রীর বড় ভাই ও ছোট ভাইয়ের বাচক। সংস্কৃত ভাষায় পিতৃব্য, দেবর, ননান্দৃ, শ্যাল অংশত বর্ণনামূলক জ্ঞাতিবাচক।

হিন্দীতে শ্রেণী-মূলক আত্মীয়ের বাচক সমধিন শব্দ। এই শব্দ বাচা বেহাই ও বেহান বাংলাতেও বেহাই জামাতার বা পুত্রবধূর পিতা এবং বেহান জামাতার বা পুত্রবধূর মাতা, অর্থাৎ শ্রেণীমূলক আত্মীয় আত্মীয়া।

তামিল ভাষায় "মামা" শব্দ মাতুলের ও শ্বশুরের বাচক। তামিল থেকেই বাংলায় মামা-শব্দ এসেছে। তামিলদের মধ্যে এক কালে মামাত-বোনকে বিবাহের রীতি চল্‌তী ছিল এবং সেই কারণেই মায়ের ভাই ও শ্বশুরকে বোঝাতে একই শব্দ ব্যবহৃত হত। তেলুগু ভাষায় মেনরিকম্ হচ্ছে মামাত বোনকে বিবাহ। তেলুগুভাষীরাও মামাত বোনকে বিবাহ করত। মারাঠাদের মধ্যেও বিষম কাজিন (cousin) বিবাহ অনুমোদিত হত।

ওরাওঁ গোষ্ঠীতে "তচি" হচ্ছে মামী, পিসী ও শ্বাশুরীর বাচক। এদের ভিতরে মামাত ও পিসাত বোনকে বিবাহ করা চলে, তাই যে মামী সেই শ্বাশুরী হয়। যে পিসী সেও শ্বাশুরী হতে পারে।

মর্গান আত্মীয়-বাচক শব্দ থেকে বিবাহপ্রথার বিবর্তনের প্রকল্প খাড়া করেছিলেন; রিভার্স আত্মীয়-বাচক শব্দকে যুক্ত করেছেন সামাজিক আচারের সঙ্গে। আত্মীয় গণনা-রীতি থেকে বিবাহ-রীতি সব ক্ষেত্রেই অনুমেয় নয়। বহু ক্ষেত্রে এক ধরণের আত্মীয়কে এক নামের দ্বারা বোঝানো হয় বা এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়, যথা, ইংরাজী পদ্ধতি। আবার এও হতে পারে, ভাষার বিকাশের সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িত। বিভিন্ন আত্মীয়ের তফাৎ-সূচক নাম সমানভাবে সব ভাষায় বিকশিত হয় না। ইংরাজী অপেক্ষা বাংলায় আত্মীয়-বাচক নামের সংখ্যা বেশি। [Morgan, pp. 493, 494 ; Races and Cultures of India, p. 246.]

দ্রষ্টব্য :—তামিল মামা—মাতুল ; শ্বশুর।
তামিল মরুমকন—ভাগিনেয় ; জামাতা।
তামিল মরুমক্কট্টায়ম্—মাতুল থেকে ভাগিনেয়ের উত্তরাধিকার।
তেলুগু মেন—মাতুল সম্বন্ধীয়।
তেলুগু মেনমামা—মাতুল।
তেলুগু মেনরিকম্—মাতুলের কন্যাকে বিবাহ।
তেলুগু মামা—স্ত্রীর পিতা।

ট্রাইব (কৌম)

ট্রাইব (tribe) শব্দটি লাতিন-মূলক। লাতিন ট্রাইবাস হল গোষ্ঠী। ট্রাইবের অর্থে কৌম শব্দটি বাংলাভাষায় কিছুকাল যাবৎ প্রযুক্ত হয়েছে। বৈদিক জন কতকটা ট্রাইবের দ্যোতক। জনপদ জনাধ্যুষিত অঞ্চল। ট্রাইবের বৈশিষ্ট্য রক্ত-সম্পর্ক (blood kinship), কিন্তু ট্রাইবের সঙ্গে কোন অঞ্চলের সম্পর্ক তাই বলে অস্বীকার্য নয়। বস্তুতপক্ষে আধুনিক ট্রাইবগুলি অঞ্চলবিশেষে অধিষ্ঠিত। ট্রাইবের মধ্যেও আঞ্চলিকতা দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার কামিলেরোই গোষ্ঠীতে এক অঞ্চল-বাসীদের সঙ্গে অন্য অঞ্চলবাসীদের সংঘাত লেগেই থাকে। অরুন্ট গোষ্ঠী একটি আঞ্চলিক সংস্থাও (territorial unit) বটে। ডিয়েরি গোষ্ঠীতে টটেমিক ক্ল্যান মাতৃধারাবিশিষ্ট, কিন্তু পরিবার পিতৃ-আবাসিক (patrilocal)। মাতৃধারার সঙ্গে পিতৃ-আবাসিক রীতি যুক্ত হয়েছে। এর ফলে এক অঞ্চলের পুরুষরা এক ক্ল্যানের লোক নয়। ক্ল্যানের মোড়ল আছে। আবার আলাদা ভাবে আঞ্চলিক সংগঠন আছে, তারও মোড়ল আছে। ক্ল্যান সংগঠন ও আঞ্চলিক সংগঠন এক্ষেত্রে আলাদা।

মেলানেসিয়ার বুইন অঞ্চলে মাতৃধারাবিশিষ্ট ক্ল্যান সংগঠন এবং পিতৃ-আবাসিক রীতি একসঙ্গে বিরাজ করছে। এক্ষেত্রে একই অঞ্চলের লোকরা বিভিন্ন ক্ল্যানের লোক। সুতরাং আঞ্চলিক সংগঠন ও ক্ল্যান-সংগঠন স্বতন্ত্র।

মোটামুটিভাবে কিছু কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও বলা যায় যে ট্রাইব আত্মীয়-গোষ্ঠী হলেও আঞ্চলিকতা-বর্জিত নয়। [Primitive Society, pp. 392, 393]

ক্ল্যানের ইতিবৃত্ত

ট্রাইব হচ্ছে বৃহৎ গোষ্ঠী। ট্রাইব সাধারণত কয়েকটি ক্ল্যানে বিভক্ত হয়। ক্ল্যান-বিহীন গোষ্ঠীর নমুনাও রয়েছে। যথা, কাদার গোষ্ঠী, আন্দামানবাসী।

প্রাচীন গ্রীসে ফুলে (phule) ছিল ট্রাইবের বাচক। ফুলের অংশ ফ্রাট্রিয়া (phratria)। ফ্রাট্রিয়ার অংশ গেনোস (genos)। অর্থাৎ, সংগঠনের তিন ধাপ—ফুলে, ফ্রাট্রিয়া এবং গেনোস বা ক্ল্যান।

প্রাচীন রোমে ট্রাইবাস (tribus) ছিল উচ্চতর সংগঠন। ট্রাইবাসের অংশ কিউরিয়া (curia)। কিউরিয়ার অংশ জেনস্ (gens)। এক্ষেত্রে সংগঠনের ধাপগুলি হচ্ছে ট্রাইবাস, কিউরিয়া, জেনস্।

বৈদিক ট্রাইবগুলিও ক্ল্যানে বিভক্ত ছিল। ট্রাইব-বাচক জন সম্ভবত উচ্চতর সংস্থা বোঝাত। গোত্র মোটামুটিভাবে ক্ল্যানের বাচক।

আধুনিক ভারতীয় কৌমগুলিতে ক্ল্যান-বিভাগ হচ্ছে সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কখনও কখনও দেখা যায় যে কয়েকটি ক্ল্যানের সংযোজন (fusion) ঘটছে বৃহত্তর ট্রাইব-সংগঠনের মধ্যেই। আবার, বৃহৎ ক্ল্যানের বিভজনও (fission) ঘটে। মধ্যভারতীয় কৌমী সংগঠনে দুরকম ব্যাপারই ঘটতে দেখা যায়।

মর্গানের মতে (১) আদিমতম অবস্থায় ট্রাইব ছিল, ক্ল্যান সংগঠন ছিল না। (২) দ্বিতীয় পর্যায়ে মাতৃধারাবিশিষ্ট ক্ল্যান দেখা দিল। মাতৃধারার উৎপত্তির কারণ যৌথ বিবাহের অবস্থায় পিতৃত্ব নির্ণয় সম্ভব ছিল না। (৩) তৃতীয় পর্যায়ে পিতৃধারাবিশিষ্ট ক্ল্যান আবির্ভূত হল, যখন পিতৃত্ব নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। (৪) চতুর্থ পর্যায়ে আমাদের পরিচিত পরিবার দেখা দিল। এসময়ে ট্রাইব্যাল ব্যবস্থারও সমাপ্তি ঘটল।

সমসাময়িক মতে (১) আদিমতম অবস্থাতেও পরিবার ছিল না একথা বলা যায় না। আদিমতম গোষ্ঠীতে, যথা আন্দামানবাসীদের মধ্যে ক্ল্যান নেই, কিন্তু পরিবার আছে। ক্ল্যানের পরবর্তী সংগঠন পরিবার একথা অযৌক্তিক। (২) ক্ল্যান-বিহীন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অবস্থা (kin) থেকেই ক্ল্যানের বিকাশ হয়েছে। তবে সবক্ষেত্রেই মাতৃধারা পিতৃধারার পূর্ববর্তী ব্যবস্থা (universal priority of matriliny) এরূপ অনুমান করা চলে না।

মাতৃধারা সর্বত্রই পূর্ববর্তী, পিতৃধারা সর্বত্রই পরবর্তী—এরূপ সিদ্ধান্ত অচল। (৩) জৈব পিতৃত্ব নির্ণয়ে অসুবিধার জন্য প্রথমে মাতৃধারায় বংশ গণনা হত একথা ধোপে টেকে না, যেহেতু কৌমী সমাজে জৈব পিতৃত্বের পরিবর্তে সামাজিক পিতৃত্বই মর্যাদা পেয়ে থাকে। সুতরাং মাতৃধারার ও পিতৃধারার মধ্যে আগেপরের প্রশ্ন ইদানীং বাতিল হয়েছে। (৪) মর্গান বলেছিলেন একরক্তের মধ্যে বিবাহ দ্বারা সন্তান উৎপত্তি (inbreeding) ক্ষতিকর প্রতিভাত হওয়ায় বহির্বিবাহ (exogamy) চালু করা হয়েছিল। বহির্বিবাহ রীতিযুক্ত সংগঠন (জেনস্ বা ক্ল্যান) এই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু এমত পরিত্যক্ত হয়েছে। কেননা ক্ল্যান-বিভাগ দ্বারা সহোদর ও সহোদরার বিবাহ নিবারিত হয়, কিন্তু বিষম কাজিন (cousin) বিবাহে অসুবিধা হয় না। বহু ক্ল্যানে কাজিন বিবাহ চলতী। কাজিন বিবাহও তো একরক্তের মধ্যেই বিবাহ। একরক্তের মধ্যে সন্তান উৎপাদন স্বাস্থ্যহানি ঘটায় একথাও অপ্রমাণিত। (৫) মর্গান বলেছিলেন সম্পত্তির আবির্ভাবে মাতৃধারা বিলুপ্ত হয়ে পিতৃধারার উৎপত্তি ঘটে। এমত ইদানীং বর্জিত হয়েছে। বহু মাতৃধারাবিশিষ্ট গোষ্ঠীতে সম্পত্তির বিকাশ হয়েছে, কিন্তু মাতৃধারা বিলুপ্ত হয়নি, যথা, খাসি ও গারো গোষ্ঠীতে, উত্তর আমেরিকার ক্রো, নাভাহো, হিদাৎসা প্রভৃতি গোষ্ঠীতে। (৬) বাকোফেন, মর্গান ও টাইলর মাতৃধারায় মাতৃকর্তৃত্বের (mother right, matriarchy, gynaecocracy) কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ মাতৃশাসিত গোষ্ঠী দেখা যায় না। মাতৃধারায় মাতুলের প্রাধান্য (avunculate) কোথাও কোথাও দেখা যায়।

ক্ল্যান ও টটেমবাদ

মর্গানের মতে টটেমপ্রথা আদিম ক্ল্যানের একটি বৈশিষ্ট্য। টটেম (totem) কথাটি গৃহীত হয়েছে আমেরিকার ওজিবোয়া (Ojibwa) গোষ্ঠীর শব্দকোষ থেকে। ডোডেইম (dodaim)- রূপে এই শব্দটি উচ্চারিত হয়। ফ্রেজার ও গোল্ডেনওয়েসার টটেমবাদ ও বহির্বিবাহ-রীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করেন নি। কিন্তু গোল্ডেন ওয়েসার আবার এও বলেছেন যে টটেমবাদ-বিযুক্ত ক্ল্যান খুবই বিরল। লাউই-এর মতে টটেমবাদ কোন প্রকারেই ক্ল্যান-সংগঠনের লক্ষণ নয়, যেহেতু আমেরিকায়, আফ্রিকায় ও এশিয়ায় বহু ক্ল্যান-সংগঠনে টটেম-বিশ্বাস নেই। [Ancient Society, p. 170 ; Primitive Society, pp. 141—145]

মধ্যভারত হচ্ছে টটেমিক অঞ্চল। আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীগুলিতে টটেমিক ক্ল্যান-সংগঠন লক্ষিত হয়েছে। যেখানেই টটেমবাদ বিকশিত, সেখানেই

বহির্বিবাহ-রীতি যুক্ত ক্ল্যানও গঠিত হয়েছে। ধেল্‌কি খারিয়া গোষ্ঠীতে আটটি টটেমিক ক্ল্যান। যথা,—

(১) মুর (কচ্ছপ); (২) সোরেন (পাথর); (৩) কিরো (বাঘ) ইত্যাদি। কামার গোষ্ঠীতে টটেমিক ক্ল্যানের নমুনা ঃ—

(১) নেতম্ (কচ্ছপ);
(২) সোরি (এক প্রকার জঙ্গলী লতা);
(৩) ভয়াঘ সোরি (বাঘ);
(৪) নাগ সোরি (সাপ);
(৫) কুঞ্জম্ (ছাগ) ইত্যাদি।

[Majumdar and Madan, p. 122]

ভারতীয় টটেমবাদ সম্ভবত আদি-অস্ট্রেলীয় বৈশিষ্ট্য, কেননা অধিকাংশ বৈদিক গোত্র-নামের কোন টটেমিক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। [বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি, নৃ পেন্দ্র গোস্বামী, 'গোত্র ও টটেম' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

ওজিবোয়া গোষ্ঠীতে টটেমিক ক্ল্যানের নমুনা হচ্ছে ঃ—

নেকড়ে বাঘ ক্ল্যান; ভল্লুক ক্ল্যান; হংসী ক্ল্যান; সাপ ক্ল্যান; বল্‌গা হরিণ ক্ল্যান ইত্যাদি। উত্তর আমেরিকার মাতৃধারা বিশিষ্ট ক্রিক (Creek) গোষ্ঠীতে টটেমিক ক্ল্যানের নমুনা ঃ—

নেকড়ে বাঘ ক্ল্যান; ভল্লুক ক্ল্যান; হরিণ ক্ল্যান; বাঘ ক্ল্যান; শৃগাল ক্ল্যান; আলু ক্ল্যান ইত্যাদি।

(১) অস্ট্রেলিয়ার অরুন্ট গোষ্ঠীতে টটেমিক সংগঠন ও ক্ল্যান-সংগঠন আলাদা। (২) অস্ট্রেলিয়ার ক্যারিয়েরা গোষ্ঠীতে টটেমিক সংগঠনই হচ্ছে ক্ল্যান, কিন্তু টটেম-পূজাও নেই, টটেম সংক্রান্ত টাবুও নেই, টটেমিক নামও নেই, টটেম-প্রাণীর সঙ্গে আত্মীয়তায় বিশ্বাসও নাই।

(৩) মেলানেসিয়ার বুইন (Buin) অঞ্চলে প্রত্যেক ক্ল্যানের সঙ্গে টটেমিক প্রাণী যুক্ত। কিন্তু টটেম-প্রাণী থেকে বংশের উৎপত্তি ধরা হয় না।

(৪) আমেরিকার উইনেবাগো (Winnebago) গোষ্ঠীতে টটেমিক বংশধারা, টটেমিক নাম দেখা যায়, কিন্তু টটেমিক চর্যা (cult) নেই, টটেম-সংক্রান্ত টাবুও নেই।

(৫) আমেরিকার ইরোকয় গোষ্ঠীতে টটেম-পশু বা টটেম-পাখী থেকে ক্ল্যানের নাম করণ, টটেমবাদের সঙ্গে যুক্ত বহির্বিবাহ লক্ষিত হয়, কিন্তু টটেম-প্রাণীকে বধ করা নিষিদ্ধ নয়, (অর্থাৎ, টটেমিক টাবু নেই), টটেমিক বংশধারায় বিশ্বাসও নেই।

বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে মনসা পূজা প্রচলিত। মনসা সর্পদেবী এবং টটেমবাদের স্মারক। টটেমিক উপাধিও আছে, যথা, নাগ উপাধি। টটেমিক

গোত্রও আছে, যথা, কর্কট (কাঁকড়া) গোত্র, হংসল গোত্র, বাসুকি (সর্প) গোত্র ইত্যাদি। এই গোত্ররীতি সাংস্কৃতিক উপকরণ মাত্র, এর দ্বারা ক্ল্যান সংগঠন প্রতীতিগোচর হয় না। এরূপ গোত্র-নামের পিছনে আদি-অস্ট্রেলীয় প্রভাব থাকাই সম্ভব।

টটেমবাদের লক্ষণগুলি এইরূপ :—

(১) টটেম হচ্ছে কোন পশু বা পাখী বা জলজ প্রাণী কিংবা কোন স্থাবর পদার্থ অথবা উদ্‌ভিদ্ ;

(২) টটেম থেকে বংশধারা গণনা হয় ;

(৩) টটেম-পূজা ;

(৪) টটেমিক চিহ্ন ধারণ ;

(৫) টটেম সংক্রান্ত টাবু বা নিষেধ ; টটেম-প্রাণীকে বধ করা নিষেধ ;

(৬) উৎসবাদিতে টটেম-প্রাণী ভক্ষণ ;

(৭) টটেমের নামে ক্ল্যানের নামকরণ ;

(৮) গোষ্ঠী-রক্ষক-রূপে টটেম-প্রাণীকে কল্পনা। [Totem and Taboo, S. Freud, tr., 1961, pp. 100-107]

এই লক্ষণগুলি একত্রে কোন ক্ল্যানের মধ্যে আবিষ্কৃত হয় নি। কোথাও একটি বা দুটি বা তিনটি লক্ষণ আছে, কিন্তু অন্য লক্ষণগুলি অনুপস্থিত। এই কারণে টটেমবাদকে ক্ল্যানের বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। যেখানে ক্ল্যান-সংগঠন নেই, সেখানেও কিছু কিছু টটেমিক লক্ষণ দেখা যায়। বহুক্ষেত্রে ক্ল্যানের টটেমিক নাম নেই, যথা, আমেরিকার ক্রো, হিদাংসা প্রভৃতি গোষ্ঠীতে। বঙ্গীয় উপাধিগুলিতে বিচিত্র টটেমিক নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে ক্ল্যানের তাৎপর্য মেলে না। সুতরাং ক্ল্যান ও টটেমবাদকে স্বতন্ত্র সামাজিক তথ্য-রূপে বিবেচনা করা সমীচীন।

ফ্রাট্রি সংগঠন

একাধিক ক্ল্যানের সংযুক্ত সংগঠনকে মর্গান ফ্রাট্রি-রূপে অভিহিত করেছেন। ট্রাইবের ভিতরে ক্ল্যান-বিভাগ এবং একাধিক ক্ল্যান সংযোজনে গঠিত ফ্রাট্রিও (phratry) কোথাও কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ক্রো গোষ্ঠীতে ক্ল্যান-সংগঠনও রয়েছে, একাধিক ক্ল্যান-সমন্বিত ফ্রাট্রি সংগঠনও রয়েছে। হোপি গোষ্ঠীতেও এরকমের ক্ল্যান ও ফ্রাট্রি বিকশিত হয়েছে। শেরেন্টে গোষ্ঠীতে রয়েছে আটটি ক্ল্যান, চারটি ফ্রাট্রি।

ফ্রাট্রি কোথাও কোথাও বহির্বিবাহ রীতিযুক্ত, যথা, হোপি গোষ্ঠীতে। কোথাও কোথাও ফ্রাট্রি বহির্বিবাহকারী নয় ; যথা, ক্রো গোষ্ঠীতে অন্তত চারিটি ফ্রাট্রি বহির্বিবাহের রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

ময়টি-বিভাগ

ময়টি (moiety) ফরাসী-মূলক শব্দ। এর অর্থ অর্ধাংশ। অর্ধ-কৌমকে বলা হয় ময়টি। কোথাও কোথাও ট্রাইব দুইটি ময়টিতে বিভক্ত হয়। এই জাতীয় বিভাগ দ্বৈত সংগঠন-রূপে (dual organisation) পরিচিত হয়েছে। দ্বৈত সংগঠন পরিলক্ষিত হয় অস্ট্রেলিয়ায়, মেলানেসিয়ার অংশ-বিশেষে, ভারতবর্ষে, উত্তর আমেরিকায়,—কিন্তু আফ্রিকায় বা সাইবেরিয়ায় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। (সাইবেরিয়ায় মাতৃধারার কোন সাক্ষাৎ মেলেনি।)

ময়টি তিন প্রকার হতে পারে বিবাহ-রীতি অনুযায়ী। যথা, (১) কোন কোন ময়টি বহির্বিবাহ রীতি-যুক্ত। (২) কোন কোন ময়টিতে অন্তর্বিবাহ (endogamy) চলতী। (৩) কোন কোন ময়টিতে পূর্বেকার বহির্বিবাহরীতি বর্তমানে অবলুপ্ত (agamy)।

টোডা গোষ্ঠীতে দুটি ময়টি হচ্ছে টেইভালিওল (Teivaliol) এবং টার্থারোল (Tartharol)। প্রত্যেকটি ময়টি আবার ক্ল্যানে বিভক্ত। প্রত্যেকটি ময়টিতে অন্তর্বিবাহ বর্তমান। কিন্তু ক্ল্যান বহির্বিবাহ রীতিযুক্ত।

ভীল কৌমের দুটি ময়টি—উজলে ভীল ও মেলে ভীল। এখানে ময়টি অন্তর্বিবাহ রীতি যুক্ত। আসামি নাগা গোষ্ঠীতে ময়টি সংগঠনে পূর্বেকার বহির্বিবাহ-রীতি বর্তমানে পরিত্যক্ত। দুইটি ময়টি হচ্ছে পেজোমা ও পেফুমা এই গোষ্ঠীতে।

অস্ট্রেলিয়ায় ও মেলানেসিয়ায় ময়টি-বিভাগ মোটামুটিভাবে বহির্বিবাহ রীতি-যুক্ত। ইরোকয় গোষ্ঠীতে ময়টি পূর্বে বহির্বিবাহকারী ছিল, কিন্তু বর্তমানে বহির্বিবাহের নিয়ম ক্ল্যানে সীমাবদ্ধ। ক্যানেলা ময়টিতেও পূর্বেকার বহির্বিবাহ রীতি বর্তমানে শিথিল।

আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত সুবিধা অসুবিধা বিবেচনায় ময়টি গঠিত হয় এবং বহির্বিবাহ প্রবর্তিত হয়, যার মেয়াদ নির্ভর করে আঞ্চলিক বিবর্তনের উপর।

বিবাহ-রীতির বিবর্তন

মর্গান-কল্পিত বিবর্তনের ছক অনুযায়ী (১) সর্ব প্রথমে ছিল সম্পূর্ণ-রূপে অনিয়ন্ত্রিত অবাধ যৌন সম্পর্কের পর্যায় (promiscuity)। এসময়ে পিতা-সমূহের ও কন্যাসমূহের, মাতাসমূহের ও পুত্রসমূহের যৌন সম্পর্কের (parental incest) অনুমোদন ছিল। (২) পরবর্তী একরক্তের পরিবারে (consanguine family) ভ্রাতাসমূহের ও ভগিনীসমূহের যৌন-সম্পর্কের (brother-sister incest) সমর্থন ছিল। (৩) তৃতীয় স্তরে যৌথ বিবাহ (group marriage) বিবর্তিত হয়েছে। এসময়ের ব্যবস্থায় ভাই বোনের যৌন সহবাস নিষিদ্ধ হয়েছে এবং মাতৃধারামূলক ক্ল্যানসংগঠন চালু

হয়েছে। (৪) চতুর্থ স্তরে যুগ্ম পরিবার (pairing family) বা জোড়া বাঁধা অস্থায়ী নারী পুরুষের সম্পর্ক দেখা দিয়েছে। এ সময়ের ব্যবস্থাতেও মাতৃধারামূলক ক্ল্যান-সংগঠন অঙ্গীভূত। এসময় থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ হতে থাকে। এই চারটি পর্যায়ের অর্থনীতিতে সমষ্টিতন্ত্র (communism) অনুসৃত হত। (৫) পঞ্চম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে জড়িত পিতৃকর্তৃত্ব, পিতৃত্ব নির্ণয়ে নিশ্চয়তার ফলে পিতৃধারা, একবিবাহযুক্ত পরিবার (যথার্থ পরিবার) ইত্যাদি।

এই বিবর্তন ক্রম আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয়েছে।

(১) মর্গানের প্রকল্প অনুযায়ী মাতৃধারার সঙ্গে যৌন সাম্যবাদ (sexual communism) জড়িত। কিন্তু মাতৃধারাবিশিষ্ট সমাজে একবিবাহকারী পরিবার পরিদৃষ্ট হয়। যথা, খাসি সমাজে মাতৃধারার সঙ্গে যুক্ত একবিবাহ-কারী পরিবার। এদের ভিতরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, বহুপতিবিবাহও নেই, বহুস্ত্রীবিবাহও নেই। মাতৃধারাবিশিষ্ট হোপি ও ক্যানেলা গোষ্ঠীতে একবিবাহ বাধ্যতামূলক জুনি গোষ্ঠীও একবিবাহকারী।

(২) তিব্বতী, এস্কিমো, হিমালয়স্থিত কৌমগুলি বহুপতিবিবাহ-কারী। এসব গোষ্ঠীতে যুগপৎ পাশাপাশি বহুস্ত্রীবিবাহ, বহুপতিবিবাহ ও একবিবাহ দেখা যায়। এরূপ সমন্বয় মর্গানের ছকের বিরোধী।

(৩) মর্গানের ছক অনুযায়ী যৌথবিবাহের পরে প্রত্যাশিত পর্যায় বহুপতিবিবাহ। টোডা ও খশ গোষ্ঠীতে বহুপতিবিবাহের পরবর্তী পর্যায়ে সীমিত আকারের যৌথ বিবাহ দেখা দিয়েছে।

(৪) মর্গানের ছকে আদিমতম পর্যায়ে **যৌথ যৌনতা বা যৌন সাম্যবাদ** প্রত্যাশিত। কিন্তু শিকারজীবী খাদ্যসংগ্রহকারী কাদারদের মধ্যে ও আন্দামানবাসীদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী-মূলক পরিবার লক্ষিত হয়।

(৫) মর্গানের ছকে ভাই বোন বিবাহ একটি অতিশয় আদিম রীতি। কিন্তু উন্নত সাংস্কৃতিক পর্যায়-যুক্ত গোষ্ঠীতে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল। যথা, মিশরীয়দের মধ্যে, পেরুবাসীদের মধ্যে। এসব ক্ষেত্রে সহোদরা-বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে আভিজাত্য সংরক্ষণ এবং রক্তের বিশুদ্ধি সংরক্ষণ।

(৬) মর্গানের মতে জেনস্ বা ক্ল্যান হচ্ছে ব্যক্তিগত পরিবারের পূর্ববর্তী সংগঠন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্ল্যান বিকশিত হয় নাই, অথচ পরিবার বিরাজ করছে : যথা, আন্দামানবাসীদের মধ্যে, কাদারদের মধ্যে, টিয়েরা ডেল ফুয়েগোর ইয়াঘানদের মধ্যে, এস্কিমোদের মধ্যে।

(৭) মর্গানের মতে মাতৃধারা হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে পিতৃধারার পূর্ববর্তী। এই মত পোষণ করেন ব্যাকোফেন, ম্যাকলেনান (McLennan), টাইলর, এঙ্গেলস্, ব্রিফল্ট। মর্গান বলেছেন যে সম্পত্তির ব্যক্তিগত

মালিকানা থেকে পিতৃধারা বিকশিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ সত্ত্বেও ভারতীয় খাসি ও গারো গোষ্ঠীতে এবং উত্তর আমেরিকার ক্রো, হিদাৎসা ও নাভাহো গোষ্ঠীতে মাতৃধারা টিকে রয়েছে।

বর্তমানের কোন আদিম গোষ্ঠীতে বিবাহ-বিহীন পরিবার-বিহীন অবস্থা দৃষ্ট হয়নি। অবাধ যৌনতার পর্যায় একেবারেই একটি কল্পিত অবস্থা। (Handbook of Sociology, pp. 148, 492, 493 ; The Mothers, R. Briffault, abridged ed., 1959. pp. 9-15 ; Teach yourself Anthropology, J. E M. White, 1960, p. 132.)

(8) শ্রেণী ও বর্ণ

বৈদিক সমাজের দৃষ্টান্ত

কৌমতন্ত্র (Tribalism) হচ্ছে বর্ণভেদের পূর্ববর্তী সামাজিক সংগঠন। ভারতীয় পরিবেশে কৌমী সংগঠন ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ বা caste বিকশিত হয়েছে। বৈদিক সমাজ ছিল বিভিন্ন কৌমে বিভক্ত। বৈদিক কৌমতন্ত্র শ্রেণী বা class-বর্জিত ছিল না। ঋগ্বেদীয় মন্ত্রে চারিটি শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায়। যথা,

(১) ব্রাহ্মণ,
(২) রাজন্য (ক্ষত্র),
(৩) বৈশ্য,
(৪) শূদ্র। (ঋ ১০।৯০।১২)

বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলতে পুরোহিত শ্রেণীকে বোঝানো হত। ব্রহ্ম-শব্দের অপর অর্থ মন্ত্র। যিনি মন্ত্র উচ্চারণ করেন তিনিও ব্রহ্ম। ক্ষত্র হচ্ছে শাসক শ্রেণী। এই শব্দের অপর অর্থ হচ্ছে বল। বিশ্ বা বৈশ্য হচ্ছে শিল্পী বা কৃষিজীবী জনসাধারণ। শূদ্র হচ্ছে অনার্য সমাজ থেকে আগত গোলাম শ্রেণী। এই চারি শ্রেণীর অনুরূপ শ্রেণী বিভাগ আদি ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় লক্ষিত হয়। যথা,—

আথ্ব—পুরোহিত ;
রথেষ্টা—যোদ্ধা ;
বাস্ত্রো ফ্শুয়া—কৃষিজীবী ;
হুইতি—শিল্পজীবী।

বৈদিক বা ইরাণীয় শ্রেণীবিভাগ জন্মগত নয়, পরন্তু বৃত্তিগত। তাই

এক্ষেত্রে বর্ণ বা জন্মগত জাতের আভাস মেলে না। বৈদিক বা ইরাণীয় সমাজে জন্মগত জাত ছিল না।

শ্রেণীর তাৎপর্য

শ্রেণী বা class হচ্ছে একটি মর্যাদা-গোষ্ঠী (status group)। সমাজ-বিজ্ঞানে শ্রেণী মানে অর্থনৈতিক শ্রেণী নয়। আয়ের তারতম্য অনুসারে অর্থনৈতিক শ্রেণী গঠিত হয়, যথা,—মাসিক দুইশত টাকা আয়ের শ্রেণী, মাসিক হাজার টাকা আয়ের শ্রেণী ইত্যাদি। বৃত্তি বা স্বার্থ অনুযায়ীও শ্রেণী গঠিত হতে পারে। তাই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য। বৃত্তি অনুযায়ী মর্যাদা গড়ে ওঠে। এক বৃত্তিতে যারা নিযুক্ত, তাদের একই মর্যাদা। তারা একটি শ্রেণী বা মর্যাদা-গোষ্ঠী। বৈদিক আমলের ব্রাহ্মণ এরূপ একটি শ্রেণী। রাজন্যও এই জাতীয় শ্রেণী। বৈশ্যও এজাতীয় শ্রেণী।

শ্রেণী হচ্ছে মুক্ত-দ্বার গোষ্ঠী। এতে নূতন অনুপ্রবেশ ঘটে। বৃত্তি-নির্ভর শ্রেণীতে নবাগতরা অনুরূপ বৃত্তি গ্রহণ করে। বৈদিক যুগে যে পুরোহিতের কর্ম করত, সেই হত ব্রাহ্মণ-রূপে গণ্য। ক্ষত্রিয়ের ছেলে ব্রাহ্মণ হতে পারত, যদি সে পুরোহিতের বৃত্তি গ্রহণ করত। আবার ব্রাহ্মণের ছেলে ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ ক'রে ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে প্রবেশ করত। অর্থাৎ, শ্রেণীর দ্বার নবাগতের জন্য সর্বদাই খোলা থাকে।

কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে মর্যাদার তারতম্য থাকে। বৈদিক আমলের শেষ দিকে সম্ভবত ব্রাহ্মণের স্থান সমাজের শীর্ষে স্থাপিত হয়েছে। ব্রাহ্মণের নীচে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের নীচে বৈশ্য। বৈশ্যের নীচে শূদ্র। এই উচ্চ-নীচ বিভাগ স্তরভেদ বা hierarchy-রূপে পরিচিত।

মার্কসবাদীরা দুইটি class বা শ্রেণীর কথা বলেন। একটি শোষক শ্রেণী, অপরটি শোষিত শ্রেণী। যথা, দাসত্বের যুগে প্রভু-শ্রেণী শোষক, গোলাম-শ্রেণী শোষিত। সামন্ত যুগে ভূস্বামী শোষক, ভূমিদাস শোষিত। পুঁজিতন্ত্রের যুগে পুঁজিপতি শোষক, সর্বহারা মজুর শোষিত। এই শ্রেণী-বিভাগ অর্থনীতিগত। শোষক ও শোষিতের মাঝখানে একটি মধ্যশ্রেণীর কথাও বলা হয়। মধ্যবিত্ত ও মধ্যশ্রেণী ঠিক এক কথা নয়। এরূপ শ্রেণীগত বিচার অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে স্বীকৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী সমাজে বিরাজ করে, এদের মধ্যে উচ্চনীচ ক্রম রয়েছে। হালের পুঁজিপতি শ্রেণীতে বহু মর্যাদা-স্তর আছে, আবার মধ্যশ্রেণীও নানা মর্যাদা-স্তরে বিভক্ত, মজুর শ্রেণীতেও বহু মর্যাদা-স্তর চোখে পড়ে।

বর্ণ-বিভাগ

বর্ণ-শব্দের তাৎপর্য-গত বিকাশ ঘটেছে। ঋগ্বেদে বর্ণ হচ্ছে গায়ের রং। এস্থলে আর্য ও অনার্যের নৃবংশীয় (racial) পার্থক্য সূচিত করতে বর্ণ-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

বর্ণ-শব্দের পরবর্তী অর্থ শ্রেণী বা class। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্বর্ণ-বিভাগ যে সময়ের সৃষ্টি, তখন শ্রেণী-গত পার্থক্য বিবেচিত হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে বর্ণ হয়েছে caste বা জন্মগত জাতের বাচক।

আদিতে বৃত্তি-নির্ভর শ্রেণী (class) ছিল। বৈদিক সমাজের এই দৃশ্য। বেদোত্তরকালে বিভিন্ন বৃত্তির আশ্রয়ে জন্ম-গত জাত (caste) দেখা দিয়েছে। এ সময়ে বর্ণ জন্ম-গত জাতের অর্থ সূচিত করছে। আরও পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বৃত্তি-বিপর্যয় ঘটেছে। বর্ণ ও বৃত্তির মধ্যে কোথাও কোথাও সম্পর্ক আছে, কোথাও বা নেই, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই বর্ণ-ভেদ জন্ম-গত। এক বর্ণের লোক বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করছে। দশ-ব্রাহ্মণ-জাতকে ব্রাহ্মণের বিভিন্ন বৃত্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, বর্ণ যেন সম্পূর্ণরূপেই জন্ম-নির্ভর, ঠিক বৃত্তি-নির্ভর নয়।

বর্তমান কালে caste বা জাত্ জন্ম-সূত্রে বিবেচিত হচ্ছে। বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির প্রায় সম্পর্কই নেই। পৌরোহিত্য ব্যতীত আরও বহু কর্মেই ব্রাহ্মণ নিযুক্ত। ব্রাহ্মণের ছেলেও জুতা পালিশ বা মুচির কাজ করে, দোকান খুলে ধোবার কাজ করে। নাপিতের ছেলে হয়ত বড় সরকারী কর্মচারী, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিতে নিযুক্ত।

বর্ণ বা caste হচ্ছে বদ্ধ-দ্বার শ্রেণী (closed class), অর্থাৎ জন্ম-গত জাত্। বর্ণের ভিতরে নূতন অনুপ্রবেশ সহজ-সাধ্য নয়। শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটি শর্ত পালিত হলেই নূতন অনুপ্রবেশ ঘটে। বর্ণের ক্ষেত্রে তা হয় না। বর্তমানের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জন্ম-গত জাত। বামুনের ছেলেই বামুন হয়। কায়স্থের ছেলেই কায়েত হয়। কোন এক কালে লেখক বা কেরাণীরা বা সরকারী কর্মচারীরা কায়স্থ-রূপে গণ্য হত। তখন কায়স্থ ছিল একটি শ্রেণী। এই শ্রেণী ধীরে ধীরে জাতে পরিণত হয়েছে। বৈদ্যরাও এক কালে ছিল চিকিৎসক শ্রেণী, পরে পরিণত হয়েছে জন্ম-গত জাতে।

বর্তমানের কোন caste বা জাতের বংশানুক্রমিক বৃত্তি থাকতেও পারে বা না থাকতেও পারে। এ বিষয়ে বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম নেই। বংশানুক্রমিক বৃত্তি-বর্জনের ও নূতন বৃত্তি গ্রহণের বহু নিদর্শন রয়েছে। বহু ক্ষেত্রে নামের উপাধি দেখে জাত্ ধরা যায়, কিন্তু বৃত্তি আন্দাজ করা যায় না। বৃত্তি-বর্জনের জন্য কোন সামাজিক শাস্তির ভয় বর্তমানে নেই। কিন্তু জাত বিচার উঠে যাচ্ছে না। জাতে জাতে সহ-ভোজন (commensality) চালু

হয়েছে। বিভিন্ন জাতের আলাদা আলাদা পংক্তি-ভোজন উঠে গেছে। তবে বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ (connubium) এখনও সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ বিবাহ অভিভাবকের অনুমোদনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রেম-মূলক বিবাহে জাত্-বিচার কদাচিৎ দেখা যায়।

প্রাচীন ভারতে চারি বর্ণের পরিকল্পনার মধ্যে সমগ্র সমাজকে সংগঠিত করা হয়েছিল। এই চারি বর্ণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এরা মূল বর্ণ। এদের সংমিশ্রণে অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে,—এরূপ একটা ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই চারিটি ব্যতীত অপর সব বর্ণই সঙ্কর-বর্ণ বা mixed caste। যে সকল অনার্য গোষ্ঠী আর্য সমাজে প্রবেশ করেছে, তারা সঙ্কর-বর্ণ-রূপে বিবেচিত হয়েছে। বর্ণের তালিকায় কিছু কিছু নাম সম্ভবত কৌম-নাম ; যথা, কৈবর্ত, বাগদি, ডোম ইত্যাদি। এরা সঙ্কর-বর্ণরূপে কল্পিত। হিন্দু সমাজের অনেক tribal caste বা কৌম-বর্ণকে এখন কৌম-রূপে সনাক্ত করা যায় না। বহু বৃত্তি-গত বর্ণও সঙ্কর-রূপে গণ্য হয়েছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি হচ্ছে দ্বিজ বর্ণ। এদের উপনয়ন আছে এবং কতগুলি ধর্মীয় অধিকার আছে। শূদ্র দ্বিজ নয়। দ্বিজ বর্ণের সামাজিক মর্যাদা বেশি।

বর্ণ-পরিকল্পনায় বৃত্তির পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতা বিচার্য হয়েছে। কতগুলি বৃত্তি শুদ্ধ। কতগুলি বৃত্তি অশুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে দুই প্রকার শূদ্রের উল্লেখ দেখা যায়। যথা,—

(১) অনিরবাসত, অর্থাৎ, পাত্র থেকে অবহিষ্কৃত শূদ্র ; যথা, তক্ষন্ বা ছুতার, অয়স্কার বা কামার ;

(২) নিরবসিত, অর্থাৎ, পাত্র থেকে বহিষ্কৃত শূদ্র।

যারা ভোজন করলে ভোজন-পাত্র সংস্কার দ্বারাও শুদ্ধ হয় না, তারা নিরবসিত শূদ্র। যথা, চণ্ডাল, মৃতপ (ডোম) ইত্যাদি। [সি কৌ ৯.৪ ; পা ২।৪।১০ ; তত্ত্ববোধিনী দ্রষ্টব্য।]

যারা ভোজন করলে ভোজন-পাত্র সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ হয়, তারা অনিরবসিত শূদ্র। যথা, ছুতার, কামার ইত্যাদি।

এই শূদ্র-বিভাগটি প্রাচীন কালের, যে সময়ে শূদ্র শব্দের অর্থ-ব্যাপ্তি ঘটেছে।

বাংলাদেশে নবশায়ক বর্ণ বা নয়টি শুদ্ধ শূদ্রের বর্ণনা দৃষ্টি-গোচর হয়। যথা, গোপ, মালী (মালা প্রস্তুতকারী), তাম্বুলী (পাণ বিক্রেতা), কাংসার (কাঁসারী), তন্ত্রী (তাঁতী), শংখিক (শাঁখারী), কুলাল (কুমার), কর্মকার (কামার), নাপিত। নবশায়কেরা সৎ শূদ্ররূপে বিবেচিত হত।

হাড়ি (মেথর), ডোম (শবরক্ষক) প্রভৃতির স্থান নবশায়কের নীচে। এদের জল অচল। নবশায়কের জল চল। ব্রাহ্মণেরা এদের হাতের জল

পান করতে পারে। জল-চল জাত্‌দের ছোঁয়া লাগলে জল অশুদ্ধ হয় না। জল-অচল জাত্‌দের ছোঁয়া লাগলে জল অশুদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে বৃত্তি-গত শুদ্ধি বা অশুদ্ধি বিবেচ্য হচ্ছে।

একটি দৃষ্টিভঙ্গীতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুটিমাত্র বর্ণ স্বীকৃত পেয়েছে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরাপর সকল বর্ণকে শূদ্র-রূপে গণ্য করা হয়েছে। উত্তম সঙ্কর, মধ্যম সঙ্কর ও অন্ত্যজ এইরূপ জাত্‌-বিভাগ করা হয়েছে একস্থলে। আর একটি জাত্‌-বিভাগে সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উচ্চ জাতের সঙ্গে তুলনায় নিম্ন জাত্‌ অপবিত্র, এ ধরণের ধারণা প্রচলিত হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে বৃত্তি-গত শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচারের কড়াকাড়ি অনেক বেশি এখানে অস্পৃশ্য জাত্‌ রয়েছেই, এ ছাড়া রয়েছে দর্শনের অযোগ্য (unsee-able) জাত্‌। অস্পৃশ্য জাতের স্পর্শে দ্বিজবর্ণ কলুষিত হয় দর্শনের অযোগ্য জাত্‌গুলিকে দেখলেই দ্বিজবর্ণ কলুষিত হয়। বাংলাদেশে শুধু অস্পৃশ্যতা-বিচার রয়েছে, ভারতের অন্যত্রও রয়েছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে কোন কোন জাতকে দেখাও নিষেধ। মাদ্রাজ রাজ্যে কতিপয় জাতের ছায়া অপবিত্র-রূপে গণ্য। এদের ছায়া স্পর্শ করলেও উচ্চ বর্ণের পবিত্রতা নষ্ট হয়। ইদানীং শহুরে জীবন-যাত্রায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। অস্পৃশ্য জাত্‌গুলি আইনের পুস্তকে তপসীল-ভুক্ত জাত্‌-রূপে বর্ণিত হয়েছে। ভারতে পাঁচ-ছয় কোটি এরূপ জাতের লোক আছে।

কোন জাত্‌ বেশি পবিত্র, কোন জাত্‌ কম পবিত্র,—এরূপ বিচার থেকে দেখা দিয়েছে উচ্চ-নীচ ক্রম। যথা, **বাংলাদেশে** সর্বোচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণ, তার নীচে বৈদ্য ও কায়স্থ, তার নীচে নবশায়ক বর্ণ, তার নীচে অস্পৃশ্য জাতেরা। **উত্তর প্রদেশে** সর্বোচ্চ স্থানে ব্রাহ্মণ, তার নীচে ক্ষত্রিয়, তার নীচে কায়স্থ, তার নীচে বৈশ্য, তার নীচে আহীর (গোয়ালা) ইত্যাদি। **কোচিনে** সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ, তার নীচে নায়ার, তার নীচে শিল্প বা শ্রমে নিযুক্ত অস্পৃশ্য জাত্‌গুলি।

সাধারণত ভারতীয় জাত্‌-বিচারে শ্রমের মহিমা স্বীকৃত নয়। কায়িক শ্রম অবহেলিত। শিল্প বা কায়িক শ্রমে নিযুক্ত লোকদের নীচু জাত্‌। কৃষিজীবীর স্থান শিল্পজীবীর উপরে। কৃষিজীবী জাত্‌গুলির মধ্যে মর্যাদার তারতম্য আছে। শিল্পজীবী জাত্‌গুলির মধ্যেও উচ্চ-নীচ ক্রম রয়েছে। উচ্চ জাতের মর্যাদা লাভ করে ভূমির মালিক বা মানসিক অনুশীলনে নিযুক্ত ব্যক্তি।

বর্ণ-গত ম্যানা-বিশ্বাস

একমতে উচ্চ-নীচ জাত্‌-বিচারে এক ধরণের ম্যানা-বিশ্বাস পরিস্ফুট। ম্যানা (mana) হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক অদৃশ্য শক্তি। উচ্চ জাতের মধ্যে উচ্চ

ম্যানা-শক্তি রয়েছে ; নীচু জাতের সংস্পর্শে এই ম্যানাশক্তি হ্রাস পেতে পারে কিংবা উচ্চ জাতের ম্যানাশক্তির প্রভাবে নীচু জাতের লোকের অনিষ্ট হতে পারে,—এ জাতীয় ধারণা স্পর্শ-বর্জনের মধ্যে ধরা পড়ে। ব্রাহ্মণের ছোঁওয়া জল-দ্বারা নীচু জাতের পাদ-প্রক্ষালন নিষিদ্ধ, যেহেতু ব্রাহ্মণের ম্যানাশক্তি ক্ষতি-কারক হতে পারে। উচ্চ জাত নীচু জাতকে বর্জন করে পবিত্রতা নাশের আশঙ্কায়। নীচু জাত উচ্চ জাতকে এড়িয়ে চলে উচ্চ ম্যানাশক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য। ঈদৃশ ধারণার ফলে ব্রাহ্মণের ঘরের সেকেলে বিধবারা এখনও শূদ্রের ছোঁওয়া জল খায় না এবং স্নানের পরে শূদ্রকে স্পর্শ করে না। নীচু জাতের লোকেরাও ব্রাহ্মণের স্পর্শ এড়িয়ে চলে রক্ষণশীল এলাকায়। শহুরে এলাকায় এ জাতীয় নিষেধ-রীতি ও বর্জন-রীতি চলতী নয়। [Majumdar and Madan, op. cit., p 232]

সামাজিক দূরত্ব

উচ্চ ও নীচু বর্ণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব (social distance) বা ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছে, যা প্রায় অলঙ্ঘনীয়। মাদ্রাজ রাজ্যে উচ্চ জাত ও পারিয়ার মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বিপুল। নায়ার জাতের লোককে স্পর্শ করলে উচ্চ জাতের লোকের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। বাংলা অঞ্চলেও অস্পৃশ্যতা-রীতির ফলে উচ্চ ও নিম্ন জাতের মধ্যে বিরাট সামাজিক দূরত্ব দেখা দিয়েছে। এখনও উচ্চ জাত ও ডোম-মেথরদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বিরাজ করছে।

শহুরে পরিবেশে জাত-বিচার স্থূলভাবে চোখে না পড়লেও বিলুপ্ত নয়। তা বোঝা যায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাত্র-পাত্রী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন থেকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রার্থিত পাত্র-পাত্রীর জাতের উল্লেখ থাকে। ভিন্ন জাতে বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন প্রায় দেখাই যায় না। শুধুমাত্র প্রেম-মূলক বিবাহই অনেক ক্ষেত্রে জাতের বেড়া উল্লঙ্ঘন করছে। কিন্তু গান্ধর্ব-রীতি ব্যাপকভাবে এখনও সম্ভাব্য নয়। শহুরে সভ্যতায় গান্ধর্ব রীতি কালে কালে প্রসার লাভ করবেই এবং জাত্-বিচারের মূলে প্রকৃত আঘাত হানবে।

বর্ণান্তর বিবাহ মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের ভিতরে। তাও প্রেমের পরিণতি হিসেবে। অভিভাবকদের দ্বারা পরিচালিত বিবাহ স্ববর্ণেই হয়। জাত্-বিচার যে সব সংগঠনে বা সম্প্রদায়ে অসমর্থিত, সেখানেও বিবাহ সংক্রান্ত জাত্-বিচার টিকে থেকেছে। ব্রাহ্ম সমাজে বর্ণ-ভেদ নীতিগতভাবে অস্বীকৃত হলেও সম-জাতের পাত্র-পাত্রীর বিবাহের দৃষ্টান্ত অত্যধিক। অনেকেই বিপ্লবের ধ্বনিতে মুখর হলেও কার্যত বিবাহ ক্ষেত্রে জাত্ মেনে চলেন, এমন কি কৌলীন্যের সংস্কারও মেনে চলেন। নীচু জাতের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক শ্রেণীগত (class-গত) সীমানাকে ডিঙিয়ে যায় না।

অর্থাৎ, বিবাহ-ক্ষেত্রে জাত্-বিচার লঙ্ঘিত হলেও শ্রেণী বিচার অটুট থাকে।

জাত্-বিচারের দ্বারা যে সামাজিক দূরত্ব বিভিন্ন জাতের মধ্যে প্রকট হতে থাকে, তার সঙ্গে ম্যানা-বিশ্বাস জড়িত রয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেছেন। উচ্চ জাতের ম্যানাশক্তি নীচু জাতের সংস্পর্শে কলুষিত হতে পারে অথবা উচ্চ জাতের ম্যানাশক্তি নীচু জাতের পক্ষে ক্ষতি-জনক হতে পারে,—এইরূপ ধারণা বিভিন্ন জাতের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে। পূর্বেকার বর্ণভেদ-জনিত সামাজিক দূরত্ব ম্যানা-বিশ্বাসকে আশ্রয় করেছে। বর্তমানের শহুরে সভ্যতায় দেখা দিয়েছে শ্রেণী-বৈষম্য-জনিত অলঙ্ঘ্য সামাজিক ব্যবধান। ধনী-গরীবের ব্যবধান, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের তথা নিম্নবিত্তের ব্যবধান নানাভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। বিবাহ ক্ষেত্রে এই ব্যবধান প্রায় অনতিক্রমণীয়।

লাউই-এর মতে **পলিনেসিয়ায়** বর্ণভেদের সদৃশ সামাজিক সংগঠন বিদ্যমান। পবিত্রতার তারতম্য অনুসারে পলিনেসীয়রা পরস্পর থেকে পৃথকীকৃত। অধিক পবিত্ররূপে গণ্য ব্যক্তিরা কম পবিত্র ব্যক্তিদের সঙ্গে ভোজন করে না। মন্ত্র-পূত ব্যক্তি বা নিকট আত্মীয় ছাড়া আর কেউ রাজকীয় মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না। স্পর্শের দ্বারা দূষণ এবং প্রায়শ্চিত্ত সংক্রান্ত ধারণা এ অঞ্চলে রয়েছে। পলিনেসীয় ও হিন্দুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান অনেকে আন্দাজ করেছেন উভয়ের আচারের সাদৃশ্য দেখে।

জাপানে এক ধরণের জাত্-বিচার ছিল। পরিচারক, ভিক্ষুক ও জল্লাদের বৃত্তিতে যারা নিযুক্ত, তারা **হিনিন** (Hinin) রূপে গণ্য হত। চর্মের দ্রব্য প্রস্তুত-কারক ও পশুশব বাহকেরা **এতা** (Eta)-রূপে গণ্য হত। এতা অস্পৃশ্য জাত্। এরা স্বতন্ত্র এলাকায় বাস করত এবং স্ব-বর্ণ বিবাহ রীতি (endogamy) অনুসরণ করত।

পূর্ব আফ্রিকায় **মাসাই** গোষ্ঠীর মধ্যে লোহার কামারেরা অস্পৃশ্য জাত-রূপে বিবেচিত। আলাদা এলাকায় তাদের বসতি। তারা যে অস্ত্র প্রস্তুত করে তা মন্ত্র-পূত ক'রে ব্যবহার করতে হয়। তাদের হত্যা করলেও শাস্তি হয় না।

লাউই বলেছেন যে আমেরিকায় নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গের সামাজিক ব্যবধান অনতিক্রম্য। বিশেষ কয়েকটি বৃত্তিতে নিগ্রোরা সাধারণত নিযুক্ত হয়, সম্মানিত বা লোভনীয় কর্মে কদাচিৎ নিযুক্ত হয়। শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রোদের এড়িয়ে চলে সতর্কতার সঙ্গে। এক ইস্কুলে অধ্যয়নেও আপত্তি দেখা যায়। বিশেষ এলাকা নির্ধারিত নিগ্রোদের জন্য। দক্ষিণ রাজ্যগুলিতে রেল স্টেশনে নিগ্রোদের জন্য আলাদা ধোতাগারের ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। ভদ্রতাসূচক মিস্টার বা মিসেস উপাধি থেকে নিগ্রোরা বঞ্চিত।

অষ্টাদশ শতকের পূর্বে য়িহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

য়িহুদীরা ব্যবসায় ও ঋণদানের কারবারে নিযুক্ত থেকেছে এবং ঘেটোতে (ghetto) বাস করেছে। হিটলারের আমলে জার্মানীতে আর্য ও য়িহুদীর বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছে। শহরের পার্কে তাদের প্রবেশ হয়েছে নিষিদ্ধ অথবা নিয়ম করা হয়েছে যে আর্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে তারা বসতে পারবে না। ঈদৃশ সামাজিক ব্যবধান দক্ষিণ ভারতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। [Social Organization, Lowie, pp. 273, 276]

বর্ণভেদ ও বিবাহ-রীতি

বর্ণভেদ-জাত সামাজিক দূরত্ব বিবাহ-প্রথাকে রূপায়িত করেছে। বর্ণ হচ্ছে এক মতে endogamous kin, অন্তর্বিবাহ-কারী জ্ঞাতিগোষ্ঠী। পোর্তুগীজরা এর প্রতিশব্দ হিসেবে কাস্টা (casta)-শব্দটি ব্যবহার করে। Casta শব্দের অর্থ বংশ। এই শব্দ থেকে এসেছে ইংরাজী কাস্ট (caste) শব্দ। যে বর্ণে বা জাতে জন্ম হয়েছে, তা কোন প্রকারেই খণ্ডন করা চলে না। নিজের জাত্ ত্যাগ ক'রে অন্য জাতে প্রবেশ চলে না।

অন্তর্বিবাহ (endogamy) জাতের একটি বৈশিষ্ট্য। কায়স্থ বর্ণের মেল অনুযায়ী ঘরের মধ্যেই বিবাহ সীমাবদ্ধ। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বর্ণের ছেলেমেয়ের বিবাহ এই বর্ণের মধ্যেই সীমিত। এই প্রথার নাম অন্তর্বিবাহ।

প্রাচীন কালের রীতিতে অনুলোম বিবাহ (hypergamy) অনুমোদিত হত। এই রীতি অনুসারে পুরুষ নিজ বর্ণের এবং নীচু বর্ণের মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। স্ত্রীলোক নিজ বর্ণের এবং উচ্চ বর্ণের পুরুষকে বিবাহ করতে পারে।

এর বিপরীত রীতি প্রতিলোম বিবাহ (hypogamy)। এই রীতিতে পুরুষ উচ্চ বর্ণের মেয়েকে বিবাহ করে এবং স্ত্রীলোক নীচু বর্ণের পুরুষকে বিবাহ করে। এই রীতি অনুমোদিত নয়।

প্রাচীন ভারতে অনুলোম বিবাহ সমর্থন পেত বলে মনে হয়, তবে এর ব্যাপকতা কিরূপ ছিল বোঝা যায় না। বর্তমানে অন্তর্বিবাহই চল্‌তী প্রথা।

এক বর্ণের লোকরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। স্ব-গোত্রে বিবাহ হয় না। এই প্রথার নাম বহির্বিবাহ (exogamy)। অর্থাৎ, স্ব-বর্ণে বিবাহ করতে হয়, কিন্তু স্ব-গোত্রে বিবাহ করা চলে না। এর ফলে অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহের রীতি একসঙ্গে অনুসৃত হয়।

বর্ণ ও উপবর্ণ

বর্তমান ভারতে আনুমানিক তিন হাজার বর্ণ ও কৌম আছে। মূল বর্ণ হচ্ছে চারিটি। যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই চারি বর্ণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে অন্যান্য জাত্ বা উপবর্ণ (sub-caste),—এ জাতীয় জন-

প্রভৃতির সঙ্গে আমরা পরিচিত। উপবর্ণ থেকেও আবার উপ-উপ-বর্ণের (sub-sub-caste-এর) উদ্ভব হয়েছে। একথা হয়ত আংশিক সত্য। বর্ণ-সঙ্কর একেবারে অলীক নয়। সংকরের ফলে কিছু কিছু নূতন বর্ণের উদ্ভব সম্ভাব্য। কিন্তু বহু বর্ণ বৃত্তি-গত, যথা নব শায়ক বর্ণ। এগুলি সংকরজ হতে পারে না। বৈদ্য ও কায়স্থ আদিতে বৃত্তি-গত গোষ্ঠী, এদের ভিতরে ব্রাহ্মণ ছিল না এমন কথা বলা চলে না। এ দুটি সংকরজ বর্ণ হতে পারে না। হাড়ি, ডোম প্রভৃতি কৌম-বর্ণ বা tribal caste। এগুলি সংকরজ বর্ণ-রূপে বিবেচিত হতে পারে না। সংকরের বা বর্ণ-মিশ্রণের কাহিনীগুলি বহুলাংশে কল্পিত।

বর্ণভেদের দোষগুণ

পূর্বেকার বর্ণভেদ হচ্ছে হিন্দু সমাজের সাংগঠনিক রূপ। এর ফলাফল দোষ ও গুণ-যুক্ত।

(১) বৃত্তি-মূলক বর্ণগুলি অনেক ক্ষেত্রে guild-এর, গিল্ড্-এর আকার-প্রাপ্ত। এক অঞ্চলে হয়ত এরূপ একটি বর্ণের বসতি। যেমন, জেলে বা বাগ্দি-পাড়া, কামার-পাড়া, কুমোর-পাড়া, সাহা-পল্লী ইত্যাদি বর্ণানুযায়ী আঞ্চলিক বিভাগ প্রাচীন বাংলায় ছিল বলে মনে হয়। এরূপ বর্ণের মধ্যে যৌথ সহযোগিতার নীতি স্বীকৃত ছিল। এর ফলে ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তা (social security) ছিল, বিপদে আপদে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল, জীবিকার নিশ্চয়তা ছিল, অদক্ষের জন্য কাজের ব্যবস্থা ছিল, শারীরিক বিকৃতির বা অপটুতার ক্ষেত্রেও বেকারী-জনিত দুর্দশার কবলে পড়তে হত না, নিশ্চিত আশ্রয় ও বাসস্থান ছিল। বর্তমানের শহুরে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গরীবী, বেকারী ও ভিক্ষাবৃত্তি অনিবার্য হয়ে উঠেছে, যদিও এর প্রতিবিধান সম্ভব হয়েছে উন্নত দেশগুলিতে জনকল্যাণ-মূলক অর্থনীতির রূপায়ণের ভিতর দিয়ে কিংবা সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে।

(২) বর্ণের অন্তর্ভুক্ত লোকরা বিনা খরচায় বংশানুক্রমিক বৃত্তিতে শিক্ষা লাভ করত। বর্তমান শহুরে ব্যবস্থায় এরূপ ট্রেনিং লাভের সুবিধা সংকুচিত।

(৩) বৃত্তি-গত সংগঠনের ফলে প্রতিযোগিতা ও বেকারীর সম্ভাবনা থাকত না। বৃত্তি-গোষ্ঠীর সকল সভ্যের কর্মপ্রাপ্তি ছিল নিশ্চিত।

(৪) বিভিন্ন বর্ণকে নিয়ে গঠিত ছিল হিন্দু সমাজ। সমাজের আকারটি একমতে উদারনৈতিক সংযোগসংস্থার (liberal federation-এর) সদৃশ। নবাগত গোষ্ঠীর সমাজে অন্তর্ভুক্তি সহজ ছিল। এরূপ গোষ্ঠীকে একটি সংকরবর্ণ-রূপে (mixed caste-রূপে) গণ্য করা হত এবং এর উপর একটি গোত্র আরোপিত হত। উদাহরণ-স্বরূপ উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা উল্লিখিত হতে

পারে। এরা ছিল আদতে একটি কৌম। হিন্দু সমাজে এরা একটা বর্ণ-রূপে গৃহীত হয়েছে এবং হিন্দু গোত্রও এরা স্বীকার ক'রে নিয়েছে। হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দিরাও হচ্ছে এজাতীয় কৌম-বর্ণ। বহু নূতন নূতন গোষ্ঠী হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং বর্ণ-পরিকল্পনায় স্থান লাভ করেছে। এরূপ গোষ্ঠীর অধিকার ভোগ নিজ সীমানার মধ্যে, তার বাইরে নয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর তরফে অন্তর্বিবাহ পালনীয় রীতি। বিচিত্র গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বিপুলকায় হিন্দু সমাজ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসূত্র হচ্ছে বর্ণানুসারী ও গোত্রানুসারী ধর্মবিশ্বাস।

বর্ণ-ব্যবস্থার ত্রুটী হচ্ছে বৈষম্য-নীতি, যা বর্তমান কালের বুর্জোয়া বা কমিউনিস্ট সাম্যনীতির বিরোধী। আধুনিক সাম্যনীতি অনেকটা তত্ত্বগত, বস্তু-গত নয়। বর্ণ-গত বৈষম্য-নীতির মধ্যে কোন কপটতা নেই।

বর্ণভেদ যে সামাজিক দূরত্ব বিভিন্ন জাতের মধ্যে রূপায়িত করেছে তা বহুক্ষেত্রেই মানবিক অধিকারকে খণ্ডন করেছে। বর্ণভেদকে পরিপোষণ করেছে পুনর্জন্মবাদ ও কর্মবাদ। উচ্চ বা নীচ বর্ণে জন্ম পূর্বজন্মের কর্মের ফল এরূপ ধারণা সৃষ্ট হয়েছে। এর ফলে সামাজিক অবিচারকে কর্মফল-রূপে গ্রহণ করবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে।

প্রথম প্রকরণ ঃ

ভারতে সামাজিক বিবর্তন

সামাজিক বিবর্তন একটিমাত্র রেখায় চালিত হয় এমন একটি ধারণা উনিশ শতকীয় চিন্তাধারায় পরিপোষিত। এরূপ ধারণা পোষণ করতেন স্পেন্সার, টাইলর, মর্গান, এঙ্গেলস প্রভৃতি। বিশ শতকীয় সমাজবিজ্ঞানে একরৈখিক বিবর্তনবাদ খণ্ডিত হতে থাকে। আঞ্চলিক অনুসন্ধানে বিবর্তনের আঞ্চলিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। সব অঞ্চলে সামাজিক বিবর্তন এক-প্রকার নয়। অঞ্চলভেদে বিবর্তনের ভিন্নতা। অঞ্চল অনুসারে বিবর্তনের পার্থক্য তথ্য বিশ্লেষণে উদ্‌ঘাটিত হয়। ইউরোপের মডেল সামনে রেখে ভারতের সামাজিক বিবর্তনকে ব্যাখ্যার চেষ্টার সঙ্গেই আমরা পরিচিত। ইউরোপের সামাজিক বিকাশের ধারায় ভারতকে বিচার প্রায় প্রচলিত রীতি হয়ে উঠেছে। উভয় অঞ্চলের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও আছে। সাদৃশ্যের গুরুত্ব অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যের গুরুত্ব কম নয়। প্রাচীন গ্রীসের ও রোমের সামাজিক ব্যবস্থাকে বলা হয় দাসতা (slavery)। ঠিক এ ধরণের সামাজিক প্রথার অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতে সুলভ নয়। যদি প্রশ্ন করা হয় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ কি দাসতাতান্ত্রিক (slave-owning) অথবা সামন্ততান্ত্রিক (feudal) অথবা আদিম সাম্যবাদের (primitive communism) নীতিতে গঠিত, তাহলে এক কথায় নেতিমূলক উত্তর দিতে হয়। ভারতের প্রাচীন যুগকে সাম্যবাদ-রূপে অভিহিত করা যায় না। বৈদিক ও বৈদিকোত্তর পর্যায়ে যৌথতন্ত্রের (communism) কিছু কিছু রূপায়ণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তার ক্ষেত্র সীমিত। তার পাশাপাশি ব্যক্তিতন্ত্রের ক্ষেত্রও রয়েছে। বৈদিক সমাজে যৌথতন্ত্রের ও ব্যক্তিতন্ত্রের প্রচুর উপকরণ বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতে, এমন কি বৈদিক যুগেও দাসব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তা গ্রীসীয় বা রোমীয় দাসতার সঙ্গে তুলনীয় নয়। সামন্ত প্রথার আংশিক বিকাশ হয়েছিল প্রাচীন ভারতে ; তাকে বলা চলে আদি-সামন্ততন্ত্র (proto-feudalism) ; তা পূর্ণ সামন্ততন্ত্র নয়। রাজতন্ত্রের আবছায়ায় পারিবারিক সাম্যবাদ যেমন ছিল, তেমনি ছিল করদ রাজাদের দ্বারা উপলক্ষিত উপরাজতন্ত্র। Feudalism-এর ভাষান্তর করা হয় সামন্তপ্রথা বা সামন্ততন্ত্র শব্দের দ্বারা। সংস্কৃত ভাষায় সামন্ত মানে করদ রাজা। ফিউড (feud) শব্দের অর্থ দুই গোষ্ঠীর বিবাদ অথবা যুদ্ধকর্মভিত্তিক ভূমিব্যবস্থা। ইউরোপের মধ্যযুগে লর্ডদের (lord) অধীনস্থ ভ্যাসালদের (vassal) যুদ্ধকর্ম-ভিত্তিক ভূমিস্বত্বকে ফিউডালিজম্-রূপে আখ্যাত করা হত। ঠিক এ ধরণের ফিউডালিজম প্রাচীন ভারতে ছিল কিনা তা গবেষণার বিষয়। ফিউডালিজম্-এর প্রধান লক্ষণ মধ্যস্বত্ব ; তা

ভারতের প্রাচীন সমাজে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। রাজার করদাতা উপরাজা কি মধ্যস্বত্বভোগী? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। চাষীরা কি ভূমিদাস (serf)? এই প্রশ্নও প্রাচীন ভারতের পক্ষে এক কথায় উত্তরযোগ্য নয়। আবার, রাজতন্ত্রের মধ্যে, বিশেষত বৈদিকোত্তর কালে, বড়-ছোট ভূমিদখলকারীরা বর্তমান ; তা ফিউডালিজমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই দিক দিয়ে বিচার করলে প্রাচীন ভারতীয় ব্যবস্থাকে নাম দেওয়া যায় প্রোটো-ফিউডালিজম্ বা আদি-সামন্ততন্ত্র বা উপরাজতন্ত্র। এই ব্যবস্থার মধ্যেই পরিবারের পরিধিতে ক্ষেত্রবিশেষে কমিউনিজমের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, আবার দাসত্বের বা গোলামীরও অবকাশ ছিল। গোলামের অস্তিত্ব আগা-গোড়া প্রাক্-মুসলমান ও মুসলমান পর্যায়কে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু কোন সময়েই উৎপাদনব্যবস্থার একটা পর্যায়রূপে দাসতা বিকশিত হয়নি।

ক্রোয়েবার ইউরোপের লা টেনি (La Tene) লৌহযুগের পর্যায়কে প্রোটো-ফিউডালরূপে গণ্য করেছেন। এই পর্যায়টি প্রধানত কেল্‌ট্‌দের সঙ্গে যুক্ত। প্রাচীন ভারতের প্রসঙ্গে প্রোটো-ফিউডাল শব্দটি প্রযোজ্য কিনা বিবেচ্য। গ্রীক প্রোটোস, protos মানে প্রথম বা প্রাথমিক। তার সঙ্গে ফিউডাল কথাটি যোগ ক'রে শব্দটি তৈরী হয়েছে। [Anthropology, A. L. Kroeber, 1948, p. 731]

বৈদিক আমলে জ্ঞাতি বা সজাত শব্দ দ্বারা জ্ঞাতিগোষ্ঠীর (kin-group) ধারণা হয়। গিনস্‌বার্গ কিন-গ্রুপ শব্দটি ক্ল্যানের অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আমরা ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করছি। বৈদিক জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বৃহত্তর রূপ হচ্ছে পরবর্তীকালের সপিণ্ড গোষ্ঠী। জ্ঞাতিগোষ্ঠী বা সপিণ্ডগোষ্ঠী হল ছোট-বড় যুক্তপরিবার, যার ভিতরে যৌথতন্ত্র আংশিকভাবে মূর্ত হয়েছিল। [Sociology, M. Ginsberg, 1963, p. 131]

প্রাচীন ভারতে চাষী-মজুর বা ক্ষেত-মজুর ছিল, এমন কি সম্ভবত বৈদিক সমাজেও ক্ষেতমজুরদের অস্তিত্ব ছিল। বৈদিক গ্রন্থের কীনাশ সম্ভবত ক্ষেত-মজুর, যেহেতু তাকে সীরপতি থেকে তফাৎ করা হয়েছে। সীরপতি হল সীর বা লাঙ্গলের মালিক। অথচ বৈদিক সামাজিক সংগঠন যে কৌম-তান্ত্রিক (tribal) এবিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। কৌমতন্ত্রের পর্যায়ে শ্রেণীভেদ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা আভিজাত্য থাকতে পারে না এই ধরণের চরম সিদ্ধান্তের প্রতি পক্ষপাত থাকলে বৈদিক যুগকে বোঝাই যাবে না। বৈদিক সমাজে দাসতাও বিবর্তিত হয়েছে। দাসত্ব-সূচক বৈদিক শব্দতালিকা খুব ছোট নয়।

কিংকর—ভৃত্য, অথর্ব ৮।৮।২২।

অনুচর—ভৃত্য, বা সং ৩০।১৩।

দাস—গোলাম, slave, অথর্ব ৪।৯।৮।
অশনকৃৎ—রন্ধনকারী, অথর্ব ৯।৬।১৩।
পরিবেষ্টা—পরিবেষণকারী, অথর্ব ৯।৬।৫১।
দাসী—অনার্য চাকরাণী, অথর্ব ৫।২২।৬।
করণ—অধীনস্থ ব্যক্তি, অথর্ব ৬।৪৬।২।
শূদ্রা—অনার্য চাকরাণী, অথর্ব ৫।২২।৭।
দাসপুরুষ—অনার্য চাকর, তৈত্রা ৩।৮।৫।
শূদ্র—প্রেষ্য, ভৃত্য, ঐত্রা ৭।৫।৩।
উদহার্য—জলবাহক, অথর্ব ১০।৮।১৪।

এ তো হল বৈদিক সমাজের হালচাল। উত্তরকালের দৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে মনুসংহিতায় ও অর্থশাস্ত্রে। মনু শূদ্রের দাস্যের কথা বলছেন। তিনি দাস বা গোলামের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যথা,—(১) ধ্বজাহৃত, যুদ্ধের দ্বারা সংগৃহীত; (২) ভক্তদাস, ভাতের জন্য যে দাসত্ব নিজেই স্বীকার করেছে; (৩) গৃহজ, গৃহে জাত (দাসীপুত্র); (৪) ক্রীত, অর্থ দ্বারা ক্রীত; (৫) দত্রিম, দানের দ্বারা প্রাপ্ত; (৬) পৈত্রিক, পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত; (৭) দণ্ডদাস, শাস্তির দ্বারা দাসত্ব দশাপ্রাপ্ত। (মনু ৮।৪১৩-৪১৫)

কৌটিল্য দাস ও কর্মকরদের বিষয়ে বিধান দিয়েছেন। তিনি দাসদের মধ্যে আর্য ও ম্লেচ্ছের তফাৎ করেছেন। আর্য স্বভাবত দাস নয়। আত্ম-বিক্রয়কারী আর্য দাসত্ব বরণ করলেও তার পুত্র আর্যরূপেই গণ্য হবে। যে আর্য গোলামী বরণ করেছে সে ক্ষতিপূরণ (মূল্য) দিয়ে আর্যত্ব ফিরে পেতে পারে। আর্যবংশোদ্ভব নাবালককে বিক্রয় বা বন্ধকদান (আধান) দণ্ডনীয়। ম্লেচ্ছরা পুত্রকে বিক্রয় বা বন্ধকদানে অধিকারী। [অর্থশাস্ত্র ৩।১৩।৪—ন তু এব আর্যস্য দাসভাবঃ; ৩।১৩।১৩—আত্মবিক্রয়িণঃ প্রজাম্ আর্যাং বিদ্যাৎ; ৩।১৩।১৫—মূল্যেন চ আর্যত্বং গচ্ছেৎ; ৩।১৩।১—আর্যপ্রাণং শূদ্রং বিক্রয়াধানং নয়তঃ দণ্ডঃ; ৩।১৩।৩—ম্লেচ্ছানাম্ অদোষঃ প্রজাং বিক্রেতুম্ আধাতুং বা।]

কৌটিল্য-প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে কর্মকরদের বেতন (wage) ছিল। এই বেতন পূর্বপ্রতিশ্রুত হতে পারে কিংবা প্রতিশ্রুতি ব্যতীত কর্ম-কালের অনুরূপ হতে পারে। যেস্থলে পূর্বপ্রতিশ্রুতি নেই, সেখানে কর্ষক উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ, গোয়ালা ঘৃতের এক দশমাংশ, ব্যবসায়ী (বৈদেহক) পণ্য বিক্রয়জনিত লাভের এক দশমাংশ পাবে। অর্থশাস্ত্রে একটি তথ্য রয়েছে ভাগচাষ বিষয়ে। অর্ধসীতিক দ্বারা জমি চাষ করা হত। যে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পেত, সেই হয়ত অর্ধসীতিক। উৎপন্ন ফসলের চতুর্থ বা পঞ্চম ভাগ পেত স্ববীর্যোপজীবী, অর্থাৎ, শ্রমজীবী। [অর্থশাস্ত্র ৩।১৩।২৬-২৮; ৯; ২।২৪।১৬]

অর্ধসীতিক বা অর্ধসীতিকা সম্ভবত ভাগচাষী পুরুষ বা নারী এবং স্ব-বীর্যোপজীবী হল ক্ষেতমজুর। (অর্থশাস্ত্র ২।২৪।১৬)

ভৃতক হচ্ছে ভৃত্য। বেতন নিয়ে যে ভৃত্য কর্ম করে না, সে দণ্ডনীয়। (৩।১৪।১)

সংঘভৃত হচ্ছে গিল্ড্-এর কর্মী। সংঘভৃতরা নিজেদের মধ্যে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে অথবা সমানভাবে প্রাপ্ত বেতন ভাগ করে। সংভূয়সমুত্থান হচ্ছে সমবায়-কর্ম। সমবায় কর্মীরাও উক্ত প্রণালীতেই নিজেদের মধ্যে প্রাপ্ত বেতন ভাগ করে। সংঘ বোধ হয় স্থায়ী গিল্ড্-জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সংভূয়-সমুত্থান অস্থায়ী মজুরদের সংগঠন। (৩।১৪।১৮)

শ্রেণী হচ্ছে কারুদের গিল্ড্। কারু হল শিল্পী। শ্রেণীর কর্মীরা বেতন লাভ করত কাজের জন্য। তন্তুবায় বা তাঁতী, রজক বা ধোবা বেতন-প্রাপ্ত কর্মী। (৪।১।৩-৫, ৮-১০, ১৫-২০)

অমরের মতে যে সকল একজাতীয় কারু বা শিল্পী সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করত তাদের সংগঠনকে শ্রেণি-রূপে নির্দিষ্ট করা হত। (অমর ২।১০।৫)

এই উদাহরণগুলিতে wage-labour বা সবেতন শ্রমের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। দাসের শ্রম (slave-labour) নীতি যে সময়ে ছিল, সেই সময়েই বেতনযুক্ত শ্রম নীতিও বিকশিত হয়েছে। আর এক প্রকার শ্রম পরিচিত ছিল বিষ্টি-রূপে। বিষ্টি কর্ম হল বিনা বেতনে শ্রম। গ্রামের গণ্যমান্য লোকরা সম্ভবত চাষী মেয়েদের (চর্ষণী) কাছ থেকে বিষ্টি কর্ম আদায় করত। যথা, গ্রামাধিপতি বা সরকার-নিযুক্ত গ্রামের শাসক, আযুক্ত বা কৃষির অধিকর্তা, সম্পন্ন কৃষক (হলোত্থবৃত্তি)। বিষ্টি কর্মের অন্তর্গত ছিল কোষ্ঠাগারে দ্রব্য প্রবেশন ও নিষ্ক্রামণ, গৃহসংস্কার, ক্ষেত্রকর্ম, সূত্রকর্তন, ক্রয় বিক্রয়। এরূপ কাজের জন্য কোন বেতন দেওয়া হত না। ইউরোপেও মধ্যযুগে কর্ভি (corvee) নামে বিনা বেতনের শ্রম সামন্তপ্রভু পল্লীবাসীর কাছ থেকে আদায় করতেন। ভারতীয় দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণে সামন্তপ্রভুকে পাওয়া যাচ্ছে না, যেহেতু গ্রামাধিপতি রাজার দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারী মাত্র। [কামসূত্র ৫।৫।৫, ৬]

মার্কসীয় চিন্তাপ্রণালীতে দাসতাপর্বের সঙ্গে দাসের শ্রমকে, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বিনা বেতনের শ্রমকে, পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে সবেতন শ্রমকে যুক্ত করা হয়। তিনটি পর্বের পৌর্বাপর্য প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু বৈদিকোত্তর ভারতে তিন প্রকার শ্রমের একত্র অবস্থিতি দেখা যায়। এতে প্রতিভাত হয় যে স্থান কাল পাত্র ভেদে সামাজিক বিকাশ রূপ লাভ করে। একরৈখিক বিবর্তনের সূত্র যুক্তিতে টেকে না।

ইউরোপে শ্রেণী (class)-বিন্যাসের যেরূপ পর্যায়বিভাগ করা যায় তা

ভারতের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ইউরোপের ক্রমবিকাশের ধারায় প্রথম পর্যায়ে প্রভু ও গোলাম, দ্বিতীয় পর্যায়ে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস, তৃতীয় পর্যায়ে পুঁজিপতি ও মজুর, পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীরূপে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতে প্রাচীনকালে প্রভুরা ও গোলামেরা খুব মূল্যবান সামাজিক ভূমিকায় আসীন নয়; তাদের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার্য। প্রাচীন ভারতের গ্রামণী বা গ্রামাধিপতিকে সামন্ত প্রভু-রূপে বিবেচনা করা কঠিন। সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য মধ্যস্বত্ব হিন্দু আমলে বিকশিত বা অবিকশিত তা প্রমাণ-সাপেক্ষ। ভারতে শ্রেণীসমন্বয়ের চিত্রই অধিকতর পরিস্ফুট ছিল আধুনিক কালের পূর্ব পর্যন্ত। আর একটি বৈসাদৃশ্য গুরুত্বপূর্ণ। তা হল ভারতীয় বর্ণবিন্যাস (caste), যার সঙ্গে পাশ্চাত্য অঞ্চলের প্রায় পরিচয় নেই। শুধু বর্ণভেদের দিকটি বিচার করলেই ভারতীয় ও ইউরোপীয় সামাজিক বিকাশ-ক্রমের বিপুল পার্থক্য উদ্ঘাটিত হয়।

পুরাতাত্ত্বিক সংস্কৃতির বিচারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সাদৃশ্য স্বীকার করতে হয়। এই সাদৃশ্য বাস্তব সংস্কৃতির (material culture-এর) দিক দিয়ে। উভয় অঞ্চলেই নিম্ন প্রত্ন প্রস্তর যুগ (lower palaeolithic), মধ্য প্রস্তর-যুগ (mesolithic), নব্য প্রস্তরযুগ (neolithic), তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জ পর্ব ও লৌহ যুগ বিকাশপ্রাপ্ত। ইউরোপে উচ্চ প্রত্ন প্রস্তর যুগ (upper palaeolithic) বিবর্তিত হলেও ভারতে এই পর্যায়টি অনুপস্থিত। পঞ্জাবের সোন (Soan) সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তরের ত্বক্ হাতিয়ার (flake tools) ইউরোপীয় ক্লাকটোনীয় ও লেভালোয়াসীয় ত্বক্ হাতিয়ারের সঙ্গে তুলনীয়; মাদ্রাজের ত্বক্-মুক্ত পাথুরে হাতিয়ার (core tools) ইউরোপীয় একুলীয় শিল্পকে স্মরণ করায়। মহীশূরের ব্রহ্মগিরিতে মধ্য প্রস্তর যুগের, নব্য প্রস্তর যুগের ও লৌহ যুগের উপকরণ খনিত হয়েছে। হরপ্পা সংস্কৃতির অন্তর্গত তাম্র ও ব্রোঞ্জ হাতিয়ার সমূহ। ইউরোপের ড্যানুবীয় সংস্কৃতিতে নব্য প্রস্তর পর্ব, তাম্রপর্ব, ব্রোঞ্জ পর্ব এবং লৌহপর্ব প্রমাণসিদ্ধ। ভারতে বৃহৎ প্রস্তরের সমাধির (megalithic tomb) সঙ্গে জড়িত নব্য প্রস্তরের, তাম্রের, ব্রোঞ্জের ও লৌহের উপকরণসমূহ। ব্রিটেনে নব্যপ্রস্তর পর্যায়ে বৃহৎ প্রস্তরের সমাধি নির্মিত হয়েছিল [Prehistoric India, S. Piggott, 1952, pp 30 35 ; Vedic Age, H. D. Sankalia's article, pp. 132, 133, 135 ; Social Evolution, G. Childe, 1963, pp. 88-97 ; Archaeology, S. G. Brade-Birks, 1962, pp. 69-71.]

ভারতীয় বৈদিক পর্বের শ্রেণী-বিভাগের সঙ্গে ইউরোপীয় অঞ্চলবিশেষের প্রাচীন শ্রেণীবিভাগের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয়। যথা,—(১) বৈদিক সমাজে ছিল চারিটি শ্রেণী ; ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র। (২) প্রাচীন রোমীয়

সমাজে শ্রেণীসংস্থান এই প্রকার : পুরোহিতশ্রেণী—ফ্লেমিনেস, flamines ; যোদ্ধাশ্রেণী—মিলিটেস, milites ; প্রজাসাধারণ—কুইরিটেস, quirites. (৩) গলের, অর্থাৎ প্রাচীন ফ্রান্সের কেল্টদের সামাজিক স্তরগুলি এইরূপ : পুরোহিতশ্রেণী—ড্রুইডেস, druides ; যোদ্ধাশ্রেণী—ইকুইটেস, equites ; প্রজাসাধারণ—প্লেবেস, plebes. (৪) প্রাচীন গ্রীসের শ্রেণীসংস্থান: রাজা বা অভিজাত—বেসিলিয়াস, basileus ; স্বাধীন প্রজা—থেট, thet ; গোলাম—ডোলোস, doulos. (৫) অ্যাংলো স্যাকসন ইংলণ্ডে শ্রেণীসংস্থানের দৃশ্য : যোদ্ধা বা অভিজাত—এওর্ল্, eorl (earl) ; স্বাধীন প্রজা —সেওর্ল্, ceorl (churl). [Piggott, p. 259 ; Evolution of Property, P. Lafargue, Calcutta, p. 29, fn. ; The Beginnings of English Society, D. Whitelock, 1952, p. 83.]

দাস শব্দটির সঙ্গে স্লেভ (slave) শব্দটিকে তুলনা করা চলে। আদি বৈদিক পর্যায়ে যুদ্ধবন্দী অনার্যকে দাস-রূপে বা শূদ্র-রূপে আখ্যাত করা হত। পরবর্তী কালে গোলামের বাচক হয় দাস-শব্দ। ইউরোপে স্লাভোনিক আর্যদের নাম ছিল স্লাভ (Slav)। এই শব্দ থেকে গোলাম-বাচক স্লেভ-শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় ও ইউরোপীয় শ্রেণীসংস্থান অনেকটা একজাতীয় হলেও ভারতে আর্য ও অনার্যের সমন্বয় ও আর্যীকরণের ভিতর দিয়ে বর্ণ-বিভক্ত সমাজের উদ্ভব ঘটে। বর্ণবিন্যাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির দৃষ্টিভঙ্গী (inclusiveness) এবং বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গী (exclusiveness) সমানভাবে প্রকট। আর্য সমাজে নবাগতরা বর্ণসংগঠনের একটি কক্ষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং তাদের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতি বজায় রাখতে পেরেছে। তাদের সংস্কৃতির বিলোপ ঘটেনি। তারা আর্যদের সঙ্গে একেবারে মিশেও যায়নি। এই সত্যের ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। ইসলামিক সমন্বয়ের ও ইউরোপীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলে বিজিতের সংস্কৃতির বিলোপ ঘটেছে বলপ্রয়োগের ফলে। আর্য সমাজে প্রবিষ্ট গোষ্ঠীর সংস্কৃতি পৃথক্ হওয়ায় আর্যগোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, যার ফলে বর্ণগত অন্তর্বিবাহ (caste endogamy) রীতি উদ্ভূত। কালে কালে এই সংকীর্ণ রীতির প্রসারের ফলে আর্য বর্ণগুলিতেও অন্তর্বিবাহ চালু হয়েছে। অনুপ্রবিষ্ট গোষ্ঠীকে মিশ্রবর্ণরূপে গণ্য করা হয়েছে এবং তার উপর আর্য গোত্রের ঐতিহ্য আরোপিত হয়েছে। একে বলা চলে আর্যীকরণের কলাকৌশল। এই ব্যাপারটা এক দিক দিয়ে অন্তর্ভুক্তি নীতিকে প্রকাশ করছে। আবার অন্য বিবেচনায় এই ঘটনা হিন্দু সমাজে বৈষম্যের (exclusiveness) সৃষ্টিকারী। আর্য ও অনার্যের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটলে বর্ণবিভাগের উদ্ভব হত না।

[Cultural Anthropology, N. K. Bose, 1961, pp. 29, 30 ; হিন্দু সমাজের গড়ন, নির্মল কুমার বসু, ১৯৫৬, পৃ ৭০ ।]

বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে বিবেচনা করা চলে আর্যীকরণের পরিণতি হিসেবে। সম্ভবত বর্ণভেদের জটিলতাগুলি আর্যীকরণের ফল। বর্ণসংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলির পশ্চাতে দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রভাব থাকতে পারে, যেমন টটেমিক উপকরণগুলিতে অস্ট্রিক প্রভাব থাকা সম্ভব। বাস্তব ও মানসিক সংস্কৃতিতে যে ঐক্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আদান প্রদানের ভিতর দিয়ে, তা সমাজের ক্ষেত্রে অলক্ষিত, যেহেতু বর্ণব্যবস্থা অনুসারে সমাজ হয়েছে সংগঠিত। শ্রেণীবিভাগের চেয়েও ভারতে বর্ণভেদের সামাজিক ভূমিকাই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সেই কারণে ইউরোপীয় নজীর ভারতীয় সমাজের বিশ্লেষণে খুব কার্যকরী নয়।

প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে সামাজিক পরিচিতি নির্ভর করে প্রধানত গোত্র-নাম ও বর্ণের নাম খ্যাপনের উপর। গোত্র ও বর্ণের দ্বারা সমাজে পরিচিত হতে হয়। এই গোত্র-পরিচয় কল্পিত রক্ত সম্পর্কে বিশ্বাস মাত্র, যা আর্য ঋষি থেকে উৎপত্তি প্রতিপাদন করে। বর্ণ বা জাত্ সামাজিক পরিচয়ের দ্বিতীয় শর্ত। এই পদ্ধতিতে শ্রেণী (class)-গত কোন ঘোষণা অনিবার্য নয়। শ্রেণীর চেয়ে গোত্র ও বর্ণ অধিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। আর্য সমাজের ঐতিহ্য গোত্র ও বর্ণকে নিয়েই। এর আদি পর্বটা হল কৌমতন্ত্র (tribalism) এবং দ্বিতীয় পর্যায় বর্ণভেদ (casteism)। কৌমতন্ত্রের ব্যঞ্জক গোত্র পরিচয়। গোত্র-সংগঠন থেকে বর্ণসংগঠনে সমাজের উত্তরণ ঘটেছে। দাসতা বা সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধীয় বিবরণের দ্বারা হিন্দু সমাজীয় বিকাশকে যথার্থভাবে বোঝা যায় না। বর্তমানে ভারতে তৃতীয় সামাজিক পর্যায় রূপায়িত হতে চলেছে শিল্পায়নের ও শহরীকরণের ফলে। এই পর্বকে শিল্পসমাজ-রূপে আখ্যাত করা অশোভন নয়।

দ্বিতীয় প্রকরণ ঃ

বৈদিক আর্যদের পরিবারপ্রথা ও যৌনজীবন

কৌমে বিভক্ত ঋগ্বেদীয় সমাজে একক পরিবারের অস্তিত্ব ছিল কিনা এই ধরণের প্রশ্নকে স্বভাবতই আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। ঋগ্বেদে চিত্রিত সমাজ কৌম-সংগঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সিদ্ধান্ত করার পক্ষে যেমন নজীরের অভাব নেই, ঠিক তেমনি ছোট ছোট পারিবারিক সংস্থা-সূচক ঋক্‌-মন্ত্রও লক্ষিত হয়। কৌমী ব্যবস্থার যৌথ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ক্ষুদ্র পরিবারের অসঙ্গতি যদি কল্পনা করি, তাহলে এই ঋক্‌মন্ত্রগুলিকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(১) ব্যক্তিগত পরিবার

স্বামী-স্ত্রীর অর্থে দম্পতী-শব্দের উল্লেখ ঋগ্বেদে কয়েক স্থানে দৃষ্ট হয়। দেবতা অগ্নি অর্যমা রূপে দম্পতীর ভালবাসা অটুট রাখেন। একমনোযুক্ত হয়ে দম্পতী সোমরস নিষ্কাশন করে। দম্পতী-শব্দের তাৎপর্য সম্ভবত mono-gamous family বা একবিবাহজাত পরিবার। (ঋ ২।৩৯।২ ; ৫।৩।২ ; ৮।৩১।৫)

মানব-সমাজে সুসংযত দাম্পত্য-জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে একটি মন্ত্রে। অত্রি ঋষির কন্যা বিশ্ববারা একটি সূক্তের ঋষি। তিনি প্রার্থনা করছেন,—

অগ্নে * * * সং জাম্পত্যং সুযমম্‌ আ কৃণুষ। (ঋ ৫।২৮।৩)

হে অগ্নি, তুমি দাম্পত্যজীবনকে সুসংযত কর।

কয়েকটি ক্ষেত্রে এক-বিবাহ-জাত ক্ষুদ্র পরিবারের আলেখ্য অনুমান করা যায়। যথা,—

(১) ঋষি অগস্ত্য এবং লোপামুদ্রা স্বামী স্ত্রী ; ঋ ১।১৭৯।১-৪ ; বৃহদ্দেবতা ৪।৫৭, ৫৮ ;

(২) রাজা ভাবয়ব্য এবং রোমশা স্বামী স্ত্রী ; ঋ ১।১২৬।৬, ৭ ; বৃহদ্দেবতা ৩।১৫৫, ১৫৬ ;

(৩) খেল রাজা এবং বিশ্‌পলা স্বামী স্ত্রী ; ঋ ১।১১৬।১৫ ;

(৪) রাজা আসঙ্গ এবং শশ্বতী স্বামী স্ত্রী ; ঋ ৮।১।৩৪ ; বৃহদ্দেবতা ৬।৪০;

(৫) রাজা তরন্ত এবং শশীয়সী স্বামী স্ত্রী ; ঋ ৫।৬১।৬, ১০ ; বৃহদ্দেবতা ৫।৬০-৬৪।

অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার উক্তি প্রত্যুক্তি একটি সূক্তে প্রদত্ত হয়েছে।

লোপামুদ্রার উক্তি,—"বহু সংবৎসর অবধি, আমি রাত্রিদিন এবং জরা

সমুৎপাদক উষাতে তোমার সেবা করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি। জরা শরীরের সৌন্দর্য নাশ করিতেছে। এক্ষণে কি? পুরুষ স্ত্রীর নিকটে গমন করুক।"

অগস্ত্যের উক্তি,—"আমরা বৃথা শ্রান্ত হই নাই, যেহেতু দেবতারা রক্ষা করিতেছেন। আমরা সমস্ত ভোগই উপভোগ করিতে পারি। যদি আমরা উভয়ে চেষ্টান্বিত হই, এই জগতে আমরা শত ভোগপ্রাপ্তিসাধন লাভ করিতে পারিব।" (ঋ ১।১৭৯।১, ৩; রমেশ দত্ত-কৃত অনুবাদ।)

এই কথোপকথনে স্বামীস্ত্রীমূলক ব্যক্তিগত পরিবারের ছবি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

ঋক্‌মন্ত্রে ভাবয়ব্য ও রোমশার উক্তি প্রত্যুক্তিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভাবয়ব্যের উক্তি,—"বহুতেজোযুক্তা হইয়া রমণী আমাকে শতবার ভোগ প্রদান করিতেছে।" স্ত্রী রোমশার উক্তি,—"নিকটে আসিয়া বিশেষরূপে স্পর্শ কর। আমি গান্ধারদেশীয় মেষীর ন্যায়…পূর্ণাবয়বা।" (ঋ ১।১২৬।৬, ৭; রমেশ দত্তের অনুবাদ।)

এটি দাম্পত্য সম্ভোগের চিত্র। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে ভোগের ইচ্ছা নিবেদন করছে।

খেল রাজার পত্নী বিশ্‌পলার একটি পা ছিন্ন হলে অশ্বিন্ দেবতাদ্বয় বিশ্‌পলাকে আয়সী জংঘা পরিয়ে দিয়েছিলেন গমনের জন্য। (ঋ ১। ১১৬।১৫)

এই আয়সী জংঘা হয়ত ব্রোঞ্জ-নির্মিত কৃত্রিম জংঘা। এরূপ বর্ণনায় ধাতুবিদ্যার উন্নতি সূচিত হয় এবং রণস্থলে স্বামী স্ত্রীর একত্র সংগ্রাম বিষয়ে ধারণা হয়।

আসঙ্গ রাজার মহিষী শশ্বতী। দেবতার শাপে রাজার পুরুষত্বহানি ঘটে। স্ত্রীর তপস্যার ফলে তিনি পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করেন। এক্ষেত্রেও একবিবাহ-জাত পরিবারের ধারণা হয়। (ঋ ৮।১।৩৪)

রাজা তরন্ত এবং তাঁর স্ত্রী শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে ধন দান করেন। তাঁদের নাম দৃষ্ট হয় ঋক্‌মন্ত্রে। (ঋ ৫।৬১।৬, ১০)

রাজপরিবারেও একবিবাহের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। পুরুকুৎসের পত্নী পুরুকুৎসানী। স্বামীর নামে স্ত্রীর নামকরণ পুরুষের প্রাধান্যের সূচক। পুরু-কুৎসানী স্তবের দ্বারা ইন্দ্র ও বরুণ দেবতাকে সন্তুষ্ট করেন এবং ত্রসদস্যু নামে পুত্র লাভ করেন। (ঋ ৪।৪২।৯)

দেবতাদের ভিতরেও স্বামীর প্রাধান্য ছিল গৃহস্থালীতে। তার প্রমাণ স্ত্রীর নামকরণ স্বামীর নাম অনুসারে। যথা,—বরুণের স্ত্রী বরুণানী; ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী; অগ্নির স্ত্রী অগ্নায়ী। (ঋ ১।২২।১২)

ইন্দ্রের কয়টি স্ত্রী বোঝা যায় না। একস্থলে কথিত হয়েছে যে ইন্দ্রের পুত্র

বসুক্র। বসুক্রের পত্নী শ্বশুর ইন্দ্রকে যজ্ঞে আহ্বান করছেন। পুত্রবধূকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ইন্দ্র বসুক্রের সঙ্গে সংলাপ করছেন।

বসুক্রের পত্নীর উক্তি,—"আর সকল প্রভুই আসিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার শ্বশুর আসিলেন না। তিনি যদি আসিতেন, তাহা হইলে ভৃষ্টযব খাইতেন, সোমরস পান করিতেন। উত্তম আহারাদি করিয়া পুনর্বার নিজ গৃহে যাইতেন।" ইন্দ্রের উক্তি,—"আমি প্রাচীন, আমাকে সকলে এইরূপে স্তব করে যে, আমার কার্যভার স্বর্গ অপেক্ষাও গুরুতর। আমি একসঙ্গে সহস্রাধিক শত্রুকে দুর্বল করিয়া ফেলি।" (ঋ ১০।২৮।১, ৬ ; রমেশ দত্তের অনুবাদ।)

এস্থলে বসুক্র ও তাঁর পত্নীকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গৃহস্থালী পরিস্ফুট। এক-বিবাহজাত পরিবারের আলেখ্য।

একটি সূক্তে ইন্দ্র, ইন্দ্রপুত্র বৃষাকপি ও ইন্দ্রাণীর কথোপকথন থেকে অনুরূপ পারিবারিক চিত্র অনুমান করা যায়। চিত্রটি কলহ-মূলক। (ঋ ১০।৮৬।৭-৯)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের বাবাতা বা প্রিয়তমা পত্নী প্রাসহার উল্লেখ দেখা যায়। এতে বহুপত্নীযুক্ত পরিবারের দৃশ্য কল্পনীয়। ক-নামক প্রজাপতি প্রাসহার শ্বশুর। শ্বশুরের কাছ থেকে তাঁর অপসরণ থেকে বোঝা যায় যে পুত্রবধূর পক্ষে শ্বশুরের মুখ দর্শন ছিল নিষিদ্ধ। (ঐ ব্রা ৩।২।১১)

কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা পিতৃগৃহে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন কুষ্ঠ রোগের জন্য। বৃদ্ধবয়সে অশ্বিন্ দেবতাযুগলের কৃপায় তিনি পতি লাভ করেন। বৃদ্ধার পরিণয়কে অসমর্থন করেনি প্রাচীন বৈদিক সামাজিক ব্যবস্থা। পতি-গৃহে যাওয়ার পূর্বে তিনি প্রার্থনা করেন যে অশ্বিদ্বয় তাঁর স্বামীর ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান করুন। (ঋ ১।১১৭।৭ ; ১০।৪০।১৩)

ঋগ্বেদীয় গৃহস্থালীতে পত্নীত্যাগের দৃষ্টান্তও ছিল। চর্মরোগের দরুণ অত্রির কন্যা অপালা স্বামীর অনুগ্রহ-বঞ্চিতা হয়েছিলেন। ইন্দ্র দেবতার কৃপায় তাঁর চর্মদোষ দূর হয়। (ঋ ৮।৯১।৪)

উর্বশী ও পুরূরবার কথোপকথন থেকে প্রতীত হয় অস্থায়ী যৌন সম্পর্ক। উর্বশী বলছেন,– স্ত্রীলোকের সখ্য স্থায়ী হয় না। এই সখ্য হচ্ছে সালাবৃকের হৃদয়ের সামিল। (ঋ ১০।৯৫।১৫)

(২) ব্যক্তিগত গৃহ

বৈদিক সাহিত্যে ব্যক্তিগত গৃহের অস্তিত্বের নিদর্শনও দুর্লভ নয়। ঋক্‌মন্ত্রে সুরাপ্রস্তুতকারীর (সুরাবৎ) গৃহ উল্লিখিত হয়েছে। (ঋ ১।১৯১।১০)

তৈত্তিরীয় সংহিতার দৃষ্টান্ত একাধিক। বিভিন্ন দেবতাকে চরু আহুতি

প্রদান প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত গৃহের উল্লেখ করা হয়েছে যজুর্মন্ত্রে। যথা,—(১) ব্রহ্মন্ নামক ঋত্বিকের গৃহে বৃহস্পতি দেবতাকে চরু নির্বপণ বা প্রদান বিহিত। (২) রাজন্যের গৃহে (রাজন্যস্য গৃহে) ইন্দ্র দেবতাকে এগারোটি কপালে বা মাটির খোলায় চরু প্রদান করা হয়। (৩) মহিষীর গৃহ ও পরিবৃক্তির গৃহ পৃথক্‌ভাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। বৈদিক আমলে রাজার প্রধানা স্ত্রীকে বলা হত মহিষী এবং অনাদৃতা স্ত্রীর নাম ছিল পরিবৃক্তি। উভয়ের জন্য আলাদা গৃহের ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায় যে বহুস্ত্রীযুক্ত পরিবারে প্রত্যেক স্ত্রীর পৃথক্ গৃহস্থালী ছিল। (৪) চরু প্রদানের ব্যবস্থা সেনানীর বা সেনাপতির গৃহে (সেনান্যঃ গৃহে), সূতের বা চারণের গৃহে (সূতস্য গৃহে), গ্রামণীর বা গ্রামের মোড়লের গৃহে (গ্রামণ্যঃ গৃহে), ক্ষত্তার বা দ্বারপালের গৃহে (ক্ষত্তুঃ গৃহে), সংগ্রহীতার গৃহে (সংগ্রহীতুঃ গৃহে), ভাগদুঘের গৃহে (ভাগদুঘস্য গৃহে), অক্ষাবাপের বা অক্ষক্রীড়কের গৃহে (অক্ষাবাপস্য গৃহে)। সূত-শব্দের অর্থ সারথি বা চারণ, আবার ক্ষত্তৃ-শব্দের অর্থও সারথি বা দ্বারপাল বা রাজান্তঃ-পুরের কর্মচারী। সংগ্রহীতা ও ভাগদুঘ সম্ভবত রাজকর্মচারী। সংগ্রহীতা কর সংগ্রহকারী হতে পারে, যদিও কীথ-কৃত অনুবাদ ভিন্ন। ভাগদুঘ ভাগ-কর্তা বা ভাগ নামক কর সংগ্রহকারী। [তৈ সং ১।৮।৯ ; The Veda of the Black Yajus School, Part I, A. B. Keith, 1967, p. 120.]

বৈদিক যুগে সম্ভবত ব্যক্তিগত পরিবারের জন্য ব্যক্তিগত গৃহ ছিল, আবার যুক্ত পরিবারের জন্য বহু কোঠায় বিভক্ত বড় ঘরও ছিল। বৃহৎ ঘরের প্রত্যেক কোঠা আলাদা দ্বারবিশিষ্ট। এরূপ কোঠা একটি দম্পতীর জন্য। থাকার ব্যবস্থা হয়ত পৃথকীকৃত এবং ভোজনাদির যৌথ ব্যবস্থা কল্পনা করা চলে। বরুণ দেবতার সহস্র-দ্বার-সমন্বিত বৃহদায়তন গৃহ হয়ত অতিরঞ্জিত কবি-বর্ণনা। কিন্তু এই চিত্রের আংশিক সত্যতা মেনে নিলে যৌথ পরিবারের বাসস্থান বিষয়ে আভাস পাওয়া যায়। [ঋ ৭।৮৮।৫—বৃহন্তং মানং বরুণ সহস্রদ্বারং গৃহং তে।]

অগ্নিদেবতা গৃহপতি, দম্পতি, শালাপতি। গৃহ ও দম একার্থক। শালা কুটীর-বাচক। অগ্নি গৃহকে রক্ষা করেন। এই অর্থে তিনি গৃহপতি বা দম্পতি। তিনি শালাকে রক্ষা করেন। এই অর্থে তিনি শালাপতি। এক্ষেত্রে গৃহকর্তা পুরুষের ধারণা সামনে রেখে অগ্নির বিশেষণ কল্পিত হয়েছে। বৈদিক দম বা গৃহের কর্তা ছিল পুরুষ। গৃহস্থালী পিতৃতান্ত্রিক। গৃহকর্তার ক্ষমতা প্রচুর। ঋজ্রাশ্বের দোষে একশত মেষ নেকড়ে বাঘিনীর কবলে পড়লে তাঁর পিতা তাঁকে অন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। পুত্রের উপরে পিতার দাপট পিতৃশাসিত পরিবারের ছবি। [গৃহপতিঃ অগ্নে—ঋ ১।৩৬।৫ : দংপতিং—১।১২৭।৮ ; ঋজ্রাশ্বের কাহিনী—১।১১৬।১৬ ; শালাপতয়ে—অথর্ব ৯।৩।১২।]

সংস্কৃত শালা ; গ্রীক ক্যালিয়া, kalia—কুটীর ; লাতীন কেল্লা, cella—ছোট ঘর। সংস্কৃত দম—গৃহ ; গ্রীক ডোমোস, domos—বাসঘর ; লাতীন ডোমাস, domus—বাসঘর। সংস্কৃত বিশ্—গৃহ ; গ্রীক ওইকোস, oikos—ঘর ; লাতীন ভিল্লা, villa—পল্লীগৃহ। [Foundations of Language, L. H. Gray, 1958, pp. 102-104 ; The Sanskrit Language, T. Burrow, 1965, p. 39.]

ঋগ্বেদীয় ব্রাজ বোধ হয় বৃহৎ সংযুক্ত গৃহস্থালী, যদিও বৈদিক আমলের ব্রজ হচ্ছে গোস্থান। কুলপ বা কুলরক্ষক পুত্রেরা ব্রাজপতিকে মান্য করে। এস্থলে কুল মানে ব্যক্তিগত ফ্যামিলি বা পরিবার হতে পারে অথবা বংশও হতে পারে। [কুলপাঃ ন ব্রাজপতিং—ঋ ১০।১৭৯।২ ; ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং—তৈ সং ১।১।৯।]

স্বামীর দিক থেকে স্ত্রী কুলপা। কোন স্ত্রীলোকের অনিষ্ট সাধনের জন্য তাকে যমরাজার বধূ ও কুলপা-রূপে বর্ণনা করা হত। [অথর্ব ১।১৪।২, ৩]

স্ত্রী গৃহপত্নী-রূপেও বিবেচিতা। এই বিশেষণের তাৎপর্য বোধ হয় গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধানে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য। [গৃহপত্নী—ঋ ১০।৮৫।২৬]

একজন স্ত্রী-দেবীর পরিচালনাধীন বৈদিক মান বা গৃহ। মানস্য পত্নী মানের বা গৃহের অধিবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বাস্তোষ্পতি পুরুষ দেবতা। তিনি বাস্তুভূমির অধিপতি। ক্ষেত্রস্য পতিও পুরুষ দেবতা। তিনি চাষের ক্ষেত্রকে রক্ষা করেন। [মানস্য পত্ন্যা—অথর্ব ৯।৩।৫ ; বাস্তোষ্পতে—ঋ ৭।৫৪।১ ; ক্ষেত্রস্য পতিঃ—ঋ ৭।৩৫।১০।]

গৃহস্থালীর পরিধি, বাস্তুজমির ও চাষের ক্ষেতের মালিকানা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। মধুমৎ মে পরায়ণং মধুমৎ পুনঃ আয়নম্—গৃহ হতে আমার বহির্গমন এবং গৃহে প্রত্যাগমন মধুময় হোক,—এই ধরণের উক্তিতে ব্যক্তিগত বাসস্থানের কথা মনে হয়। (ঋ ১০।২৪।৬)

ঘরের মালিকানা মানেই কিন্তু বাস্তুজমির ব্যক্তিস্বত্ব নয়। বৈদিক যুগের জমির ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে। স্থাবর সম্পত্তির যৌথ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানার স্পষ্ট নজীর মেলে না।

ইন্দ্র উর্বরাপতি-রূপে বিশেষিত হয়েছেন। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় উর্বরাপতি বা চাষের জমির ভোগদখলকারী বাস্তবেও ছিল। (ঋ ৮।২১।৩)

মন্ধাতাকে বলা হয়েছে ক্ষেত্রপতি। দেবতা ক্ষেত্রস্য পতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যিনি জমি ভোগদখল করতেন তাঁকেই কি ক্ষেত্রপতিরূপে গণ্য করা হত ? তিনি কি সত্যিকার জমির মালিকও ছিলেন ? [ঋ ১।১১২।১৩—মন্ধাতারং ক্ষৈত্রপত্যেষু আবতম্।]

এ প্রসঙ্গে 'ক্ষেত্রসাতি' শব্দটি বিবেচ্য। এর অর্থ ভূমিলাভ বা জবরদখল।

পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু জমি দখলের ব্যাপারে ইন্দ্রের সাহায্য পেয়েছিলেন। অশ্বিন্ দেবতাদ্বয় ক্ষেত্রলাভে মনুষ্যকে সাহায্য করেন। [ঋ ৭।১৯।৩—প্র পৌরুকুৎসিং ত্রসদস্যুম্ আবঃ ক্ষেত্রসাতা ; ঋ ১।১১২।২২—ক্ষেত্রস্য সাতা।]

ক্ষেত্রাসাং এবং উর্বরাসাং শব্দের মধ্যে জমি প্রাপ্তির তাৎপর্য কিংবা ভূমি দখলের অর্থ লুকিয়ে থাকতে পারে। দখলকারীর জমিতে স্বত্ব থাকাই স্বাভাবিক। [ঋ ৪।৩৮।১—ক্ষেত্রাসাং দদথুঃ উর্বরাসাং।]

চাষের জমির জন্য দুইজনের বিবাদের কাহিনীও অপরিচিত নয় বৈদিক সমাজে। বিবাদের মূলে বোধ হয় রয়েছে জবরদখলের প্রেরণা। (ঋ ৬।২৫।৪—বি উর্বরাসু ব্রবৈতে।)

অত্রির দুহিতা অপালার একটি উক্তি এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করে। তিনি ইন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করছেন,—তাঁর পিতার রোমশূন্য শির এবং ঊষর চাষের জমি উৎপাদনশীল হোক। অর্থাৎ, পিতার টাক দূর হয়ে কেশ দেখা দিক এবং সেইসঙ্গে ক্ষেতেও ফসল ফলুক। চাষের জমিতে মালিকানার ইঙ্গিত এক্ষেত্রেও মিলছে। [ঋ ৮।৯১।৫—ইন্দ্র বিরোহয় শিরঃ ততস্য উর্বরাম্।]

এই জমি সংক্রান্ত মালিকানায় দান বিক্রয়ের অধিকার আছে কিনা প্রমাণ করবার উপায় নেই। তবে পারিবারিক বাস্তুজমি ও চাষের জমি বিষয়ে আন্দাজ করা চলে। বৈদিক পরিবার পিতৃশাসিত বা পেট্রিয়ার্কাল। সেই কারণেই যিনি গৃহপতি, তাঁর দখলেই স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থাকা সম্ভব। পশু হিরণ্য প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তিতে ব্যক্তিস্বত্ব এবং ব্যক্তির তরফে দান-বিক্রয়ের অধিকার বোধ হয় ছিল। এরূপ সম্পত্তির উত্তরাধিকার সঞ্চারিত হত পিতা থেকে পুত্রে। দায়াদ হচ্ছে পুত্রসন্তান, যে দায় বা পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ করে। পিতার রিকৃথ বা দায় তারই প্রাপ্য। পুত্রের আর এক নাম বহ্নি, যেহেতু সে বিবাহিতা বধূকে নিজ আলয়ে নিয়ে যায়। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তার দাবি স্বীকৃত, কিন্তু কন্যাসন্তানের দাবি নেই। বাস্তুভিটায় ও চাষের জমিতে পুত্রের উত্তরাধিকার অনুমেয় হলেও তা ভোগদখলের অতিরিক্ত স্বত্ব সূচিত করে না। [সোমঃ দায়াদঃ উচ্যতে—অথর্ব ৫।১৮।১৪ ; বীরং শতদায়ম্—ঋ ২।৩২।৪ ; ন জাময়ে তান্বঃ রিকৃথম্ আরৈক্—ঋ ৩।৩১।২।]

পিতৃধন স্বাভাবিকভাবে লাভ করে পুত্রেরা এবং কন্যাদের জন্য কোন অংশ নির্দিষ্ট থাকে না। ভ্রাতৃবিহীনা দুহিতা সম্ভবত স্বামীর ঘর করে না, পিতৃগৃহে স্থায়িভাবে বাস করে এবং কখনও কখনও বিপথগামিনী হয়। অপুত্রক পিতা কন্যাকে নিজের কাছে রাখেন এবং দুহিতাজাত নাতিকে প্রাপ্ত হন। এইরূপ বর্ণনায় পুত্রিকাপ্রথার সূচনা দেখা যায়। যাস্ক এই প্রথার উল্লেখ করেছেন। [ঋ ৪।৫।৫—অভ্রাতরঃ ন যোষণঃ ; ঋ ৩।৩১।১—দুহিতুঃ নপ্ত্যংগাৎ ;

ঋ ১।১২৪।৭—অভ্রাতা ইব পুংসঃ এতি; নিরুক্ত ৩।৫।১৫—অভ্রাতৃকায়াঃ উপযমন-প্রতিষেধঃ।]

বৈদিক পরিবার প্রথায় বিশেষভাবে চোখে পড়ে তিনটি জিনিস,—(১) পিতার নামে পুত্রের অথবা স্বামীর নামে স্ত্রীর সামাজিক পরিচয়; (২) পিতৃকেন্দ্রিক বাসস্থান; (৩) পিতৃধারায় উত্তরাধিকার। সমাজে পরিচয় দেওয়ার সময়ে ব্যক্তিগত নামের সঙ্গে গোত্র-নাম বা পৈত্রিক নাম জুড়ে দেওয়া হত। গোত্রকর্তার বা আদিপিতার নাম দ্বারা পরিচয়-রীতির নমুনা হচ্ছে,—ভরতের গোত্রাপত্য ভারত। পিতার নাম দ্বারা পরিচিতির নমুনা,—পুরুকুৎসের পুত্র পৌরুকুৎসি ত্রসদস্যু। আবার, পতির নাম দ্বারা পত্নী পরিচিতা হত। যথা, পুরুকুৎসের স্ত্রী পুরুকুৎসানী। মুদ্গলের স্ত্রী মুদ্গলানী গবিষ্টিতে বা গো অপহরণের ব্যাপারে রথীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। [ঋ ৩।৫৩।১২—ভারতং জনম্; ৭।১৯।৩—পৌরুকুৎসিং; ৪।৪২।৯—পুরুকুৎসানী; ১০।১০২।২—রথীঃ অভূৎ মুদ্গলানী গবিষ্টৌ।]

পিতৃকেন্দ্রিক বাসস্থান বৈদিক পরিবার-প্রথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিবাহিতা বধূ পিত্রালয় ছেড়ে স্বামীর ঘরে যায় এবং সেখানেই তার সন্তানদের লালনপালন হয়। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত অনূঢ়া কন্যা পিতার কাছে থাকে। এ বিষয়ে ঘোষার কাহিনী উল্লেখযোগ্য। [ঋ ১০।৮৫।১২—সূর্যা প্রযতী পতিম্; ঘোষার কাহিনী—ঋ ১।১১৭।৭।]

বৈদিক গৃহস্থালীতে নারী ও পুরুষের শ্রম-বিভাগ ছিল। মায়েরা পুত্রের জন্য বস্ত্র বয়ন করছেন; মাতা জাঁতায় যব পিষছেন; কলসী কাঁখে মেয়েরা জল আনছে;—এ ধরণের বর্ণনা ঋকমন্ত্রে দৃষ্ট হয়। রূপক হিসেবে কল্পিত রাকা দেবীর সূচীসহযোগে সীবনকর্ম থেকে অনুমান করা যায় যে মেয়েরা সূচীশিল্পে অভ্যস্তা ছিল। [ঋ ৫।৪৭।৬—বস্ত্রা পুত্রায় মাতরঃ বয়ন্তি; ৯।১ ২।৩—উপলপ্রক্ষিণী ননা; ১।১৯১।১৪—উদকং কুম্ভিনীঃ ইব; ২।৩২ ৪—সীব্যতু সূচ্যা।]

পারিবারিক মর্যাদার ক্ষেত্রে পুরুষের স্থান উচ্চতর হলেও মেয়েরা ঘরে বন্দিনী হয়ে থাকত না। সভাবতী বিদথ্যা বাক্-এর উল্লেখ থেকে পরোক্ষত প্রতিভাত হয় যে মেয়েরা সভায় যোগদান করত, বিদথে অংশগ্রহণ করত। বিদথ হয়ত যজ্ঞস্থল কিংবা সভাস্থল। (ঋ ১।১৬৭।৩)

সমনেও মেয়েরা যাতায়াত করত। সমন ও সমিতি একজাতীয় শব্দ। সমনের তাৎপর্য জনসঙ্গমের স্থান। তা উৎসবক্ষেত্র হতে পারে, হাট-বাজার জাতীয় পণ্যাবনিময়কেন্দ্র হতে পারে। স্ত্রীলোকের সমনে গমন কথিত হয়েছে,—সমনং ন যোষাঃ। এই সমনের অর্থ কোন মিলনস্থান। (ঋ ১০। ১৬৮।২)

উষস্ দেবী অর্থীদের সমনে যেতে অনুপ্রাণিত করেন। অর্থাৎ, সকাল-বেলায় বেচাকেনার পর্ব যেখানে চলে সেখানে বণিকৃদল ভীড় করে। এরকম স্থানে মেয়েদের গমনাগমন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। (ঋ ১।৪৮।৬)

বিবাহের আসরে মেয়েরা গমন করত। এই বিবাহস্থলকেও বলা হত সমন। [অথর্ব ৬।৬০।২—অগ্রমৎ ইয়ম্ অন্যাসাং সমনং যতী।]

(৩) জ্ঞাতি, সজাত, বন্ধু

বৈদিক পরিবারে জ্ঞাতিচেতনা অত্যন্ত প্রবল। কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রাইবের বাচক হচ্ছে জন। জনের মধ্যে একরক্তের চেতনা ছিল, কিন্তু এই সমশোণিতবোধ প্রমাণের অযোগ্য। জ্ঞাতি বা সজাত বা বন্ধু শব্দ দ্বারা ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী চিহ্নিত হয়, যার ভিতরে শোণিতের ঐক্য বিদ্যমান এবং তা প্রমাণযোগ্য। জ্ঞাতি-গোষ্ঠী বা সজাত-গোষ্ঠী কৌম অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী এবং সম্ভবত এক অঞ্চল-বাসী। ব্যক্তিগত পরিবারগুলি এরূপ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

(১) সংস্কৃত জ্ঞাতি—পিতৃধারার আত্মীয়, agnates ; লিথুয়ানীয় গেন্টিস, gentis—আত্মীয়। ব্যাপক অর্থে জ্ঞাতি হল এক রক্তজাত বা অন্যবিধ আত্মীয়।

(২) সংস্কৃত বন্ধু—পিতৃধারার বা মাতৃধারার আত্মীয়, agnates, cognates ; গ্রীক পেনথেরোস, pentheros—স্ত্রীর পিতা।

(৩) সংস্কৃত ভ্রাতৃ—ভাই। লাতীন ফ্রাটের, frater—ভাই। গ্রীক ফ্রাটের, phrater—জ্ঞাতি। [Burrow, op. cit., pp. 69,168]

একটি সূক্তের বিষয়বস্তু হচ্ছে চৌর্য। চৌর্যের সুবিধার জন্য কামনা করা হয়,—কুকুর ঘুমিয়ে পড়ুক, বিশ্‌পতি ও সকল জ্ঞাতি ঘুমিয়ে পড়ুক। এস্থলে বিশ্ সম্ভবত এক অঞ্চলের অধিবাসীদের বোঝাচ্ছে এবং এই অধিবাসীরা পরস্পরের জ্ঞাতি। [ঋ ৭।৫৫।৫—সস্তু বিশ্‌পতিঃ, সসন্তু সর্বে জ্ঞাতয়ঃ।]

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জ্ঞাতিবৃদ্ধি কাম্য হলেও নববধূর জ্ঞাতিবৃদ্ধি বরের পক্ষে শুভজনক নয়,—এরূপ একটা ধারণা যেন প্রতিপাদিত হয়েছে বিবাহ-সূক্তে। কৃত্যার আক্রমণের ফলে বধূর জ্ঞাতিরা সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বর নানা বন্ধনে বদ্ধ হয়। কৃত্যা হচ্ছে অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত জাদু অনুষ্ঠান। (ঋ ১০।৮৫।২৮—এধন্তে অস্যা জ্ঞাতয়ঃ পতিঃ বন্ধেষু বধ্যতে।)

জ্ঞাতিদের এক অঞ্চলে বসতি অনুমান করা যায়। কিন্তু এর অর্থ যৌথ পরিবার নাও হতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তিগত পরিবার রক্তের বন্ধন-সূত্রে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য এক জায়গায় থাকত, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারও গড়ে উঠেছে। একটি মন্ত্রে প্রার্থনা করা হচ্ছে,—দেবগণ বসু

বা ধন দান করুন, যেমন জ্ঞাতিরা সন্তুষ্ট হয়ে ধন প্রেরণ করে। সকল জ্ঞাতি যদি এক গৃহের বাসিন্দা হয়, তাহলে জ্ঞাতি কর্তৃক ধন প্রেরণের কথা বলা চলে না। (ঋ ১০।৬৬।১৪—প্রীতা ইব জ্ঞাতয়ঃ।)

যারা জ্ঞাতি তারাই সজাত বা একরক্তজাত। রক্তের ধারাটি বিচার করা হয় পিতার দিক থেকে। যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্র দেবতার দৃষ্টান্ত সামনে রেখে সজাত আর্যেরা সমরে প্রবৃত্ত হত। (ঋ ১০।১০৩।৬—ইমং সজাতাঃ অনু বীরয়ধ্বম্ ইন্দ্রম্।)

এক রক্তের বন্ধনে সজাত্য লোকেরা ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্তুতির সাহায্যে নিকটে আহ্বান করে। (ঋ ৮।৮৩।৭—সজাত্যানাম্।)

অশ্বিন্ দেবতাযুগলের সজাত্য বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা একরক্তজাত এবং তাঁদের বন্ধুও অভিন্ন। এই বন্ধু শব্দের তাৎপর্যও খুব সম্ভব পিতৃধারাবিশিষ্ট জ্ঞাতি। ঋগ্বেদীয় দৃষ্টিতে জ্ঞাতি, সজাত ও বন্ধু বোধ হয় একার্থক শব্দ। অথর্বমন্ত্রে রক্ত সম্পর্কের বিবেচনায় পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধু উভয়কেই স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ, বন্ধু বলতে বোঝা যায় পিতৃধারার ও মাতৃধারার আত্মীয়। মিতাক্ষরার রচয়িতা সপিণ্ডের প্রসঙ্গে যে বন্ধুদের কথা বলেছেন তারা হচ্ছে গোত্রসম্পর্কের বহির্ভূত অসগোত্র পর্যায়ের সপিণ্ড, সুতরাং মাতৃ-ধারাকে বা মাতুলগোষ্ঠীকে সূচিত করে। সম্ভবত ঋগ্বেদীয় পর্যায়ে রক্তসম্পর্ক শুধুমাত্র পিতৃধারাকেই চিহ্নিত করত, কিন্তু পরবর্তীকালে মাতৃধারার আত্মীয়ও বিবেচনার মধ্যে আসে। [ঋ ৮।৭৩।১২—সমানং বাং সজাত্যং সমানঃ বন্ধুঃ ; অথর্ব ১২।৫।৪৩—পিতৃবন্ধু মাতৃবন্ধু ; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ২।১৩৫,১৩৬ ; মিতাক্ষরা টীকা—ভিন্নগোত্রাণাং সপিণ্ডানাং বন্ধুশব্দেন গ্রহণাৎ।]

(৪) বিবাহ-সূক্ত

ঋগ্বেদীয় বিবাহ-সূক্তের জুড়ি হল অথর্ববেদীয় বিবাহ-কাণ্ড। বিবাহ-সূক্ত থেকে কয়েকটি বিষয় সূচিত হয়। যথা, স্থায়ী বিবাহ-বন্ধন ; শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সহিত পুত্রবধূর গৃহবাস ; দেবর ননদের সহিত পুত্রবধূর যুক্তসংসার ; তিন প্রজন্ম পর্যন্ত, অর্থাৎ, পিতা, পুত্র, পৌত্র পর্যন্ত সম্পর্কিত যৌথ পরিবার ; বৈবাহিক অনুষ্ঠানে অতিপ্রাকৃত প্রতিবন্ধক শক্তির কল্পনা ; বধূর বস্ত্রে ক্ষতিকারক ম্যানাশক্তি রয়েছে এই ধরণের বিশ্বাস ; ম্যাজিক বিশ্বাস। (ঋ ১০।৮৫ ; অথর্ব ১৪।১,২)

বিভিন্ন মন্ত্রাংশের অনুবাদ থেকে সংযুক্ত গৃহস্থালীতে বধূর স্থান অনুমিত হতে পারে।

গৃহে যেয়ে গৃহপত্নী হও। পারিবারিক সম্মিলনে (বিদথ) তোমার প্রভুত্ব হোক। ঋ ১০।৮৫।২৬।

বধূর প্রতি উক্তি,—তুমি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননদ ও দেবরদের উপর কর্ত্রী হও। ঋ ১০।৮৫।৪৬।

বধূর প্রতি উক্তি,—প্রজাপতি আমাদের সন্তান দিন, দেবতা অর্যমা বার্দ্ধক্যকাল পর্যন্ত আমাদের মিলিত রাখুন, মঙ্গলবতী হয়ে পতিলোকে প্রবেশ কর, পশুসকলের (চতুষ্পদ) এবং ভৃত্যদের (দ্বিপদ) মঙ্গল সাধন কর। ঋ ১০'৮৫।৪৩।

তুমি বীরসূ, অর্থাৎ পুত্রসন্তানপ্রসবিনী হও। ঋ ১০।৮৫।৪৪।

বর-বধূর প্রতি,—এই স্থানেই তোমরা থাক, পরস্পর থেকে যেন বিযুক্ত না হও, পুত্র ও নপ্তাদের সঙ্গে নিজের গৃহে আমোদ কর (মোদমানৌ স্বে গৃহে)। ঋ ১০।৮৫।৪২।

ইন্দ্রের প্রতি,—এই বধূকে সুপুত্রা ও সুভগা কর, এর গর্ভে দশটি পুত্রসন্তান দাও, পতিকে একাদশ ব্যক্তি কর। ঋ ১০ ৮৫।৪৫।

পিতৃতান্ত্রিক গৃহস্থালীতে পুত্রবধূর প্রতিপত্তি কম নয়। পিতৃধারার নিয়ম অনুসারে পুত্রসন্তান অধিকতর কাম্য। পশু-ধন গৃহস্থালীর ঐশ্বর্য সূচিত করে। পত্নী পতিলোকে বা পতিগৃহে অবস্থান করে, অর্থাৎ, পিতৃকেন্দ্রিক বসতি (patrilocy)। ভৃত্যেরা সম্পন্ন সংসারের অংশ।

(৫) বিবাহের প্রকারভেদ

পুরাণ ও মহাভারতের বংশতালিকাগুলিতে বহুলাংশে মিল আছে। এই বংশবিবরণের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বৈদিক আমলের কৌমী ইতিহাস এবং বিভিন্ন কৌমের সংমিশ্রণের কাহিনী। পুরাণে ও মহাভারতে যে জাতীয় যৌন জীবন বর্ণিত হয়েছে তা আংশিকভাবে বৈদিক যুগের উপরে প্রযোজ্য। স্মৃতিগ্রন্থে বিভিন্ন বিবাহ-প্রণালী ও পুত্রের শ্রেণীবিভাগ বিবৃত হয়েছে। এই বিবরণ বোধ হয় অংশত বৈদিক সমাজ বিষয়েও আলোক প্রদান করে, যেহেতু গ্রন্থের রচনাকাল অর্বাচীন হলেও গ্রন্থ-গত বিবরণ প্রাচীনতর কালের আলেখ্য হতে পারে। সমাজের ব্যবস্থাগুলি সেকালে দ্রুত পরিবর্তিত হত না। ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীলতার দরুণ ত্বরিত রূপান্তর স্বাভাবিক ছিল না। এই কারণে মহাভারত ও স্মৃতিগ্রন্থের রচনাকাল বা সংকলনকাল আধুনিকতর হলেও এই সব গ্রন্থে প্রাপ্ত সামাজিক জীবনের কাহিনী প্রাচীনতর কালের, এমন কি বৈদিক আমলের ইতিবৃত্ত হতে পারে।

মহাভারতে একস্ত্রীবিবাহ, বহুস্ত্রীবিবাহ, বহুপতিবিবাহ, নিয়োগ প্রথা সম্বন্ধীয় বিচিত্র বিবরণ সংকলিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের বা বৈদিক যুগের

বিষয়েও এগুলি আলোকপ্রদ এরূপ কল্পনা করতে বাধা নেই। এস্থলে আমরা কয়েকটি মহাভারতীয় নজীর উপস্থাপিত করছি। যথা,—

(১) ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র স্ত্রী গান্ধারী এবং বৈশ্যা উপপত্নী; মহা ১।১১০।১২-১৬ ; ১।১১৫।৪২-৪৩ ;

(২) বিদুরের এক স্ত্রী ; মহা ১।১১৪।১২-১৪ ;

(৩) নলের এক স্ত্রী ; ৩।৫৭।৪১ ;

(৪) সত্যবানের এক স্ত্রী ; ৩।২৯৪।১৬,১৭ ;

(৫) রামের এক বিবাহ ; ৩।২৭৩।৯ ;

(৬) অভিমন্যুর এক বিবাহ ; ৪।৭২।৯ ;

(৭) চ্যবনের একবিবাহ ; ৩।১২২।২৬।

দুই স্ত্রী বিবাহের ঘটনাও মহাভারতে লক্ষিত হয়। যথা, (১) শান্তনুর দুই স্ত্রী; মহা ১।৯৫।৪৭,৫৮। (২) বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী; ১।৯৫।৫১। (৩) পাণ্ডুর দুই স্ত্রী কুন্তী বা পৃথা এবং মাদ্রী ; ১।৯৫।৫৮। (৪) যযাতির দুই স্ত্রী দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা ; ১।৯৫।৭,৮।

মহাভারতে বহু স্ত্রী বিবাহের নিদর্শনও রয়েছে। যথা,—(১) ভীমের বহুভার্যা, হিড়িম্বা, বীর্যশুল্কা অপরা স্ত্রী ; মহা ১।৯৫।৭৭,৮১। (২) অর্জুনের বহুভার্যা, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা ; ১।৯৫।৭৮ ; ১।২১৪।১৮-৩৪ ; ১।২১৫। ১৫-২৬।

বহুপতিবিবাহের তিনটি দৃষ্টান্ত মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে দ্রৌপদী কর্তৃক পঞ্চপাণ্ডবকে বিবাহই যথার্থ বহুপতি বিবাহের নির্ভর-যোগ্য উদাহরণ। (মহা ১।২০০।১)

দ্রৌপদীবিবাহ ব্যতীত জটিলা গৌতমীর সপ্ত ঋষির সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। এ দুটি মানবীয় দৃষ্টান্ত। বাক্ষীর দৃষ্টান্ত একেবারেই মিথলজীর অন্তর্ভুক্ত। (মহা ১।১৯৬।১৪,১৫)

বহুপতিবিবাহের কোন নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যে নেই। দ্বিপতিবিবাহের উদাহরণ সূর্যা-কর্তৃক অশ্বিন্ দেবদ্বয়কে পতিরূপে গ্রহণ। (ঋ ৪।৪৩।৬— পতী ভবথঃ সূর্যায়াঃ।)

বিবাহসূক্তে অশ্বিযুগল সূর্যার বররূপে কথিত হয়েছেন। সূর্যার পতিগৃহে গমনের বর্ণনা পিতৃ-আবাসিক গৃহস্থালীর নজীররূপে মূল্যবান। (ঋ ১০।৮৫।৮ —সূর্যায়াঃ অশ্বিনা বরা ; ১০।৮৫।১০-১৩।)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে বহুপতিবিবাহ আচার-বহির্ভূত ব্যাপার, কিন্তু বহুস্ত্রীবিবাহ বৈধ রীতি-রূপে গণ্য। রাজা হরিশ্চন্দ্রের শত জায়া ছিল। পুত্র লাভ না করায় তাঁর দুঃখের অবধি ছিল না। এই প্রসঙ্গে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার

বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে পুত্রের গরিমা কীর্তনে। (ঐ ব্রা ৩।২।১২ ; ৭।৩।১)

ঋগ্বেদীয় কাহিনীতে দেখা যায় যে কণ্ববংশীয় সোভরি ত্রসদস্যুর ৫০টি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। (ঋ ৮।১৯।৩৬)

শতপথ ব্রাহ্মণের বর্ণনা অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজার চারিটি স্ত্রী অংশ গ্রহণ করে। এই চারি পত্নী হচ্ছে মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা এবং পালাগলী। মহিষী প্রথম পরিণীতা প্রধানা পত্নী। বাবাতা প্রিয়তমা পত্নী। পরিবৃক্তা অনাদৃতা পত্নী। পালাগলী দূতপুত্রী, মর্যাদাহীনা চতুর্থ পত্নী। এদের সঙ্গে যাজকদের অশ্লীল কথোপকথন যজ্ঞের একটি অঙ্গ এবং উর্বরতামূলক জাদু অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বহন করে। (শ ব্রা ১৩।৪।১।১-৮ ; ১৩।৫।২।৫-৮)

বৈদিক সমাজের অভিজাত মহলে সম্ভবত বহুস্ত্রীবিবাহের দিকে প্রবণতা ছিল। সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে একবিবাহের রীতি অনুসৃত হত। মহাভারতীয় দৃষ্টান্তগুলি যদি বৈদিক দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হয়, তাহলে বলা যায় যে বৈদিক সমাজে পাশাপাশি একবিবাহরীতি, বহুস্ত্রীবিবাহরীতি ও বহুপতি-বিবাহরীতি বিরাজ করত।

(৬) যম ও যমীর কাহিনী

ঋগ্বেদীয় যম ও যমীর কাহিনী থেকে অনেকে প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন যে বৈদিক সমাজে অভিজাতদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাই-বোনের বিবাহ এক কালে সমর্থিত হত রক্তগত বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য। মিশরীয় রাজবংশে এই ধরণের ভাই-বোনের বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই রীতি থেকে মর্গান-কথিত পারিবারিক পর্যায় consanguine family বা যৌথ-যৌনতা-মূলক একরক্তের পরিবার আন্দাজ করা যায় না, যেহেতু বৈদিক বা এপিক দৃষ্টান্তগুলিতে যৌথ যৌনতার বা যৌন সাম্যবাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যমীর উক্তিগুলিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলেও এক পতির এক পত্নী-সূচক বিবাহের নিদর্শন প্রতিপাদিত হয়। [Ancient Society, L. H. Morgan, 1958, p. 27]

বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের মতে যমী স্বীয় সহোদর ভ্রাতা যমের নিকটে মৈথুন প্রার্থিনী হয়েছিলেন। তিনি যমের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হন। যমীর বচনে প্রতিপন্ন হয় দেব-সমাজে ভাই বোনের বিবাহের অনুমোদন। যমের উক্তিতে বোঝা যায় যে এই জাতীয় সম্পর্ক ধীরে ধীরে অপ্রচলিত হয়ে এসেছে। (ঋ ১০।১০।৩, ৪ ; বৃহদ্দেবতা ৬।১৫৪)

যম-যমী কাহিনীর সূত্রটি ইন্দোইরাণীয় আমল পর্যন্ত প্রসারিত। ইরাণীয় জনশ্রুতিতে যিম এবং তাঁর ভগিনী যিমেহ্‌ মানবজাতির আদি জনক-জননী।

[Yima এবং Yimeh প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য, p. 173, Vedic Mythology, A. A. Macdonell, 1897.]

একটা বিষয় এস্থলে বিবেচ্য। প্রাচীন কালে ইরাণীয়দের মধ্যে জ্ঞাতি সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ চলতী ছিল। এই প্রথার নাম ছিল খে্বত্বদথা (khvetvadatha) বিবাহরীতি। এই রীতি সহোদরাকে বিবাহরূপেও গণ্য হয়েছে। অর্থাৎ, খে্বত্বদথা হচ্ছে রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ। এই প্রথার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। [Vide A brief sketch of the Zoroastrian Religion and Customs, E. S. Dadabhai Bharucha, 1928, p. 72 ; Selections from Avesta and Old Persian, I. J. S. Taraporewala, 1922, p. 138.]

ইরাণীয় প্রথা থেকে প্রতীত হয় যে এক কালে আর্য সমাজে নিকট রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ সমর্থন লাভ করত আভিজাত্য রক্ষার জন্য। ঋগ্বেদীয় যম-যমী-সংবাদে আদিকালে প্রচলিত রীতিটির বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ভাই-বোনের বিবাহ সম্বন্ধে আরও কিংবদন্তী রয়েছে। দশরথ-জাতকে রাম নিজের ভগিনী সীতাকে অগ্রমহিষীরূপে বরণ করছেন। এই কাহিনী নির্ভরযোগ্য নয়, যেহেতু এর সঙ্গে বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণে প্রদত্ত বিবরণের কোন মিল নাই। উদয়-জাতকে বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহের একটি কাহিনী উক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ জনশ্রুতি অনুসারে ইক্ষাকু-বংশীয়দের মধ্যে ভাই-বোনের বিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় পরিণয় থেকে শাক্যগণের উৎপত্তি হয়েছিল। এই ধরণের কাহিনীগুলি ঐতিহাসিক নজীর-রূপে বিবেচ্য নয়। এগুলির মধ্যে শুধু প্রাচীন প্রথার বিষয়ে সামান্য আভাস মেলে। সম্ভবত অভিজাত বা রাজকীয় পরিবারগুলিতে শোণিত-বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য এক কালে ভাই-বোনের বিবাহ সমর্থন পেত। কিন্তু ব্যাপকভাবে এই রীতির প্রচলন ছিল এমন কথা বলা যায় না। [Some Ksatriya Tribes of Ancient India. B. C. Law, 1924, p. 173.]

(৭) প্রজাপতির কাহিনী

পিতা ও কন্যার যৌন সম্পর্ক বিষয়ে একটি জনশ্রুতি বৈদিক আমলে এবং পরবর্তী কালেও প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে এই জনশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে। [ঋ ১০ ৬১।৭]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও শতপথ ব্রাহ্মণে আখ্যায়িকাটি স্পষ্টতা লাভ করেছে। প্রজাপতির কন্যা দিব্ বা উষস্। তিনি স্বীয় কন্যার সঙ্গে মৈথুনের ফলে দেবতাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি ভূতবান্ বাণ নিক্ষেপ

করেছিলেন। দেবতারা বলছেন যে কেউ যা করেনি তাই প্রজাপতির দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। [ঐ ব্রা ৩।৩।৯ ; শ ব্রা ১।৭।৪।১-৩ ; প ব্রা ৮।২।১০]

পুরাণের বিবরণে প্রজাপতির উক্ত ভূমিকাটি গ্রহণ করেছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার দুহিতা বাক্ বা সাবিত্রী। উভয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক বর্ণনার বিষয়। মৃগ-রূপী ব্রহ্মা মৃগী-রূপিণী কন্যার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছেন। [ব্রহ্মপুরাণ ১০২'৪,৫ ; ভাগবত, বহরমপুর সংস্করণ, ৩।১২।১৫]

ঈদৃশ আখ্যানের মধ্যে মিথলজীর দৃষ্টিকোণ লক্ষণীয়। প্রজাপতি হচ্ছেন প্রথম পেট্রিয়ার্ক বা আদি পিতা। তাঁর কন্যাসঙ্গম থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। আদি সৃষ্টিকর্মের জন্য এই সম্পর্কের আবশ্যকতা কল্পিত হয়েছে। এই কল্পনা সৃষ্টিতত্ত্বের যুক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এর মূলে সামাজিক বাস্তবতা বিবেচ্য হয়নি। আক্ষরিক অর্থে কাহিনীটি গৃহীত হলে এর ভিতরে প্রচলিত নিষেধের লংঘন প্রতিভাত। কাহিনীর অপর তাৎপর্য পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক গঠন।

পূষন্ দেবতার কাহিনীটিও এস্থলে বিচার্য। ঋক্‌মন্ত্র অনুসারে তিনি মাতার দিধিষু এবং ভগিনীর জার। অর্থাৎ, মাতা ও ভগিনীর সঙ্গে তাঁর যৌন সম্পর্ক বর্তমান। বিবাহ-সূক্ত অনুযায়ী পূষা অশ্বিদ্বয়কে পিতারূপে বরণ করেছেন এবং সূর্যার পতি এই অশ্বিদ্বয়। অর্থাৎ, সূর্যাকে পূষার কৃত্রিম জননী বলা চলে। তাঁর সঙ্গেই সম্ভবত পূষার অবৈধ সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়েছে। একমাত্র উষস্ দেবীর জার বিষয়ে মন্ত্র দৃষ্ট হয়। উষস্ দেবীকে বলা হয়েছে সূর্যের যোষা এবং জারের যোষা। উভয় বিশেষণকে মিলিয়ে দেখলে প্রতিভাত হয় যে সূর্য হচ্ছেন উষাদেবীর জার বা প্রেমিক। পূষা সূর্যের একটি রূপ মাত্র। এই দিক দিয়ে বিচার করলে পূষাকে যখন ভগিনীর জার বলা হয়, তখন উষার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বোধ হয় ধর্তব্য। [ঋ ৬।৫৫'৫ ; ১০।৮৫ ১৪ ; ৭।৭৫।৫ —সূর্যস্য যোষা উষাঃ , ১।৯২।১১—যোষা জারস্য।]

পূষার কাহিনীতে মিথলজীর মাত্রা কিছু বেশি। সূর্যের দুহিতা সূর্যা। আবার সেই সূর্যাই পূষার জননী এবং পূষা সূর্যের রূপবিশেষ। এই প্রকার দৈব পটভূমি থেকে সামাজিক ব্যবস্থা উদ্ধার করা কঠিন।

(৮) অবৈধ যৌনতা ও গণিকাবৃত্তি

বিবাহিত জীবনে স্খলন, পতন, ব্যতিক্রম ঋগ্বেদের আমলেও ছিল। প্রাক্-বিবাহ স্বেচ্ছাচার ও বিবাহোত্তর ব্যভিচার ছিল। আবার একথাও সত্য যে, দাম্পত্য জীবন সহজে বিচ্ছিন্ন হত না। আসঙ্গ রাজার পুরুষত্বহানি ঘটলেও তাঁর স্ত্রী শশ্বতী বিবাহভঙ্গের প্রস্তাব দেননি।

বৈদিক যুগে পারিবারিক কল্যাণের জন্য অবৈধ প্রেমের কথা স্বীকার

করতে হত বরুণ-প্রঘাস নামক যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে। বৈদিক যাগযজ্ঞ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। যথা, হবির্যজ্ঞ এবং সোমযাগ। হবির্যজ্ঞের প্রকারবিশেষ চাতুর্মাস্য নামক অনুষ্ঠানগুলি। চাতুর্মাস্য চার মাসে অনুষ্ঠিত হত। বরুণ-প্রঘাস হচ্ছে একজাতীয় চাতুর্মাস্য। এই যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে এক অদ্ভুত ধরণের বিধান ছিল। যজমানের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করা হত তার কোন উপপতি (জার) আছে কিনা। পরিবারের মঙ্গলের জন্য উপপতিকে নির্দেশ করতে হত। যজমান-পত্নী তৃণের সংখ্যার দ্বারা উপপতির সংখ্যা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিত। এর উদ্দেশ্য স্বকীয় যৌন বিচ্যুতি বিষয়ে স্বীকৃতি। স্বীকৃতির দ্বারা নৈতিক প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হত। [তৈ ব্রা ১।৬।৫; কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র ৫।৫।১-৮; Vedic India, L. Renou, tr., 1957, p. 103.]

উক্ত অনুষ্ঠানের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য পরিষ্কার। সামাজিক বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে এই ধরণের প্রায়শ্চিত্ত বিধান সম্ভব। বিবাহিতার পক্ষে প্রেমিকের সঙ্গ বৈদিক সমাজে নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু নিন্দনীয় কর্মে অনেকে লিপ্ত হত। তারা প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হত। দাম্পত্য জীবনে শৃংখলাবোধ ছিল, আবার অবৈধ প্রেমের ব্যাপারও ছিল। ঈদৃশ নৈতিক আবহাওয়া উন্নততর সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব হতে পারে।

ঋক্‌মন্ত্রে জার ও জারিণী উল্লিখিত হয়েছে। জার হচ্ছে উপপতি বা অবৈধ প্রেমিক। জারিণী উপপত্নী। সাধারণী নামধেয়া স্ত্রীলোক সম্ভবত গণিকা। গণিকার বা স্বেচ্ছাচারিণীর অন্য নাম মহানগ্নী, পুংশ্চলী, পুংশ্চলূ।

জার, ঋ ৬।৫৫।৫।

জারিণী, ঋ ১০।৩৪।৫।

উপপতি, বা সং ৩০।৯।

দিধিষু, অবৈধ প্রেমে লিপ্ত, ঋ ৬।৫৫।৫।

সাধারণী, বারাঙ্গনা, ঋ ১।১৬৭।৪।

মহানগ্নী, গণিকা, অথর্ব ২০।১৩৬।৯।

পুংশ্চলী, গণিকা, অথর্ব ১৫।২।৫।

পুংশ্চলূ, গণিকা, তৈ ব্রা ৩।৪।১।

সত্যকামের কাহিনীতে বিবাহ-বিহীন যৌন সম্পর্কের উদাহরণ মেলে। তাঁর জননী জবালা বলছেন যে সত্যকামের কোন গোত্রপরিচয় নেই, যেহেতু পরিচর্যার ভিতর দিয়ে তাঁর জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর জনক পিতাকে সনাক্ত করা সম্ভব নয় এবং তাঁর সামাজিক পিতাও নেই। [ছা উপ ৪।৪।১-২]

(৯) নিয়োগ-বিধি

প্রাচীন ভারতে নিয়োগ প্রথার প্রচলন বিষয়ে নজীরের অভাব নেই।

ঋগ্বেদে এই প্রথার বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি রয়েছে। নিয়োগ প্রথাকে দেবর-বিবাহের (levirate) সঙ্গে যুক্ত করা হয়। দেবর-বিবাহের কোন দৃষ্টান্ত বৈদিক সাহিত্যে বা মহাভারতে নেই। মহাভারতীয় নজীরগুলি নিয়োগ প্রথার। অম্বিকা, অম্বালিকা, কুন্তী, মাদ্রী প্রভৃতি নিয়োগ রীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। বিধবাতে দেবর নিয়োগের দৃষ্টান্ত অম্বিকার এবং অম্বালিকার সঙ্গে ব্যাসের সংসর্গ। দেবর-শব্দের অর্থ স্বামীর জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (মনু ৯।৫৯-৬২)

সংস্কৃত দেবৃ ; গ্রীক ডায়ের, daer ; লাতীন লেভির, levir। লেভির-শব্দ থেকে লেভিরেট কথাটি তৈরী করা হয়েছে বিধবার সহিত স্বামীর ভ্রাতার বিবাহের অর্থ বোঝাতে। প্রাচীন য়িহুদীদের মধ্যে লেভিরেট প্রচলিত ছিল। (Comparative Philology, P. D. Gune, 1962, p. 135)

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বিধবা ভ্রাতৃজায়ার সহিত দেবরের সহবাস বিষয়ে ইঙ্গিত আছে। সায়ণ এই জাতীয় তাৎপর্যই গ্রহণ করেছেন। নিরুক্ত গ্রন্থেও এই তাৎপর্য স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে নিরুক্ত গ্রন্থে একটি বচন প্রক্ষিপ্ত হয়েছে : বচনটি হচ্ছে,—দেবরঃ কস্মাৎ দ্বিতীয়ঃ বরঃ উচ্যতে। অর্থাৎ, দেবর হচ্ছে দ্বিতীয় বর। প্রসঙ্গ বিচারে ধরা পড়ে যে বচনটি মূলানুগ নয়। এই বচনটিকে বাদ দিয়ে ধরলেও নিরুক্ত গ্রন্থে নিয়োগ প্রথার তাৎপর্য বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। দুর্গাচার্য, রাজওয়াডে, লক্ষ্মণ সরূপ, অমরেশ্বর ঠাকুর প্রভৃতি এই তাৎপর্যই গ্রহণ করেছেন। (ঋ ১০।৪০ ২ -- বিধবা ইব দেবরং ; নিরুক্ত ৩।১৫ — কো বাং শয়নে বিধবা ইব দেবরং... আকুরুতে সহস্থানে ; The Nighantu and the Nirukta, tr. by L. Sarup, 1921, p. 48.)

অন্য একটি ঋক্‌মন্ত্রেও নিয়োগ রীতির অস্পষ্ট আভাস রয়েছে। এই মন্ত্রে মৃত স্বামীর সমীপে শয়ান স্ত্রীকে উঠে আসবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র অনুসারে বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে আহ্বান করবে দেবর। এই দেবর হচ্ছে পতিস্থানীয়। এস্থলে দেবরের সঙ্গে নূতন যৌন সম্পর্ক আন্দাজ করা অন্যায় নয়। (ঋ১০।১৮।৮ — উদীর্ষ্ব নারি অভি জীবলোকং ; আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৪।২ — তাম্ উত্থাপয়েৎ দেবরঃ পতিস্থানীয়ঃ।)

অথর্বমন্ত্রে বধূকে বলা হয়েছে বীরসূ বা পুত্রপ্রসবিনী এবং দেবৃকামা বা দেবরের সঙ্গ ইচ্ছুক। (অথর্ব ১৪।২।১৮)

দেবর-বিবাহ ও নিয়োগ বিধির মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। বিবাহ স্থায়ী যৌন সম্পর্ক। কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে পুত্র উৎপাদনের জন্য অস্থায়ী যৌন সম্পর্ক। কিংবদন্তী অনুসারে নিয়োগ রীতি ইন্দো-ইউরোপীয় আমল পর্যন্ত প্রসারিত। ইন্দো-ইউরোপীয়রা পুত্রার্থে নিয়োগের আশ্রয় নিত। প্রাচীন ভারতে, গ্রীস-

দেশে, ইতালীতে, জার্মানীতে, স্কান্ডিনাভিয়ায় নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল। (Gune, op. cit., pp. 135-136 ; Sarup, op. cit. , p. 48, fn.)

একটি মত অনুসারে নিয়োগ প্রথার মূলে ছিল দেবর-বিবাহ এবং দেবর-বিবাহের মূলে ছিল ভ্রাতৃমূলক বহুপতিবিবাহ, যার নিদর্শন দ্রৌপদী-বিবাহ। প্রাচীনতর আমলে কয়েক ভাই একটি স্ত্রীকে বিবাহ করত, কিন্তু ধীরে ধীরে বহুপতিবিবাহের বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তী আচারে বিধবা ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে দেবরের পরিণয় অনুমোদন পায়। এই প্রথাও কালে কালে অপ্রচলিত হতে থাকে এবং এরই লুপ্তাবশেষ নিয়োগ-বিধি। পিতৃকেন্দ্রিক বাসস্থানের নিয়ম অনুসারে পত্নী পতির পরিবারে স্থায়ী সভ্যারূপে বিবেচিতা ছিল। স্বামীর মৃত্যুতেও এই পারিবারিক সম্বন্ধ নষ্ট হতে পারে না। পতিগৃহে বাসের নিয়ম অলংঘনীয় এবং এই কারণেই বিধবার পুনর্বিবাহ কুলের মধ্যেই হত। পুনর্বিবাহের স্বামী হত দেবর। নিয়োগ প্রথাতে বিধবার সঙ্গে দেবরের সাময়িক যৌন সম্পর্ক বিহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে চিন্তনীয় যে প্রাচীন আর্যদের মধ্যে বহুপতিবিবাহ ব্যাপকভাবে আচরিত রীতি ছিল না এবং দেবর-বিবাহের সীমিত প্রচলনই অনুমেয়। নিয়োগ প্রথার মূলে পুত্রকামনাই প্রধানত বিবেচনীয়। (Some Aspects of the Earliest Social History of India, S. C. Sarkar, 1928, p. 78 ; Hindu Law and Custom, J. Jolly, tr., 1928, pp. 103-104.)

এস্থলে উল্লেখ করা যায় যে প্রাচীন কালে আরবীয়দের মধ্যে নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল। কোন গোষ্ঠীপ্রধানের দ্বারা নিজের জায়াতে সন্তান উৎপাদন কাম্য ছিল। এর উদ্দেশ্য সুসন্তান লাভ। (Outlines of Muhammadan Law, A. A. A. Fyzee, 1955, p. 8)

তৃতীয় প্রকরণ ঃ

আর্য সমাজে বিবাহ প্রথা

(১) অষ্টবিধ বিবাহের ক্রমিক স্থান

বিষ্ণুস্মৃতিতে প্রদত্ত তালিকায় অষ্টবিধ বিবাহের ক্রমিক স্থান এইরূপ।

(১) ব্রাহ্ম বিবাহ—আহ্বান পূর্ব্বক গুণবানকে কন্যাদান।

(২) দৈব বিবাহ -ঋত্বিক্‌কে (যজ্ঞের যাজককে) দক্ষিণারূপে কন্যাদান।

(৩) আর্ষ বিবাহ—বরপক্ষের কাছ থেকে একটি ষাঁড় ও একটি গাভী নিয়ে কন্যাদান।

(৪) প্রাজাপত্য বিবাহ--বরপক্ষের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে কন্যাদান।

(৫) গান্ধর্ব বিবাহ—বরকন্যার পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ।

(৬) আসুর বিবাহ—বরপক্ষের দ্বারা শুল্কের বিনিময়ে কন্যাক্রয়। (bride purchase)।

(৭) রাক্ষস বিবাহ—বল প্রয়োগ দ্বারা কন্যা হরণ।

(৮) পৈশাচ বিবাহ—সুপ্তা বা মত্তা কন্যার কৌমার্য নাশ পূর্বক বিবাহ। (বিষ্ণুসং ২৪।১৮-২৬)

স্মার্ত মতে ক্ষত্রিয়ের তরফে গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ অবৈধ নয়। বৈশ্যের পক্ষে আসুর বিবাহ অবৈধ নয়। তবে পৈশাচ ও আসুর নিন্দিত বিবাহ। (মনু ৩।২৪-২৬)

আসুর রীতির দৃষ্টান্ত মাদ্রীর বিবাহ। (মহা ১।১১৩।১-১৮)।

গান্ধর্ব রীতির দৃষ্টান্ত শকুন্তলার বিবাহ। (মহা ১।৭৩।৪-২০)

রাক্ষস বিবাহের দৃষ্টান্ত সুভদ্রার বিবাহ। (মহা ১।২২০।১-৭)।

প্রতিলোমের দৃষ্টান্ত যযাতি ও দেবযানীর বিবাহ। (১।৮১।৩২-৩৭)।

অনুলোমের দৃষ্টান্ত চ্যবন ও সুকন্যার বিবাহ। (৩।১২২।২৬-২৮)।

এই দৃষ্টান্তগুলি মহাভারতীয়। সেকালে স্বয়ম্বর প্রথাও ছিল, বীর্যশুল্কাও ছিল। সীতা ও দ্রৌপদী বীর্যশুল্কার দৃষ্টান্ত। কুন্তীর স্বয়ংবর হয়েছিল। (মহা ১।১১২।৩-১১)।

বিবাহ ব্যতিরেকে সাময়িক যৌন সম্পর্কের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ—

(১) অর্জুন ও নাগকন্যা উলূপীর যৌন সংসর্গ। এরূপ সংসর্গে উলূপীই ছিল অগ্রণী। —মহা ১।২১৪।১৮-৩৪।

(২) বিশ্বামিত্র ও মেনকার সংসর্গের দ্বারা শকুন্তলার উৎপত্তি।

মহা—১।৭২।১-৯।

(৩) শরদ্বান্‌-এর ঔরসে (অপ্সরার সংসর্গে ?) কৃপ ও কৃপীর জন্ম। — মহা ১।১৩০।১-২০।

(৪) ভরদ্বাজের ঔরসে (অপ্সরার সংসর্গে ?) দ্রোণের জন্ম।

—মহা ১।১৩০।৩৩-৩৮।

(৫) ব্যাসের ঔরসে (অপ্সরার সংসর্গে ?) শুকদেবের জন্ম।

—মহা ১২।৩২৪।১-৯।

উক্ত জন্মবৃত্তান্তগুলি মিথলজীর অন্তর্গত হলেও এগুলিতে বিবাহ-বিহীন সাময়িক যুগ্ম পরিবারের (pairing family) আভাস মেলে। ইতিকথা অনুযায়ী যে সময়ে অপ্সরা-সংসর্গগুলি ঘটছে, সে সময়ে সামাজিক বিবাহও চলতো এবং এক্ষেত্রে বিবাহ-বিহীন কোন সামাজিক অবস্থাও অনুমেয় নয়।

(২) সতীত্বের উৎপত্তি-কাহিনী

মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলি থেকে কোন বিবাহ-বিহীন সামাজিক স্তর অনুমান করা যায় না। নিয়োগ প্রথার প্রসঙ্গে ভীষ্ম-সত্যবতী-সংবাদ এবং পাণ্ডু-কুন্তী-সংবাদ মহাভারতে বিবৃত হয়েছে। প্রথম কথোপকথন থেকে দীর্ঘতমার উক্তিতে এবং দ্বিতীয় কথোপকথন থেকে শ্বেতকেতুর উক্তিতে পত্নীর তরফে একনিষ্ঠতা (সতীত্বের আদর্শ) নিয়মবদ্ধ হওয়ার জনশ্রুতি জানতে পারা যায়। সতীত্বের আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা দীর্ঘতমা নিজেই নিয়োগ-প্রথায় পর-পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করেছেন। এর তাৎপর্য এই যে নিয়োগ প্রথার দ্বারা সতীত্ব ক্ষুন্ন হয় না। শ্বেতকেতু উদ্দালকের ক্ষেত্রজ পুত্র। তিনি নিজ জননীর উপর পর পুরুষের আচরণ দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে সতীত্বের নীতি ঘোষণা করেছেন। উত্তরকুরুর দৃষ্টান্তে উপলব্ধি হয় যে পতি ব্যতীত পর-পুরুষের সংসর্গ স্ত্রীর তরফে অপরাধ নয়,এর অর্থ এই নয় যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক-যুক্ত ব্যবস্থাই নেই। Individual marriage without exclusive cohabitation বা শিথিল যৌনতা-যুক্ত ব্যক্তিগত বিবাহের আলেখ্য এস্থলে ফুটে উঠছে। উদ্দালকের সামাজিক পিতৃত্ব দ্বারা শ্বেতকেতু পরিচিত হয়েছেন। পত্নীর অসংযমে উদ্দালকের পারিবারিক জীবন বিঘ্নিত নয়। সুতরাং এ জাতীয় দৃষ্টান্তে promiscuity বা অবাধ যৌনতার স্তর আন্দাজ করা অসমীচীন। (মহা ১।১০৪ ; ১।১২২ ; ১২।৩৪।২২)

অর্জুন পার্বত্য অঞ্চলে উৎসব-সংকেত নামক গণের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এই গণের সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ মন্তব্য করেছেন যে এদের মধ্যে দাম্পত্য-ব্যবস্থা নেই, নর-নারীর স্বাধীন রতি প্রচলিত। (মহা ২।২৭।১৬)

নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যায় সূচিত হয় যে পার্বত্য অঞ্চলে যৌন সম্পর্ক শিথিল ছিল। ঈদৃশ শিথিল যৌনতা থেকে ব্যাখ্যাকার দাম্পত্যবিহীন অবস্থাই ধরে নিয়েছেন। হিমালয়ের কৌমগুলিতে বর্তমানে বহুক্ষেত্রে বহুপতিবিবাহ ও যৌন স্বেচ্ছাচার দৃষ্ট হয়, আবার একবিবাহ ও বহুস্ত্রীবিবাহও দেখা যায়; কোন

ক্ষেত্রেই পরিবারবিহীন সামাজিক ব্যবস্থার বিবরণ মেলে না। ব্যভিচার বা যৌন স্বেচ্ছাচার দেখেই বিবাহ-বিহীন বা পরিবার-বিহীন অবস্থা অনুমানের কোন ভিত্তি নেই।

সভাপর্বে সহদেবের দিগ্বিজয় বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মাহিষ্মতী পুরীর মহিলাদের স্বাধীন চাল চলনও উল্লিখিত হয়েছে। এই পুরীর যোষিৎরা স্বাধীন ইচ্ছায় কোন বাধা মানে না। এরা স্বৈরিণী, অর্থাৎ, যথেষ্ট বিচরণ-শীলা। এই বর্ণনাতেও যৌন স্বাধীনতার আভাস আছে, কিন্তু বিবাহ-বিহীন অবস্থার কোন ব্যঞ্জনা নেই। (মহা ২।৩১।৩৭-৩৮)

কর্ণপর্বের কর্ণ-শল্য-সংবাদ থেকে বাহীকদের আচার আচরণের পরিচয় মিলছে। এদের ভিতরে স্ত্রীলোকরা আসব পান করে, গোমাংস, লশুন ও অপূপ ভক্ষণ করে। এই নারীরা শীলবর্জিতা। এরা বিবস্ত্রা হয়ে মাতাল অবস্থায় হাসে, নাচে, গান গায়। এরা মৈথুনে অনাবৃতা এবং কামচারা। এরা পর্বে, অর্থাৎ উৎসবে অসংযত। এস্থলে বাহীক মেয়েদের উৎসব-কালীন স্বেচ্ছাচার বর্ণিতব্য বিষয়। এদের স্বামী-ভর্তারও উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বিবাহ-বিহীন অবস্থা অনুমেয় নয়। (মহা ৮।৪৪।৫-১৪)

(৩) অভিভাবক-সম্পাদিত ও অন্যবিধ বিবাহ

স্মৃতি শাস্ত্রে আটপ্রকার বিবাহ উল্লিখিত হয়েছে। অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য ধর্ম্য-বিবাহ-রূপে গণ্য। বাকী চার প্রকার বিবাহ হচ্ছে গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ। (বিষ্ণু সং ২৪।২৭)

প্রথম চার প্রকার বিবাহ এবং আসুর বিবাহ অভিভাবক-পরিচালিত। গান্ধর্ব বিবাহ বা Love-marriage বর-কন্যার পারস্পরিক ইচ্ছা-জাত বিবাহ। সেকালে একজাতীয় বিবাহ ঘটত, যা নারী হরণের (abduction) নামান্তর। এর নাম ছিল রাক্ষসবিবাহ। এরই একটা রূপ ছিল পৈশাচ বিবাহ। একালেও নারী হরণ ঘটতে দেখা যায়, তবে তা স্থায়ী বিবাহের রূপ নেয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে অপহৃতা নারী হরণকারীর উপপত্নীর স্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

বহুল প্রচলনের দিক দিয়ে সেকালের চার প্রকার বিবাহই উল্লেখ্য। যথা,—(১) ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহ, অর্থাৎ, অভিভাবক-কর্তৃক কন্যাদান। কন্যা ব্যক্তিগত সম্পত্তির (private property) সঙ্গে তুলনীয়, তাই দানের প্রশ্ন। (২) আসুর বিবাহ, অর্থাৎ, বরপক্ষের তরফে কন্যাক্রয় (marriage by purchase), কন্যাপক্ষের তরফে শুল্ক নিয়ে কন্যাবিক্রয়। (৩) গান্ধর্ব বিবাহ বা প্রেম-মূলক বিবাহ।

উক্ত চার প্রকার বিবাহ দুই শ্রেণী-ভুক্ত। যথা,

(১) অভিভাবক-সম্পাদিত বিবাহ ;

(২) প্রেম-মূলক বিবাহ (love marriage)।

সমসাময়িক সমাজেও এই দুরকম বিবাহ চলতী। প্রথমটিতে যৌন স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিতীয়টিতে যৌন স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। যেক্ষেত্রে অভিভাবকেরা বিবাহের ব্যবস্থা করেন, বর্তমানে সে ক্ষেত্রে বরপণ দিতে হয় কন্যাপক্ষের তরফ থেকে। প্রেম-মূলক বিবাহে পণের প্রসঙ্গ অবান্তর।

মনু কন্যাবিক্রয়কে নিন্দা করেছেন। বিশেষ ক্ষেত্রে স্বয়ম্বরা প্রথাকে সমর্থন করেছেন। সম্ভবত এটা হচ্ছে গান্ধর্ব প্রথার শর্তাধীন অনুমোদন। তাঁর মতে ঋতুমতী হওয়ার পরে কন্যা তিন বছর অপেক্ষা করবে, তারপর নিজেই বর নির্বাচন করবে। বাৎস্যায়ন গান্ধর্ব বিবাহকে সমর্থন জানিয়েছেন। (মনু ৩।৫১ ; ৯।৯০-৯২ ; কামসূত্র ৩।৫।১৮,৩০)

(৪) অসগোত্র বিবাহ বিধি

বৈদিক আমলে এক গোত্রের মধ্যে বিবাহ সমর্থিত হত না। গোত্রের বাইরে বিবাহ হত। সমাজবিজ্ঞানে এই প্রথার নাম exogamy বা বহির্বিবাহ। প্রকৃত বা কল্পিত সমশোণিত-বোধ থেকে এই প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। এক গোত্রের বা ক্ল্যানের লোক মানে এক রক্তের লোক। এক রক্তের ছেলে মেয়ের বিবাহ অসমীচীন,—এইরূপ ধারণাই সগোত্র বিবাহ নিষেধের মূলে ছিল। ন সগোত্রাং ন সমানার্ষপ্রবরাং ভার্যাং বিন্দেত। (বিষ্ণু সং ২৪।৯)

বৈদিক যুগের অবসানে গোত্র-সংগঠন ভেঙ্গে যেতে থাকে। গোত্রের মধ্যে অনার্য লোকের প্রবেশ ঘটে। কৃত্রিম গোত্র-পরিচয় দেখা দিতে থাকে। যার কোন গোত্র-পরিচয় নেই, তার উপর কাশ্যপ বা আঞ্চলিক গোত্র আরোপের রীতি প্রচলিত হয়। Adoption বা কৃত্রিম পুত্র গ্রহণ-রীতির দ্বারা রক্ত-বিশুদ্ধি ব্যাহত হতে থাকে। কৃত্রিম (adopted) পুত্রের তালিকায় ছিল—(১) ক্রীত পুত্র ; (২) স্বয়ম্ উপাগত পুত্র, যে নিজেই কোন ব্যক্তিকে পিতারূপে বরণ করে ও তার পুত্ররূপে গণ্য হয় ; (৩) অপবিদ্ধ পুত্র, পিতামাতার দ্বারা পরিত্যক্ত এবং অপরের দ্বারা গৃহীত ; (৪) দত্তক পুত্র, পিতামাতা কর্তৃক অপরকে প্রদত্ত। (বসিষ্ঠ সংহিতা ১৭ অ)

গোত্রের ভিতরে ভিন্নরক্তের লোক প্রচুর সংখ্যায় গৃহীত হওয়ার ফলে গোত্র-সংগঠনের অন্তর্বর্তী kinship বা রক্তগত আত্মীয়তা নিছক কৃত্রিম বিশ্বাসের বিষয় হয়ে ওঠে।

এই কৃত্রিম গোত্র-পরিচয়-রীতিই টিকে থাকে। কৃত্রিম গোত্রও বিবাহের ক্ষেত্রে বিচার্য হয়। পরবর্তীকালে কৃত্রিম গোত্র-পরিচয়ের অভিন্নতা ছেলে মেয়ের বিবাহে বাধা সৃষ্টি করেছে।

সগোত্রা রমণীর সঙ্গ ব্যভিচারের সামিল। তার প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত।

(প্রবর প্রশ্ন ১০।৩৪ ; গোত্র-প্রবর-নিবন্ধ-কদম্বম্, গোত্র প্রবর-নির্ণয়, পৃ ৩৫২।)

বর্তমানকালে সগোত্রা-বিবাহ আইনত সিদ্ধ হলেও জনসমাজে এর বিরুদ্ধ সংস্কার একেবারে উঠে যায়নি। প্রেম-মূলক বিবাহে বা রেজিস্ট্রীকৃত বিবাহে সগোত্রার পরিণয় দৃষ্টিগোচর হয়। (Hindu Marriage Act, 1955, S, 29 দ্রষ্টব্য।)

(৫) বিবাহক্ষেত্রে সগোত্র ও সপিণ্ড বিচার

সগোত্রা বা সমান-প্রবরা কন্যাকে বিবাহ করা চলে না। এক গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বর ও বধূর এক গোত্র হতে পারে না। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বর ভরদ্বাজ-গোত্রীয়া কন্যাকে বিবাহ করতে পারে না। শণ্ডিল গোত্রের বরের পক্ষে শণ্ডিল-গোত্রীয়া কন্যাকে বিবাহ অবৈধ। রঘুনন্দনের মতে ব্রাহ্মণের গোত্র-পরিচয় স্বাভাবিক ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্বাভাবিক গোত্র নাই, পুরোহিতের গোত্র দ্বারা তারা পরিচিত হয়। স্বভাবতই ব্রাহ্মণ সগোত্রা কন্যাকে বিবাহক্ষেত্রে বর্জন করবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করতে পারে না। ব্রাহ্মণের গোত্র উপদিষ্ট। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপর ব্রাহ্মণের গোত্রই অতিদিষ্ট বা আরোপিত হয়েছে। শূদ্রের উপর বৈশ্যের কৃত্রিম গোত্র অতিদিষ্ট বা আরোপিত হয়েছে। সুতরাং শূদ্রের গোত্র-পরিচয় অতিদিষ্টাতিদিষ্ট। এই কারণে শূদ্রের বেলায় সগোত্র-নিষেধ নাই। সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করলে শূদ্রের কোন দোষ হয় না। (উদ্বাহ-তত্ত্বম্ ১০-১২)

সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করা প্রতিষিদ্ধ। গোত্রের প্রবর্তক গোত্র-ঋষি এবং একটি হিসাবে গোত্র-ঋষির পূর্বপুরুষরাই প্রবর-ঋষি। গোত্র মানে পূর্বপুরুষের নাম এবং প্রবর মানেও তাই। গোত্রের সঙ্গে প্রবর যুক্ত থাকে। যে প্রবরে তিন ঋষির নাম আছে তা হল ত্র্যার্ষেয় প্রবর। বর ও কন্যার পৃথক্ ত্র্যার্ষেয় প্রবরে যদি দুই ঋষি-নামের মিল থাকে, তাহলে তারা সমান-প্রবর, তাদের বিবাহ বিধি-বহির্ভূত। যথা, ধনংজয় গোত্রের প্রবরে তিন ঋষির নাম,—বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দস্ এবং ধনংজয়। আবার অজ গোত্রের প্রবরে তিন ঋষির নাম,—বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দস্ এবং অজ। দুইটি প্রবরে দুই ঋষি-নামের মিল লক্ষিত হচ্ছে। এই দুই প্রবরের ছেলে মেয়ে সমান-প্রবর-রূপে গণ্য হবে।

যে প্রবরে পাঁচ ঋষির নাম থাকে তা পঞ্চার্ষেয় প্রবর। এরকম দুইটি প্রবরে যদি তিন ঋষি-নামের মিল থাকে, তাহলে এই দুই প্রবর দ্বারা পরিচিত ছেলে মেয়ে সমান-প্রবর। যথা,—ঋক্ষ বা রৌক্ষায়ণ গোত্রের প্রবরে পাঁচ ঋষির নাম,—অঙ্গিরস্, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, বন্দন, মতবচস্। গর্গ গোত্রের প্রবরেও পঞ্চ ঋষি-নাম,—অঙ্গিরস্, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, শিনি ও গর্গ। এই দুই

প্রবরের ছেলে মেয়ে হল সমান-প্রবর। এদের পরিণয় সমর্থন পায় না। (বৌধায়ন কৃত প্রবর প্রশ্ন ৩।১৮, ১৯ ; ৬।৩৬, ৩৭)

রঘুনন্দন বাৎস্য (বৎস) ও সাবর্ণ (সাবর্ণি) গোত্রের উল্লেখ করেছেন। উভয় গোত্রের প্রবরে পাঁচ ঋষির নাম,—উর্ব, চ্যবন, ভৃগু, জমদগ্নি, অপ্লবৎ। বৌধায়নের সূত্রে ভিন্ন ক্রমিকতা দৃষ্ট হয় এবং তা অধিক নির্ভরযোগ্য। যথা,—ভৃগু, চ্যবন, অপ্লবান, উর্ব, জমদগ্নি। এক্ষেত্রে বাৎস্য ও সাবর্ণ গোত্রের ছেলে-মেয়ে অসগোত্র হলেও সমান-প্রবর এবং বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। (উদ্বাহতত্ত্ব ১৩ ; প্রবর প্রশ্ন ১।৩)

বিবাহক্ষেত্রে সগোত্রা-নিষেধ আশ্বলায়ন ও বৌধায়ন কর্তৃক সূচিত হয়েছে। রঘুনন্দন ত্রিগোত্র গণনার বিধান দিয়েছেন। এই বিধানের তাৎপর্য পূর্ববর্তী নিষেধের ক্ষেত্র বিস্তার। তিন গোত্রের অন্তর্গত কন্যা অবিবাহ্যা। তিন গোত্রের বহির্ভূতা কন্যা বিবাহ্যা এবং সপিণ্ড-নিয়ম তার উপর প্রযোজ্য নয়। পিতার ও পিতৃবন্ধুর গোত্র থেকে, মাতামহের ও মাতৃবন্ধুর গোত্র থেকে গোত্র গণনার নিয়ম কথিত হয়েছে। অর্থাৎ, পিতার দিক থেকে, মাতামহের দিক থেকে গোত্র গণনার বিধি। এই ব্যবস্থায় মাতামহের সগোত্রা কন্যার পাণি-গ্রহণ অনুচিত। অসগোত্র বিবাহের বৈদিক বিধিতে শুধুমাত্র পিতৃপক্ষই ছিল বিচার্য, কিন্তু রঘুনন্দনের সময়ে মাতৃপক্ষ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

(উদ্বাহতত্ত্ব ১৪, ১৭)

একটি উদাহরণ দ্বারা ব্যাপারটা বোঝানো যায়। বৃদ্ধ প্রপিতামহের দৌহিত্রীর দৌহিত্রী পিতৃগোত্র থেকে ত্রিগোত্র-ব্যবহিতা, সুতরাং বিবাহযোগ্যা। বৃদ্ধপ্রপিতামহের গোত্র (১) থেকে ভিন্ন তাঁর বিবাহিতা কন্যার গোত্র (২) ; তার গোত্র থেকে ভিন্ন বিবাহিতা দৌহিত্রীর গোত্র (৩) ; তার গোত্র থেকে ভিন্ন দৌহিত্রীর বিবাহিতা কন্যার গোত্র (৪) ; শেষোক্ত গোত্রই হল দৌহিত্রীর অবিবাহিতা দৌহিত্রীর গোত্র।

পিতৃবন্ধু হল পিতার মামাত, মাসতুত, পিসাত ভাইরা। মাতৃবন্ধু হল মাতার মামাত, মাসতুত, পিসাত ভাইরা। এরূপ মামাত ভাইয়ের গোত্র থেকে গোত্র গণনা বিহিত। এরূপ পিসাত ভাইয়ের মাতামহের গোত্র থেকে এবং মাসতুত ভাইয়ের মাতামহের গোত্র থেকে গোত্র গণনা সমুচিত। (১) পিতার যে গোত্র তাই হচ্ছে পিতার পিসাত ভাইয়ের মাতামহের গোত্র। পিতার মাসতুত ভাইয়ের মাতামহের যে গোত্র তাই পিতার মাতামহের গোত্র। (২) মায়ের পিতার যে গোত্র তাই হল মাতার পিসাত ভাইয়ের মাতামহের গোত্র। মাতার মাসতুত ভাইয়ের মাতামহের যে গোত্র তাই মাতার মাতামহের গোত্র।

এরূপ বিবেচনা হতে প্রতীত হয় যে ত্রিগোত্র গণনার নিয়ম—(১) পিতার

গোত্র থেকে, (২) পিতার মাতামহের গোত্র থেকে, (৩) মাতামহের গোত্র থেকে, (৪) মাতার মাতামহের গোত্র থেকে। (উদ্বাহতত্ত্ব ২০)

বিবাহক্ষেত্রে সপিণ্ডগণনার বিধান কিছু জটিল। রঘুনন্দন ধৃত পৈঠীনসির মত অনুসারে মাতা থেকে তিন পুরুষ এবং পিতা থেকে পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত কন্যা সপিণ্ডা ও অবিবাহ্যা। এই মতের রঘুনন্দন-কৃত ব্যাখ্যা অনুসারে বৃদ্ধ প্রমাতামহ পর্যন্ত মাতৃপক্ষে গণনার সীমা। মাতা থেকে সগোত্র বা সপিণ্ড গণনার নিয়ম নাই, যেহেতু মাতা পিতার সগোত্রা ও সপিণ্ডা-রূপে বিবেচিতা। বিবাহের পরে পত্নী পতির গোত্রের অন্তর্ভুক্তা হয় এবং পতির সপিণ্ডা হয়। সুতরাং মাতা থেকে যখন সপিণ্ড গণনার কথা বলা হয়েছে, তখন মাতামহ থেকে সপিণ্ড গণনা কর্তব্য। পৈঠীনসির মতে মাতামহ প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই তিন জনের প্রত্যেকের অধস্তন তিন পুরুষ পযন্ত কন্যা বিবাহক্ষেত্রে ত্যাজ্যা। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহ, এই পাঁচজনের প্রত্যেকের অধস্তন পাঁচ পুরুষ পযন্ত কন্যা পারণয় ক্ষেত্রে ত্যাজ্যা। [উদ্বাহতত্ত্ব ৪, ৭ দ্রষ্টব্য।]

সপিণ্ডা কন্যা বজনের অধিকতর প্রচলিত গণনা প্রণালী নিম্ন প্রকার। বিষ্ণুস্মৃতি অনুসারে মাতা থেকে, অর্থাৎ মাতামহ থেকে ঊর্ধ্ব পাঁচ পুরুষ গণনীয়, প্রত্যেকের অধস্তন পাঁচ পুরুষ পযন্ত কন্যা অবিবাহ্যা। এই হিসাবে মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রমাতামহ এবং অত্যতিবৃদ্ধপ্রমাতামহ,—এই পাঁচ জনের প্রত্যেকের অধস্তন পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত কন্যাকে বিবাহ করা চলবে না। এই গণনাসীমার ভিতরে সকল কন্যাই মাতামহের সপিণ্ডা এবং বিবাহের অযোগ্যা।

পিতা থেকে ঊর্ধ্ব সাত পুরুষ গণনীয়। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ, অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং অতি-অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ,—এই সাত জনের প্রত্যেকের অধস্তন সাত পুরুষ পযন্ত কন্যা পিতৃসপিণ্ডা এবং বিবাহ সংক্রান্ত নিষেধের আওতায় পড়ছে। (বিষ্ণু ২৪।১—১০; উদ্বাহতত্ত্ব ২০—পিতৃপিতামহাদীনাং সপ্তানাং সন্ততিঃ সপ্তমীপর্যন্তা ন উদ্বাহ্যা এবং মাতামহ-প্রমাতামহাদীনাং পঞ্চানাং সন্ততিঃ পঞ্চমীপর্যন্তা ন উদ্বাহ্যা।)

পিতৃপক্ষে যার সপিণ্ডতা বিবেচনা করা হয়, তার উপরের ছয় পুরুষকে গণনা করতে হয়। বিবাহ ক্ষেত্রে পিতার সপিণ্ড ও মাতামহের সপিণ্ড বিচার্য। সুতরাং পিতাকে ধরে উপরের সাত পুরুষকে গণনা করার রীতি। মাতামহকে ধরে উপরের পাঁচ পুরুষকে গণনার বিধি। (উদ্বাহতত্ত্ব ১৮)

শূদ্রের বিবাহেও সপিণ্ডতা বিচার্য হয়েছে এবং সপিণ্ডা কন্যা বর্জনীয়ারূপে বিবেচিত হয়েছে। (উদ্বাহতত্ত্ব ১২)

বিবাহক্ষেত্রে সগোত্রা নিষেধ দ্বারা সপিণ্ডা কন্যার নিষেধ হয়। সুতরাং পৃথক্‌ভাবে সপিণ্ডা নিষেধের দ্বারা বুঝতে হবে যে ভিন্নগোত্রজা সপিণ্ডা

কন্যাকে বিবাহ করা চলবে না। ত্রিগোত্র ব্যবহিতা সপিণ্ডা কন্যা বিবাহযোগ্যা।

(৬) বিবাহ ক্ষেত্রে বর্ণবিচার।

প্রাচীন কালে ধর্ম-বিবাহ বলতে বোঝা যেত সবর্ণ বা একবর্ণের মধ্যে ছেলেমেয়ের বিবাহ। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ভার্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ভার্যা, বৈশ্যের বৈশ্যা ভার্যা, শূদ্রের শূদ্রা ভার্যা যথার্থ সহধর্মিণী। অন্যবর্ণের ভার্যা নিছক কাম পরিপূরণের জন্য সমর্থিত হত।

সমবর্ণের মধ্যেই বিবাহ নৃবিজ্ঞানে অন্তর্বিবাহ বা endogamy রূপে বিদিত। সেকালে সমর্থন ছিল অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে। এই প্রথা অনুসারে উচ্চবর্ণের ছেলে নিম্নবর্ণের মেয়েকে বিবাহ করতে পারত। এর কেতাবী নাম উচ্চ বিবাহ (hypergamy)। প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ ছিল অননুমোদিত। এর কেতাবী নাম নিম্ন বিবাহ (hypogamy)। প্রতিলোম হচ্ছে নিম্ন বর্ণের ছেলের দ্বারা উচ্চবর্ণের মেয়েকে বিবাহ। প্রকৃতপক্ষে সেকালে প্রতিলোম সম্পর্কও ঘটত। বর্ণসঙ্করের বা বর্ণসংমিশ্রণের স্মার্ত বিবরণ অংশত সত্য হলেও প্রতিলোমের নজীরও যথেষ্ট ছিল বলে মনে হয়।

বর্তমানের প্রেম-মূলক বিবাহগুলিতে অনুলোম বা প্রতিলোম সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। প্রতিলোমের টাবু (taboo) লুপ্ত প্রায়। অথচ পঞ্চাশ বছর পূর্বেও বাংলাদেশে সবর্ণ বিবাহই ছিল চালু বিবাহ রীতি। অনুলোম বা প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ সামাজিক সমর্থন পেত না, এমন কি অসবর্ণ সহ-ভোজন (commensality) নিষিদ্ধ ছিল।

অনুলোম বিধি অনুসারে দশপ্রকার বিবাহ বৈধ। যথা :—

(১) ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের বা শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ;

(২) ক্ষত্রিয় কর্তৃক ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের বা শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ;

(৩) বৈশ্য কর্তৃক বৈশ্যের বা শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ;

(৪) শূদ্র কর্তৃক একমাত্র শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ।

(বিষ্ণু সং ২৪।১ - ৪)

ক্ষত্রিয়ের জন্য ব্রাহ্মণ-কন্যা নিষিদ্ধা। বৈশ্যের জন্য ক্ষত্রিয়ের ও ব্রাহ্মণের কন্যা নিষিদ্ধা। শূদ্রের জন্য বৈশ্যের, ক্ষত্রিয়ের ও ব্রাহ্মণের কন্যা নিষিদ্ধা। এরূপ নিষিদ্ধা কন্যার পরিণয়ই হচ্ছে প্রতিলোম বিবাহ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজ বর্ণ-রূপে প্রখ্যাত। শূদ্র চতুর্থ বর্ণ। (অনুলোম বিচার—মনু ১০।৫-১০ ; প্রতিলোম বিচার—১০।১৩।)

(৭) বিবাহক্ষেত্রে শ্রেণী-বিচার

বাৎস্যায়নের মত অনুসারে কন্যানির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনীয়। যথা,—(ক) কন্যা সবর্ণা বা সমান বর্ণের অন্তর্ভুক্তা হওয়া উচিত, (খ) অন্যপূর্বা, অর্থাৎ, বাগ্‌দত্তা হওয়া উচিত নয়। অপরের সহিত যার সম্বন্ধ বিষয়ে পাকা কথা হয়েছে, এমন কন্যাকে বরণ করা অনুচিত। বঙ্গদেশীয় বিবাহে পাকা দেখার একটা প্রথা আছে। এরই নাম সম্ভবত সেকালে ছিল বাগ্‌দান বা চুক্তি (contract) সম্পাদন। (গ) কন্যার কুলাচার শ্লাঘনীয় হবে। (ঘ) কন্যা ধনবান্ কুলে প্রসূতা হবে। কন্যার কুল বহু আত্মীয়যুক্ত হবে। (ঙ) কন্যার পিতামাতা জীবিত থাকা বাঞ্ছনীয়। অভিভাবক দ্বারা বিবাহ-চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কন্যা ও কন্যার ঘর (class-status) বিবেচ্য হত, যেমন এখনও হয়। অর্থাৎ, কন্যার জাত বা বর্ণ (caste) এবং শ্রেণী (class) বিচার হত,—এখনও এরূপ হয়। কন্যার ঘর যেন সম্পন্ন হয়, গরীব না হয়,—এজাতীয় বিবেচনা সেকালেও ছিল এবং একালেও রয়েছে। (কামসূত্র ৩।১।২)

এই বিবেচনার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয় যে বিবাহ দুই অংশীদারের, অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর নিছক যৌন সম্পর্কের বৈধ অনুমোদন নয়, পরন্তু দুই পরিবারের, বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। বিবাহের যৌন সম্পর্ককেও অতিক্রম করেছে সামাজিক শ্রেণীগত তাৎপর্য। বিবাহ মাত্র দুই জনের চুক্তি নয়, পরন্তু দুই কুলের চুক্তি বা সামাজিক চুক্তি (social contract)। ঘরের বিবেচনা মানে শ্রেণীগত বিবেচনা।

বাৎস্যায়নের মতে বিবাহসম্বন্ধ তিনপ্রকার,—(১) উচ্চ সম্বন্ধ; (২) সমান সম্বন্ধ এবং ৩) নীচ সম্বন্ধ। কন্যাপক্ষের উচ্চ ঘর হলে বিবাহকারী স্বামী কন্যার কুলে ভৃত্যবৎ আচরণ করে। কন্যাপক্ষের নীচু ঘর হলে বর কন্যার কুলে প্রভুবৎ আচরণ করে। কিন্তু সমান ঘরের বিবাহে বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের সমান মর্যাদা বহাল থাকে। বাৎস্যায়ন বলছেন যে উচ্চ সম্বন্ধ ভাল না হলেও করণীয়, কিন্তু হীন সম্বন্ধ কখনও করণীয় নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী শ্রেণীমূলক। বাৎস্যায়ন তাঁর সমকালীন সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর আলেখ্যই উপস্থাপিত করেছেন। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর চিত্র তাঁর গ্রন্থে প্রায় নেই বললেই হয়। (কামসূত্র ৩।১।২০-২৪)

বর্তমান কালের শহরে সমাজে প্রেমমূলক পরিণয় কদাচিৎ শ্রেণী-বিচারকে ডিঙিয়ে যায়। অধিকাংশ বিবাহের ক্ষেত্রে বরকন্যার সামাজিক বা অর্থনৈতিক মর্যাদান্তর খুব পৃথক্ হয় না।

(৮) গান্ধর্ব রীতি

বাৎস্যায়ন-চিত্রিত সমাজে স্ত্রী-পুরুষের আংশিক স্বাধীনতা ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রেম-মূলক বিবাহের বিবরণে। নায়ক বা নায়িকার তরফ থেকে প্রাথমিক উদ্যোগ দেখা যেত, বিশেষ ধরণে কোর্টশিপ চলত এবং প্রেমে সাফল্যও হত। ঘোটকমুখের মতে বিবাহের উদ্দেশ্যে কোর্টশিপ (সংবনন) শ্লাঘনীয়। (কামসূত্র ৩।৩।৫)

স্বাভাবিকভাবে কন্যা নির্বাচন বা বরণ যেখানে সম্ভব হত না, সেক্ষেত্রে গান্ধর্ব রীতি ছিল স্ত্রীলাভের বা পতিলাভের উপায়। গুণবান্ কিন্তু ধনহীন পুরুষকে; মাতা পিতা ও ভ্রাতার অধীন পুরুষকে; ধনী প্রতিবেশীকে; হীন কুলের পুরুষকে কন্যাপক্ষ পছন্দ করে না। এইজন্য প্রণয়ের উপযোগিতা অনস্বীকার্য কামসূত্রের মতে। (৩।৩।১,২)

দাক্ষিণাত্যে পিতৃমাতৃহীন বালক মাতুলকুলে বর্দ্ধিত হত এবং উপক্রমণের (প্রণয়ের) সাহায্যে মামাত বোনকে বশীভূত ক'রে বিবাহ করত। অপর পুরুষের সঙ্গে মাতুলকন্যার বিবাহ হয়ত স্থিরীকৃত হয়েছে; সেক্ষেত্রেও তাকে নিজের আয়ত্তে এনে বিবাহ করত। এই মাতুলকুলের বহির্ভূতা কন্যাকেও পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করত। (কামসূত্র ৩.৩.৩-৪)

প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়সের কুমারীর জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বিত হত। যথা,—

(১) বালিকাকে জয় করবার উপায় বালক্রীড়নক;
(২) যুবতীকে জয় করবার উপায় কলাকৌশল;
(৩) প্রৌঢ়াকে জয় করবার উপায় মধ্যস্থের সাহায্য। (৩।৩।৩২)

বালিকাকে বশীভূত করতে অবলম্বনীয় ক্রীড়ার তালিকা:—

(১) আকর্ষক্রীড়া—পাশা খেলা; (২) পট্টিকাক্রীড়া—হস্তাঙ্গুলিতে পট্টিকা বন্ধন; (৩) মুষ্টিদ্যূত—হস্ত মুষ্টিতে ধৃত বীজের জোড় বা বিজোড় সংখ্যানির্ণয়: (৪) মধ্যমাঙ্গুলি গ্রহণ, (৫) ষট্ পাষাণক—ছটি কাঁকরের গুটী নিয়ে খেলা।

এই উদ্দেশ্যে বহিঃক্রীড়ার তালিকা:—

(১) সুনিমীলিতকা—একজনের চোখ বেঁধে চোরপলান্তী খেলা; (২) লবণ বীথিকা—লবণের দোকান; (৩) অনিল-তাড়িতকা—বিহগের পক্ষদ্বয়ের অনুকরণে হস্তপ্রসারণ পূর্বক চক্রবৎ ভ্রমণ; (৪) গোধূম-পুঞ্জিকা-গম ও পয়সা নিয়ে খেলা, (৫) অঙ্গুলি তাড়িতকা—চোখ বাঁধা অবস্থায় অঙ্গুলি তাড়নাকারীকে সনাক্তকরণ। (৩।৩।৭,৮)

বালিকা প্রেমের পাত্রীকে বশীভূত করবার জন্য তাকে নানাপ্রকার খেলনা উপহার দেওয়া হত। যথা,—

(১) কন্দুক — গোলা ; (২) সূত্র, কাষ্ঠ, শৃঙ্গ (গবল) গজদন্ত, মোম, চাউলচূর্ণ (পিষ্ট) এবং মৃত্তিকানির্মিত মেয়ে পুত্তলিকা ; (৩) ভাত রাঁধার খেলনা-হাঁড়ি (মহানসিক) ; (৪) সংযুক্ত মেষ মেষী প্রভৃতির কাঠ খোদাই ; মৃত্তিকা, বাঁশ (বিদল) ও কাষ্ঠ থেকে নির্মিত দেব গৃহ ; শুক, কোকিল প্রভৃতি পাখীর খাঁচা ; বিচিত্র আকৃতিযুক্ত কলস (জলভাজন), যন্ত্রিকা, খেলনা-বীণা (বীণিকা) ; (৫) প্রসাধন-পাত্র (পটোলিকা) ; অলক্তক, মনঃশিলা (লাল আর্সেনিক চূর্ণ), হরিতাল (হলদে আর্সেনিক চূর্ণ), হিঙ্গুল (লালবর্ণ খনিজ পারদ, শ্যামবর্ণক (কালো রঙ) ; চন্দন, কুঙ্কুম, সুপারী (পুগফল), পাণ (পত্র)। (৩,৩,১৩—১৬)

বালিকার সঙ্গে পুষ্পচয়ন, মাল্যগ্রথন, খেলনা-গৃহ নির্মাণ, পুতুল (দুহিতৃকা) নির্মাণ ও ভাত রন্ধনের খেলায় প্রেমিককে যোগ দিতে হত। (৩৩৬)

বালিকার ধাত্রীর মেয়ে (ধাত্রেয়িকা) দূতীয়ালির জন্য নিযুক্তা হত। এই প্রকারে ধীরে ধীরে কৌশল সহকারে বালিকাকে গান্ধর্ববিবাহে আকৃষ্ট করা হত। (৩।৩।২১)

পুরুষ প্রেমিকটি পাশাখেলায়, অন্যবিধ ক্রীড়ায় বা জলক্রীড়ায় কন্যার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করত ; নবপত্রিকা প্রভৃতি উৎসবে কন্যার নিকটে ভাব নিবেদন করত। নিজের দুঃখ ও স্বপ্নের কথা নিবেদন করত। নাটকীয় অনুষ্ঠানে (প্রেক্ষণক), গোষ্ঠীগত মিলনে (সমাজ), কন্যার সমীপে উপবেশন করত। এই প্রকারে প্রেমের অগ্রগতি হত। কন্যার ভাব বিদিত হলে ব্যাধির অছিলায় তাকে স্বগৃহে আনত। নিজের পক্ষে প্রচেষ্টা (অভিযোগ) সম্ভব না হলে তার ধাত্রেয়িকার বা সখীর সাহায্য নিত। অথবা নিজের পরিচারিকাকে নিযুক্ত করত। প্রণয়ের যোগ্য ক্ষেত্র ছিল যজ্ঞস্থল, বিবাহ অনুষ্ঠান, যাত্রা, লৌকিক উৎসব, বিপত্তি (ব্যসন), যেখানে লোকের ভীড় হয়। (৩,৭।১-৩৫)

কন্যার তরফে প্রেমের পাত্রকে জয় করবার প্রণালীও বাৎস্যায়ন বর্ণনা করেছেন। উচ্চকুলে জাতা হয়েও ধনহীনা মেয়ের কিংবা মাতৃপিতৃহীনা জ্ঞাতিগৃহবাসিনী মেয়ের যোগ্য বর জুটত না। সে যৌবনকালে নিজেই নিজের বিবাহে উদ্যোগিনী হত। কোন্ জাতীয় নায়ক সুলভ তা বিচার্য ছিল। যে নায়ক শৈশব থেকে খেলাধূলার ভিতর দিয়ে পূর্বপরিচিত এবং গুণবান্ ও সুদর্শন, অথবা যে নায়ক মাতাপিতার সম্মতির উপর নির্ভরশীল নয়, তার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান অপ্রত্যাশিত, তার সঙ্গে প্রণয় সঙ্গত। এই ব্যাপারে নায়িকার মাতা বা পাতানো মা সখীও ধাত্রেয়িকার সাহায্য নিতেন। নায়িকা পুষ্প, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল হস্তে বিজনে অপরাহ্ণে নায়কের স্থানে উপস্থিত হত। তারপর গান্ধর্ব প্রণালীতে উভয়ের মিলন সম্পন্ন হত।

(৩।৪।৩৬—৪৭)

প্রণয়-পাত্রীকে লাভ করার উপায় অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হত। যথা,—

যেস্থলে প্রেমের পাত্রীর সঙ্গে ঘন ঘন সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে তার ধাত্রেয়িকা (ধাত্রীর মেয়ে) মধ্যস্থতা করত। ধাত্রেয়িকা নিজ দূতীয়ালির কথা গোপনে রেখে নায়িকার নিকটে নায়কের গুণপনা প্রকাশ করত। অন্যান্য পাণিপ্রার্থীদের দোষ দেখাত। তার মুখ থেকে নায়িকা শুনত যে তার পিতামাতা গুণগ্রাহী নন। তাঁরা ধনলোভী, ধনী বর খুঁজছেন, যাতে কন্যার বিবাহে শুল্ক আদায় করতে পারেন। উচ্চকুলে বিবাহ সুখজনক নয়, যেহেতু বহু সপত্নী থাকে। সপত্নীর প্ররোচনায় স্বামী-কর্তৃক বিরাগ-ভাজনা স্ত্রী পরিত্যক্তা হয়। এক-চারিতায়, অর্থাৎ, একস্ত্রীবিবাহে সুখ উপহত হয় না, পতির অনুরাগ অব্যাহত থাকে।

এরপর অভিলষিত স্থানে নায়িকা আনীতা হলে, নায়ক শ্রোত্রিয়ের আগার থেকে অগ্নি আনিয়ে কুশ বিছাত, হোম করত। নায়িকার সহিত তিনবার অগ্নি পরিক্রমা করত। পরিশেষে নায়িকার বাপ-মার কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করত। তখন আর অগ্নিসাক্ষিক বিবাহ নাকচ করা সম্ভব নয়। (৩.৫।১-১৭)

প্রেমের পাত্র ও পাত্রীর উভয়ের সম্মতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধর্ব বিবাহ অনুষ্ঠিত হত। (৩.৫।১৮)

কখনও কখনও কোন কুলপ্রমদার সাহায্যে নায়িকাকে গুপ্তস্থানে আনিয়ে অগ্নিসাক্ষিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হত। (৩।৫।১৯,২০)

অন্য পাত্রের সহিত নায়িকার বিবাহ আসন্ন হয়েছে, এরূপ ক্ষেত্রে কোন পূর্বপরিচিতা প্রতিবেশিনী নায়িকার মাতার নিকটে নির্বাচিত পাত্রের দোষ-সমূহ বর্ণনা করত। এর ফলে মায়ের মন নায়কের দিকে ঘুরে যেত। তখন উক্ত প্রতিবেশিনীর গৃহে নায়িকার মাতাই অগ্নিসাক্ষিক বিবাহের ব্যবস্থা করতেন। (৩।৫।২১,২২)

সমবয়স্ক, বেশ্যাসক্ত বা পরস্ত্রীতে আসক্ত নায়িকার ভাইকে সাহায্য ক'রেও নায়ক তার দ্বারা উক্তরূপ বিবাহের আয়োজন করিয়ে নিত।

(৩।৫।২৩-২৪)

অষ্টমী-চন্দ্রিকা প্রভৃতি উৎসবের সময়ে নায়িকাকে মাদকদ্রব্য পান করিয়ে ধাত্রেয়িকা পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে যেতে প্ররোচিত করত এবং উক্তরূপ বিবাহ আয়োজিত হত। (পৈশাচ বিবাহের দৃষ্টান্ত—৩।৫।২৫)

কখনও কখনও একাকিনী নিদ্রিতাকে দূষণপূর্বক উক্তপ্রকার বিবাহানুষ্ঠান সমাধা হত। (পৈশাচ বিবাহের দৃষ্টান্ত, ৩।৫।২৬)

গ্রামান্তর-গামিনীকে বা উদ্যান-গামিনীকে অপহরণ করবার রীতিও ছিল। এই দৃষ্টান্ত রাক্ষস বিবাহের। (৩।৫।২১)

প্রথম দুইটি উদাহরণে নায়িকার চিত্তজয়ের চেষ্টা লক্ষণীয়। বাকীগুলিতে ছল, চাতুরী, কৌশল বা শক্তির প্রয়োগ পরিস্ফুট। অর্থাৎ, নায়িকার তরফ থেকে সম্মতির বা ভাববিনিময়ের কোন প্রসঙ্গ নেই। পৈশাচ বিবাহের প্রণালীতে প্রাক্-পরিণয় যৌন সম্পর্কের বর্বর নমুনা লক্ষিত হয়। রাক্ষস প্রণালীটিও কন্যাহরণের প্রকারভেদ মাত্র।

বাৎস্যায়নের মতানুসারে বিবাহের উদ্দেশ্য প্রেম, সুতরাং গান্ধর্ব বিবাহই সর্বাধিক সমর্থনীয়। স্ত্রীর পক্ষে বাঞ্ছনীয় স্বামী হচ্ছে বশ্য পুরুষ, যাকে নিজের আয়ত্তে রাখা চলে। এইরূপ স্বামী দরিদ্র ও নির্গুণ হলেও এর সঙ্গে ঘর করা সহজ। বহুস্ত্রীযুক্ত গুণবান্ পতি কাম্য নয়। সাধারণত ধনীরা বহু দার পরিগ্রহ (Polygyny) করে। তাদের স্ত্রীরা বাহ্য ভোগের প্রাচুর্য সত্ত্বেও যথার্থ মানসিক সুখে বঞ্চিতা এবং অসংযতা হয়ে থাকে। স্বয়ংবরাদের মধ্যে কেউ কেউ এই তথ্য জেনেশুনেই ধনী বরকে বরণ করে। যে বিদেশে গমনশীল, যে বৃদ্ধ, যে সপত্নীক, যে অপত্যবান্, তাকে পতিত্বে বরণ করা উচিত নয়। (৩,৪।৪৮-৫৪ ; ৩।৫।৩০)

চতুর্থ প্রকরণ ঃ

বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ রীতি

(১) পুরুষের পুনর্বিবাহ

প্রাচীন ভারতে পুরুষের পুনর্বিবাহে শর্তাধীন অনুমোদন ছিল। অর্থশাস্ত্রের মতে—

বন্ধ্যা স্ত্রীর স্বামী আট বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। মৃতবৎসা (নিন্দু) স্ত্রীর স্বামী দশ বছর অপেক্ষা করবে। কন্যাপ্রসবিনীর স্বামী বারো বছর অপেক্ষা করবে। তারপর পুত্রলাভে ইচ্ছুক হলে দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবাহ করতে পারে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে সে প্রথমা স্ত্রীকে শুল্ক, স্ত্রীধন এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ (আধিবেদনিক) দান করবে। রাজদ্বারেও দণ্ডনীয় হবে। (অর্থশাস্ত্র ৩।২।৩৮-৪০)

যে স্ত্রী বিবাহকালে শুল্ক, স্ত্রীধন পায়নি, তাকে শুল্ক, স্ত্রীধন, ক্ষতিপূরণ এবং বৃত্তি দান পূর্বক পুনরায় তার স্বামী বহু স্ত্রী বিবাহ করতে পারে। যেহেতু পুত্রলাভের জন্যই স্ত্রী। (৩।২।৪১,৪২)

কৌটিল্যের বিধানে দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণকালে প্রথমা স্ত্রীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা রয়েছে। আরও অধিক স্ত্রী গ্রহণেও বাধা নেই, যদি প্রথমা স্ত্রী ক্ষতিপূরণ লাভ করে। এস্থলে সূচিত হয় যে সাধারণত এক স্ত্রীবিবাহই (monogamy) চালু ছিল। তার ব্যতিক্রম যেন বহুস্ত্রীবিবাহ (polygyny)।

এই প্রসঙ্গে মনুর বিধানগুলি স্মরণীয়। যথা :—(১) স্ত্রী বন্ধ্যা হলে অষ্টম বৎসরে, মৃতসন্তান প্রসবিনী হলে দশম বৎসরে, কন্যাপ্রসবিনী হলে একাদশ বৎসরে, কলহপরায়ণা হলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে স্বামী দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ (অধিবেদন) করবে। (মনু ৯।৮১)

(২) স্ত্রী মদ্যপায়িনী বা প্রতিকূলা বা ব্যাধিতা বা অর্থনাশকারিণী হলে স্বামী দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। (৯।৮০)

(৩) যে স্ত্রী শীল-সম্পন্না, কিন্তু রোগিণী, তার অনুমতি নিয়ে স্বামী দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবাহ করতে পারে। (৯।৮২)

(৪) যার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেছে, সেই স্ত্রী অধিবিন্না। সে যদি পতিগৃহ ত্যাগ করে, তাহলে তাকে অবরুদ্ধ ক'রে রাখা বিধেয় কিংবা তার কুলে তাকে ত্যাগ করা বিধেয়। (৯।৮৩)

এস্থলেও একস্ত্রীবিবাহের স্বাভাবিক রীতি প্রতীত হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীবিবাহ বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমোদিত।

(২) সপত্নী-বৃত্ত

স্বামী যদি দুই স্ত্রী বিবাহ করে (bigamy), কিংবা বহুস্ত্রী বিবাহ করে, তাহলে বিবাহিতা স্ত্রীরা পরস্পরের সপত্নী-রূপে কথিতা হয়। (সপত্নী—cowife.)

ঋগ্বেদে সপত্নী-বাধনের জন্য জাদু অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। সতীন-বিদ্বেষ-মূলক বহু বাংলা ছড়াও রয়েছে। বাৎস্যায়ন জ্যেষ্ঠা সপত্নীর বৃত্ত, কনিষ্ঠা সপত্নীর বৃত্ত, দুর্ভগা সপত্নীর বৃত্ত বর্ণনা করেছেন।

(কামসূত্র ৪।২।৪৫-৫৪)

বাৎস্যায়ন বলেছেন যে সপত্নী গ্রহণের মূলে কয়েকটি হেতু বিদ্যমান থাকে। যথা,—প্রথমা স্ত্রীর জড়তা, দুঃশীলতা, রূপহীনতা, বন্ধ্যাত্ব কিংবা কন্যাপ্রসব,—অথবা স্বামীর কামুকতা। (কামসূত্র ৪।২।১)

এইজন্য স্ত্রীর তরফে উচিত ভক্তি, শীল ও বৈদগ্ধ্য খ্যাপন, যাতে তার প্রতি স্বামী আকৃষ্ট থাকে। যদি সন্তান না হয়, তাহলে নিজেই স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহে প্ররোচনা দেবে। (৪।২ ২)

সাধারণত রাজা ও ধনীদের বহু দার থাকত। (অন্তঃপুরিকা-বৃত্ত, ৪।২।৫৬-৬৬)

এস্থলে অধুনা অবলুপ্ত পূর্বে প্রচলিত বঙ্গদেশীয় কৌলীন্য প্রথা উল্লেখযোগ্য। এই প্রথা প্রধানত রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এর তাৎপর্য উচ্চকুলে বা সমকুলে কন্যাদান (hypergamy)। নিম্নকুলে কন্যা দান করলে কন্যার পিতার কুল নষ্ট হত। কুলরক্ষার জন্য বহুবিবাহকারী সমকুলের পুরুষকেই কন্যা দান করা হত। এর ফলে এক পুরুষের বহু স্ত্রী বিবাহ অনিবার্য হত। একজন বা দুজন বাদে গরীব স্বামীর গৃহে অন্যান্য স্ত্রীরা আশ্রয় পেত না। তারা পিতৃগৃহেই থাকত। বৎসরে একবার স্বামী তাদের পরিদর্শন ক'রে যেতেন ; (visiting marriage প্রথার উৎপত্তি হয় এর দরুণ)। বর্তমানে একস্ত্রীবিবাহ হিন্দু সমাজে একমাত্র আইন-সিদ্ধ বিবাহ।

(৩) স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ

কৌটিল্য স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ সমর্থন করেছেন। পুনর্বিবাহের এই অধিকার শর্তাধীন।

একস্থলে তিনি বলছেন যে ধর্মবিবাহে, অর্থাৎ, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ ও

দৈব বিবাহে বৈধ বিচ্ছেদ (মোক্ষ) নেই। এস্থলে সম্ভবত তাঁর প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে আসুর বিবাহেই শর্তাধীন বিচ্ছেদ হতে পারে, যেহেতু পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গে শুল্কের উল্লেখ দেখা যায়। যদি ভার্যা পতিদ্বেষিণী হয়, তাহলে স্বামীর অমতে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যদি স্বামী স্ত্রীদ্বেষী হয়, তাহলেও স্ত্রীর অমতে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদন-যোগ্য নয়। যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে দ্বেষ করে, তবেই বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থনীয়। (অর্থশাস্ত্র ৩।৩।১৫-১৯)

অন্যত্র কৌটিল্য আবার বলছেন যে ধর্মবিবাহের ক্ষেত্রেও প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী একটা নির্দিষ্ট অপেক্ষাকালের শেষে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। স্ত্রীর পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায়। যথা,—

(১) পূর্বস্বামী স্ত্রীকে জানিয়ে বিদেশগামী হলে স্ত্রীর তরফে অপেক্ষাকাল কম হবে। পূর্বস্বামী স্ত্রীকে না জানিয়ে বিদেশগামী হলে স্ত্রীর তরফে অপেক্ষাকাল বেশি হবে। (সাম শাস্ত্রীর অনুবাদ ভিন্ন।)

(২) প্রবাসী স্বামীর খবর না পাওয়া গেলে স্ত্রীর তরফে অপেক্ষাকাল কম হবে। প্রবাসী স্বামীর খবর পাওয়া গেল স্ত্রীর তরফে অপেক্ষাকাল বেশি হবে।

(৩) বিবাহকালে কন্যাপক্ষের প্রাপ্য শুল্কের অংশ যদি বরপক্ষ বা স্বামী দিয়ে থাকে, তবে স্ত্রীর তরফে অপেক্ষাকাল কম হবে। যদি কন্যাপক্ষ সম্পূর্ণ শুল্ক পেয়ে থাকে, তবে স্ত্রীর তরফে অপেক্ষাকাল বেশি হবে। এই শর্তটি সম্ভবত আসুর বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বিবাহের পরে যে স্ত্রীর কুমারীজীবন অব্যাহত আছে, তার পক্ষে এই তিনটি শর্ত উল্লিখিত হয়েছে।

(৪) দীর্ঘপ্রবাসী স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রীর অপেক্ষাকাল কম। হ্রস্বপ্রবাসী স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রীর অপেক্ষাকাল বেশি। দীর্ঘকালের জন্য বিদেশগামী হয়েছে এরূপ ধারণা যে স্বামী সৃষ্টি করেছে সেই বোধ হয় দীর্ঘপ্রবাসী। অল্পকালের জন্য প্রবাসী হয়েছে এই ধারণা যে সৃষ্টি করেছে সেই সম্ভবত হ্রস্ব প্রবাসী। দীর্ঘপ্রবাসীর জন্য অপেক্ষা নিরর্থক, তাই স্ত্রীর তরফে অপেক্ষাকাল কম। হ্রস্ব প্রবাসীর শীঘ্র প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশিত, তাই স্ত্রীর তরফে অপেক্ষাকাল বেশি।

স্বামীর মৃত্যু বা প্রব্রজ্যার (সন্ন্যাসের) ক্ষেত্রেও স্ত্রীর তরফে একটা অপেক্ষাকাল বিহিত হয়েছে।

অপেক্ষাকালের শেষে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারে। বিবাহের ক্ষেত্র পূর্বস্বামীর কুলের মধ্যেই। স্বামীর ছোট ভাইকে বিবাহ করা কর্তব্য। স্বামীর অনেক ভাই থাকলে ভরণ-পোষণ-ক্ষম অনুজ ধার্মিক ভাইকে কিংবা

অবিবাহিত কনিষ্ঠতম ভাইকে বিবাহ করা চলে। স্বামীর ভাই না থাকলে তার সপিণ্ড, অর্থাৎ, নিকট জ্ঞাতিকে বিবাহ করা চলে। এই বিধানের মূলে রয়েছে patrilocal বা পিতৃ-আবাসিক পরিবার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে বিবাহের পরে স্ত্রী স্বামীর কুলের অন্তর্ভুক্তা হয় এবং ঐ কুলের সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হয়। তাই স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর কুল ছেড়ে যাওয়া অসঙ্গত। (৩।৪।২৪-৩০)

কৌটিল্যের ব্যবস্থায় যে স্ত্রীর ভরণপোষণ আছে, সে প্রবাসী স্বামীর জন্য বেশিকাল অপেক্ষা করবে। যে স্ত্রীর ভরণপোষণ নেই, তাকে চার থেকে আট বছর সমৃদ্ধ জ্ঞাতিরা ভরণপোষণ করবে। তারপর তার কাছ থেকে বিবাহকালে প্রদত্ত শুল্কাদি ফেরত নিয়ে তাকে পুনর্বিবাহে অনুমতি দেবে।

যে স্ত্রী সন্তানবতী নয়, তার অপেক্ষাকাল কম। যে স্ত্রী সন্তানবতী, তার অপেক্ষাকাল বেশি। ব্রাহ্মণ স্বামী যদি বিদেশে অধ্যয়নরত থাকে, তাহলে স্ত্রীর অপেক্ষাকাল দশ থেকে বারো বছর। প্রবাসী স্বামী যদি রাজপুরুষ হয়, তাহলে আমরণ অপেক্ষাকাল স্ত্রীর তরফে। অর্থাৎ, বিবাহ বিচ্ছেদ নেই। তবে কুলের ধারা বজায় রাখার জন্য (নিয়োগ প্রথায়) স্বামীর কোন সবর্ণ পুরুষ দ্বারা সন্তানের জননী হতে পারে। সেক্ষেত্রে তার অপবাদ হবে না।

যদি স্বামীর প্রবাসকালে স্ত্রীর ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা না হয় এবং স্বামীর জ্ঞাতিরাও কোন সাহায্য না করে, তাহলে স্ত্রীর তরফে কোন অপেক্ষাকাল নেই। (৩।৪।২৩-৩০)

প্রবাসী স্বামী শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ বর্ণের, অর্থাৎ, যে কোন বর্ণের লোক হলেও, তার স্ত্রী পুনর্বিবাহের অধিকার পাবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র অনুযায়ী স্ত্রীর অপেক্ষাকাল তিন তীর্থকাল (ঋতুকাল), বা পাঁচ বা সাত বা দশ তীর্থকাল বা একবছর বা আরও বেশি।

পূর্বস্বামীর কুলের মধ্যে স্ত্রীর পুনর্বিবাহ সর্বদাই ঘটত এমন কথা বলা যায় না। দ্বিতীয় স্বামী অন্যকুলের লোক হলে জার-রূপে বিবেচিত হত। (৩।৪।৪২)

কৌটিল্যের সময়ে স্ত্রীর পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে বিচারকদের (ধর্মস্থ) অনুমতি নিতে হত। (৩।৩।৩৫)

যে স্বামী স্ত্রীকে দ্বেষ করে, সে স্ত্রীকে ভিক্ষুণীর গৃহে, স্ত্রীর কোন অভিভাবকের গৃহে বা জ্ঞাতির গৃহে থাকতে দিতে বাধ্য। (৩।৩।১৩)

যে স্বামী নীচ (দুশ্চরিত্র), পরদেশে প্রস্থিত, রাজদ্রোহী, প্রাণঘাতী, পতিত বা ক্লীব, সে স্ত্রীর দ্বারা ত্যাজ্য। (৩।২।৪৮)

অর্থাৎ, বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামীকে ত্যাগ করাও চলে।

কৌটিল্য-প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে স্বামীর মৃত্যুর পরে কোন কোন স্ত্রী ধর্মজীবন যাপন করত। অর্থাৎ, ব্রহ্মচারিণী থাকত। কোন কোন স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করত। তারা যৌতুক (স্থাপ্য), আভরণ এবং প্রাপ্ত শুল্কাংশ পূর্বস্বামীর জ্ঞাতিদের ফিরিয়ে দিত। দ্বিতীয় স্বামী পূর্ব স্বামীর পিতার দ্বারা নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, কিন্তু তার ব্যতিক্রমও দেখা যেত। পুনর্বিবাহের পরে স্ত্রী পূর্ব স্বামীর সম্পত্তি (দায়) বা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিতা হত। পুত্রবতী হয়েও পুনর্বিবাহ করলে পূর্ব বিবাহের স্ত্রীধন পূর্ববিবাহ-জাত পুত্রেরাই পেত। পুনর্বিবাহের পরে পূর্ব স্বামীর দ্বারা উৎপন্ন পুত্রদের ভরণপোষণের জন্যও পূর্ববিবাহের স্ত্রীধন ঐ ছেলেদেরই প্রাপ্য হত।

কখনও কখনও কোন নারী একাধিকবার পুনর্বিবাহিতা হত। (৩।২।১৯-৩.)

পরাশরের মতে স্বামী যদি নিরুদ্দেশ, মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব বা পতিত হয়, সেক্ষেত্রে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করতে পারে। (৪ ২৮)

এস্থলে মূল শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ ধরলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় পতি গ্রহণ বিষয়ে পরাশরের সম্মতি প্রতীত হয়। অনেকের মতে বাগ্‌দানের স্বামী সংক্রান্ত এই নির্দেশ। বাগ্‌দানের পরে প্রকৃত বিবাহ (সপ্তপদী গমন) না হওয়া পর্যন্ত ভাবী স্বামীর মৃত্যু ইত্যাদিতে বাগ্‌দত্তার অন্য পাত্রের সহিত বিবাহে বাধা নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এরূপ ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করেছেন।

মনু বিধবা নারীর তরফে দেবর-বিবাহ সমর্থন করেন নাই, যদিও সন্তানার্থে নিয়োগপ্রথাকে একস্থলে অনুমোদন করেছেন। তাঁর মতে যদি বিধবা ও দেবর কামার্থে একসঙ্গে থাকে, তবে ঐ বিধবা দিধিষূ-রূপে গণ্যা হবে। পুনর্ভূ বা পুনর্বিবাহিতাও সমান নিন্দিত। মনু স্ত্রীলোকের তরফে পথে পর্যটন, অন্যপুরুষের গৃহে বাস, নিয়োগ প্রথা এবং বিধবাবিবাহকে নিন্দা করেছেন। তাঁর যথার্থ বক্তব্য হচ্ছে যে, কন্যার বিবাহ একবারমাত্রই হয় এবং স্ত্রীজাতির কোন স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না। স্ত্রীলোককে কুমারী-বয়সে পিতা, যৌবনে পতি এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে। (৩।১৭৩, ১৮১; ৯।৩, ৪৭, ৬৫)

মনু বাগ্‌দত্তার ক্ষেত্রে ভাবী পতির মৃত্যুতে দেবরের সহিত পুত্রোৎপত্তি-কাল পর্যন্ত সংসর্গ বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী তাঁর বিবেচনায় নিয়ত জীবন যাপন করবে, জীবিকার অভাব হলে শিল্পকর্ম দ্বারা প্রাণ ধারণ করবে। অর্থাৎ, তার পুনর্বিবাহের কথাই ওঠে না। (মনু ৯.৬৯-৭৫)

নারীর তরফ থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ (divorce) ও পুনর্বিবাহের (remarriage) অধিকার প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অনুমোদনের পাশাপাশি মনুর বক্তব্য রাখলে দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। প্রবাসী স্বামীর

ক্ষেত্রে স্ত্রীর পুনর্বিবাহ যেন কৌটিল্যের অভিলষিত, যেহেতু ঋতুকালের উপরোধ তাঁর মতে ধর্মহানি, এতে সন্তান উৎপাদন ব্যাহত হয়। একই ক্ষেত্রে মনু বিপরীত বিধান দিয়েছেন। এর কারণ বোধ হয় এই যে কৌটিল্যের অভিমতগুলি অনেকটা বাস্তবানুগ। তিনি তাঁর সমকালীন সামাজিক হালচালকে অনুমোদন জানিয়েছেন মাত্র; কিন্তু মনু স্ত্রীলোকের অধিকার সঙ্কোচের পক্ষপাতী, তিনি ক্রমবর্ধমান পুরুষ-প্রাধান্যের প্রবক্তা, তিনি যেন তাঁর সময়ে প্রচলিত নিয়োগ-ব্যবস্থার, বিধবাবিবাহের ব্যবস্থার বা বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতিহীন।

আধুনিক কালে হিন্দুসমাজে শর্তাধীন বিচ্ছেদ অধিকার ও পুনর্বিবাহে অধিকার নারী ও পুরুষের উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বীকৃতি পেয়েছে। মুসলিম সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়ক শপথ তলাকরূপে পরিচিত এবং বিধবাবিবাহ বা নিকা প্রথা প্রচলিত।

(ঙ) নিষ্পতন

সেকালে স্ত্রীর তরফে পতিগৃহ ত্যাগ নিষ্পতনরূপে কথিত হত। এরূপ আচরণ আইনত দণ্ডনীয় ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে এজাতীয় দণ্ডযোগ্য অপরাধের নমুনা প্রদর্শিত হচ্ছে:

(১) স্ত্রী যদি বিপদের কারণ অবিদ্যমানেও পতিগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্তা হয়, তাহলে দণ্ডনীয়া। যদি স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও নিষ্ক্রান্তা হয়, তাহলে দ্বিগুণ দণ্ডনীয়া।

(২) স্ত্রী যদি প্রতিবেশীর গৃহ অতিক্রম করে, তাহলে দণ্ডযোগ্যা।

(৩) বিপৎকাল ব্যতীত যদি প্রতিবেশীকে বা পরের ভার্যাকে গৃহে আশ্রয় দেয়, তাহলে দণ্ডের যোগ্যা। (৩।৪।১-৮)

(৪) পতিগৃহ ত্যাগ ক'রে যদি স্ত্রী গ্রামান্তরে গমন করে, তাহলে দণ্ডনীয়া এবং স্থাপ্যা ও আভরণ থেকে বঞ্চিতা হবে। স্থাপ্যা হচ্ছে বিবাহকালে প্রাপ্ত যৌতুক। ভরণপোষণ (ভর্মন্) আদায় বা তীর্থগমনের উদ্দেশ্য ব্যতীত যদি মেলামেশার যোগ্য পুরুষের সহিতও প্রস্থান করে, তাহলে তার দণ্ড ও ধর্মলোপ হবে। (৩।৪।১৬,১৭)

(পরপুরুষের সঙ্গে) স্ত্রী যদি পথে বা গূঢ়দেশে গমন করে, কিংবা মৈথুনের উদ্দেশ্যে সন্দেহযোগ্য বা নিষিদ্ধ পুরুষের সঙ্গে গমন করে, তাহলে ব্যভিচারের অপরাধ (সংগ্রহণ) হবে। (৩,৪ ২১; elopement)

কারও মৃত্যুর ঘটনা, ব্যাধি, বিপদ্ (ব্যসন) ও গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর তরফে জ্ঞাতিগৃহে গমন অপরাধ নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বাধাদানকারীই দণ্ডনীয়।

এক্ষেত্রে যদি স্ত্রী নিজেকে লুকিয়ে রাখে বা জ্ঞাতিরা তাকে লুকিয়ে রাখে, তবে তা অপরাধ-রূপে গণ্য হবে। (৩।৪।১৩-১৫)

নর্তক (তালাবচর), গায়ক (চারণ), জেলে (মৎস্যবন্ধক), শিকারী (লুব্ধক), গোয়ালা (গোপাল), শুঁড়ী (শৌণ্ডিক) নিজেদের স্ত্রীদের সহিত বিচরণ করে। এদের দলভুক্তা হয়ে কোন নারীর পথে গমন দূষণীয় নয়। (৩।৪.২২)

নিষেধ সত্ত্বেও যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে সঙ্গে নেয় বা কোন স্ত্রীলোক কোন পুরুষের অনুগমন করে, তাহলে ঐ পুরুষ বা রমণী দণ্ডিত হবে। (৩।৪।২৩)

সেকালে পত্নীর তরফে পতিগৃহত্যাগ কিংবা পরপুরুষের সঙ্গে বহির্গমন (elopement) অপরাধ রূপে গণ্য ছিল। এস্থলে স্ত্রীলোকের উপর স্বামীর নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আমাদের ধারণা হয়। স্বামীর নির্দেশকে স্ত্রী অমান্য করতে পারত না। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী বিদ্বেষিণীরা গৃহ থেকে যে নিষ্ক্রান্তা হত এবিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

(৫) অতীচার

স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ হচ্ছে অতীচার (transgression)। ঈদৃশ অতীচার কৌটিল্যের মতে দণ্ডনীয়। অতীচারের কয়েকটি নমুনা :—

(১) স্বামীকর্তৃক নিবারিতা হয়েও স্ত্রী যদি মদ্যপানে বা ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে,

(২) যদি স্ত্রী দিবাকালে স্ত্রীলোকের নাট্যানুষ্ঠান (প্রেক্ষা) বা আমোদ-প্রমোদ (বিহার) দেখতে গৃহের বাইরে গমন করে;

(৩) যদি পুরুষের নাট্যানুষ্ঠান বা আমোদ-প্রমোদ দেখতে গৃহের বাইরে গমন করে;

(৪) যদি রাত্রিকালে এরূপ উদ্দেশ্যে গৃহের বহির্দেশে গমন করে;

(৫) যদি স্ত্রী সুপ্ত বা মাতাল স্বামীকে রেখে গৃহের বাইরে গমন করে;

(৬) স্বামীর উপস্থিতিতে যদি স্ত্রী গৃহদ্বার খুলে না দেয়;

(৭) রাত্রিকালে যদি গৃহের বাইরে গমন (নিষ্কসন) করে;

(৮) যদি স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে মৈথুনার্থে ইঙ্গিত করে। (৩।৩।২০-২৫)

এরূপ অতীচার সম্ভবত ঘটত এবং দণ্ডের ব্যবস্থাও ছিল। এস্থলে স্বামীস্ত্রী-মূলক ক্ষুদ্র যুগ্ম পরিবারের চিত্র স্ফুট হচ্ছে :

(৬) ভর্ম

স্ত্রীর ভরণপোষণ হচ্ছে ভর্ম। যেস্থলে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব রয়েছে, সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে উপযুক্ত খাদ্য-বস্ত্র (গ্রাসাচ্ছাদন) দিতে হত। কিংবা আয় অনুসারে প্রয়োজনের অতিরিক্তও দিতে হত। [অর্থশাস্ত্র ৩।৩।৩]

স্বামী পুনর্বিবাহ করলে পূর্বস্ত্রী ক্ষতিপূরণ (আধিবেদনিক) পেত। স্ত্রী যদি স্বীয় শ্বশুরকুলে প্রবেশ করে কিংবা স্বতন্ত্রভাবে বাস করতে শুরু করে, তাহলে স্বামী ভরণপোষণ দিতে বাধ্য নয়। (৩।৩।৫, ৬)

কৌটিল্য-বর্ণিত সমাজে বহুক্ষেত্রে বোধ হয় শুধু স্বামী স্ত্রীর ক্ষুদ্র গৃহস্থালী ছিল। স্বামী ও স্বামীর পিতা একসঙ্গে বাস করত না। স্ত্রী হয়ত স্বামীর উপর কোন কারণে বিরক্ত হয়ে স্বামীর পিতার গৃহে আশ্রয় নিত অথবা স্বামীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে আলাদাভাবে বাস করত। বর্তমানকালে এধরণের ঘটনা হামেশাই ঘটছে, বিশেষত শহুরে আবেষ্টনীতে।

(৭) স্ত্রীধন

স্ত্রীর তরফে প্রাপ্ত বৃত্তি বা আবন্ধ্য হচ্ছে স্ত্রীধন। বিবাহের সময়ে স্ত্রী এক সঙ্গে দ্বিসহস্রের অধিক স্থাপ্যা বৃত্তি (endowment) পেত বা অলঙ্কার (আবন্ধ্য) পেত। স্বামী যদি বিদেশে গমন করে এবং স্ত্রীর ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা না করে, সেক্ষেত্রে নিজের বা পুত্রের বা পুত্রবধূর ভরণপোষণের জন্য স্ত্রীধন ব্যয় করা চলে। ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, ধর্মকার্য প্রভৃতিতে এই স্ত্রীধন থেকে স্বামীও ব্যয় করতে পারে।

চার প্রকার ধর্ম-বিবাহে এবং আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ বিবাহেও স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে বা বরপক্ষের কাছ থেকে স্ত্রীধন লাভ করত। [অর্থশাস্ত্র ৩।২।১৪-১৮]

স্বামীর মৃত্যুর পরে যদি স্ত্রী ধর্ম-জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে সে স্থাপ্যা, আভরণ এবং শুল্কের অপ্রাপ্ত অংশ লাভ করে। যদি পুনর্বিবাহ করে, তাহলে এই স্ত্রীধন সে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। [৩।২।১৯, ২০]

পঞ্চম প্রকরণ ঃ

গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে নারীর ভূমিকা

(১) গৃহস্থালী

বাৎস্যায়ন বর্ণিত একচারিণী-বৃত্ত প্রাচীন কালের সমৃদ্ধ গৃহস্থালীর একটি চমৎকার চিত্র। সপত্নী-হীনা স্ত্রী একচারিণী-রূপে গণ্য। তার নিকটে পতি দেবতুল্য। গৃহের সীমানার মধ্যে সে প্রায় সর্বময়ী কর্ত্রী।

শ্বশুর শাশুরী স্বামী বিদ্যমানে সাংসারিক আয় ব্যয়ের বাজেট করবার ভার একচারিণীর উপরে অর্পিত। বার্ষিক আয় হিসাব ক'রে সে ব্যয় নির্ধারিত করে, দৈনিক আয় ব্যয় একসঙ্গে মিলিয়ে দেখে। সম্ভবত হিসাব লিখে রাখে। [কামসূত্র ৪।১।৩১, ৩২]

সে গুরুজন, ননদ নন্দাই, ভৃত্যবর্গের সঙ্গে যথাযোগ্য আচরণ করে। শ্বশুর শাশুরীকে পরিচর্যা করে, তাঁদের অনুগত হয়ে থাকে, তাঁদের কথার প্রতিবাদ করে না, পরিমিত মৃদু আলাপ ও অনুচ্চ হাস্য তার বৈশিষ্ট্য।

ভোগের উপকরণ বাহুল্যে তার অভিমান হয় না। পরিজনের প্রতি সে দাক্ষিণ্য করে, স্বামীকে না জানিয়ে কিছু দান করে না। ভৃত্যজনকে নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে কেউ কাজে ফাঁকি না দেয়, আবার উৎসবাদিতে তাদের যোগ্য সমাদর করে। [৪।১।২৫,৩৭, ৩৮, ৩৯ ; ৪১]

স্বামীর মিত্রকে মাল্য, অনুলেপন (চন্দনাদি), তাম্বূল দ্বারা আপ্যায়ন করে। অর্থাৎ, একেবারে সে ঘরোয়া বধূ নয়। বাইরের পুরুষের সঙ্গে তার মেলামেশা নিষিদ্ধ নয়। (৪।১।৩৬)

স্বামীর পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্র সঞ্চয় করে, বিবিধ রঙের দ্বারা রঞ্জিত করে এবং এই সকল রঞ্জিত পুরাণো কাপড় দ্বারা পরিচারক বর্গ অনুগৃহীত হয়। (৪। ।৩৪)

সুরাকুম্ভ, আসবকুম্ভ গোপন স্থানে রাখে। এসব দ্রব্যের কালোপযোগিতা নির্ণয় করে। ক্রয়, বিক্রয়, আয়, ব্যয় পরিচালনা করে। নিজের গোপন ধনের (সার) কথা, স্বামীর গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করে না। (৪।১।৩০, ৩৫)

পারিবারিক কৃষি ও পশুপালন, ভৃত্যদের বেতন ও ভরণ তার এখ্‌তিয়ারের মধ্যে।

একচারিণী গোদুগ্ধ থেকে ঘৃত প্রস্তুত করে। তৈল ও গুড় প্রস্তুত করে। সুতা কাটে, কাপড় বোনে। বস্ত্রবয়ন, সূত্রকর্তন প্রাচীন ভারতীয় মহিলাদের বৃত্তি বা অবসর-বিনোদন-রূপে গণ্য ছিল। (৪।১ ৩৩)

একচারিণী বধূ খুব হিসাবী মহিলা। মৃৎপাত্র, বংশভাণ্ড (বিদলভাণ্ড), কাঠের পাত্র, ধাতুপাত্র, চর্মপাত্র বছরের বিশেষ সময়ে সস্তা হয়। তখন সেগুলি কিনে রাখে। লবণ (সৈন্ধবাদি), স্নেহ (ঘৃততৈলাদি), গন্ধদ্রব্য, কটুদ্রব্য, দুর্লভ ঔষধ গৃহে প্রচ্ছন্ন ক'রে রাখে। সরষে থেকে তৈল, ইক্ষু থেকে গুড় প্রস্তুত করে। শিকা (শিক্য), রজ্জু, পাশ (পশুবন্ধনের দড়ি), গাছের আঁশের সুতা (বল্কল) সংগ্রহ করে। ধান্য কুটন (কুট্টন), চাল কাঁড়ান (কণ্ডন) পর্যবেক্ষণ করে। ভাতের মাড় (মণ্ড), তুষ, ক্ষুদ (কণ), অঙ্গার উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে। মেষ, মোরগ (কুক্কুট), টিয়া (শুক, কোকিল, ময়ূর, মৃগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপাখীদের উপর নজর রাখে। সম্ভবত মোরগের মাংস গৃহস্থালীতে খাদ্য-রূপে গণ্য ছিল। (৪।১।২৭—৩৩)

শস্যের (ওষধি) বীজসংগ্রহ এবং বপন একচারিণীর দ্বারা পরিচালিত। মূলা (মূলক), আলু (আলুক), পালংশাক (পালঙ্কী), আমড়া (আম্রাতক), কাঁকুড় (এর্বারু), বেগুন (বার্তাক), কুমড়া (কুষ্মাণ্ড), লাউ (অলাবু), রসোন (লশুন), পেঁয়াজ (পলাণ্ডু), শশা (ত্রপুস), ওল (সূরণ) প্রভৃতি গৃহে উৎপাদিত হত। একধারে ফুলের বাগিচা থাকত, দেবতায়তন (ঠাকুরঘর) থাকত। সব্জি (শাক), ইক্ষু, জীরা (জীরক), সরষে (সর্ষপ), যোয়ান (অজমোদ), মৌরী (শতপুষ্পা) প্রভৃতির ক্ষেত থাকত আর একধারে। বৃক্ষবাটিকায় আমলক গাছ, মল্লিকা, জাতী, তগর, জপা প্রভৃতি গাছ রোপিত হত। উপবেশনের জন্য স্থণ্ডিল বা চত্বর নির্মিত হত। উদ্যানের মাঝখানে কূপ, সমচতুষ্কোণ পুকুর (বাপী), দীঘি (দীর্ঘিকা) খনিত হত। (৪।১।৩-৯, ২৯)

অভিগামিক বেশ (বেষ) স্বামীর কাছে যাওয়ার জন্য। এরূপ বেশের অন্তর্ভুক্ত বহু ভূষণ, বিবিধ ফুল, অনুলেপন, অঙ্গরাগ। বৈহারিক বেশ বহির্গমনের জন্য। এর অন্তর্গত হাল্কা পাতলা চিকণ বস্ত্র, পরিমিত আভরণ, সামান্য গন্ধদ্রব্য ও অনুলেপন, শাদা পুষ্প। (৪।১।২৪—২৫)

একচারিণী দন্তমল, স্বেদগন্ধ দূরীকরণে সচেষ্ট থাকত, যাতে স্বামীর বিরাগভাজন না হয়। দ্বারদেশে বা নির্জন স্থানে অবস্থান করত না।
(৪।১।২২, ২৩)

স্বামীর অনুমতি নিয়ে বরগৃহে, কন্যাগৃহে, যজ্ঞস্থলে, গোষ্ঠীতে, দেবস্থানে সখীদের সঙ্গে গমন করত। সকলপ্রকার ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করত। অর্থাৎ, একচারিণী স্ত্রীর অন্দরমহলের বাইরেও রীতিমত যাতায়াত ছিল।

সেকালের মেয়েরা ঘরে বন্দিনী হয়ে থাকত না, তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয় এই বর্ণনা থেকে। সম্ভবত ইসলামিক প্রভাবে পরবর্তীকালে হিন্দু নারীর গৃহে বন্দিনী হয়ে থাকার ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়। (৪।১।১৫ –১৬)

স্বামীর গৃহাগমনকালে অভ্যর্থনা, পাদপ্রক্ষালন, স্বামীর শয়নের পরে শয়ন, স্বামীর উত্থানের পূর্বে নিদ্রাত্যাগ, স্বামীর রুচি অনুসারে ভোজনদ্রব্য (পথ্য) রন্ধন, স্বামীর অপরাধেও মৃদু ভর্ৎসনা, রান্নাঘর (মহানস) রক্ষণাবেক্ষণ—এইসব হচ্ছে গৃহিণীর করণীয়। প্রয়োজনবশত স্বামীকে বিরলে বা বন্ধুজনের মধ্যে স্ত্রী মৃদু বাক্যদ্বারা সংশোধন করত। 'স্বামী অতিব্যয় বা অসদ্ব্যয় করলে গোপনে তাকে সমঝিয়ে দিত। বশীকরণের জন্য কখনও বৃক্ষমূল ব্যবহার করত না। (৪।১।১০–১৪, ১৭-২০)

স্বামী প্রবাসে গেলে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মে ব্যয় করত কর্মসূচী অনুসারে। (অর্থাৎ, সাংসারিক ও ধর্মীয় কাজকর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হত।) স্বামীর আরব্ধ কর্ম সমাপনের দিকে, ক্রয়বিক্রয়ে, পারিবারিক মূলধন (সার) বৃদ্ধির এবং খরচ হ্রাসের দিকে নজর রাখত, এবিষয়ে বিশ্বাসী পরিচারকদের পরামর্শ নিত। নায়কের অভিমত অনুসারে অর্থার্জনে যত্ন নিত। বিপৎকাল বা উৎসব-কাল ব্যতীত স্বীয় পিতৃগৃহে যেত না, স্বামীর পরিজনের সঙ্গে যেত এবং অধিককাল থাকত না। গুরুজনের সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করত। ইতি প্রবাসচর্যা।

এস্থলে প্রবাসীর ভার্যার তবকে অপেক্ষাকাল অন্তে পুনর্বিবাহের কোন কথাই নাই। (৪।১।৪৩ ৪৭)

একচারিণী-বৃত্ত থেকে সূচিত হয় একবিবাহকারী পরিবার (monogamous family)। যার সপত্নী নেই, সেই একচারিণী। পরিবারের চিত্রটি ঠিক শহুরে নয়, আবার গ্রাম্যও নয়। গৃহস্বামী সমাজের মধ্যস্তরের লোকরূপে প্রতিভাত হয়। গৃহস্থালী স্ত্রী শাসিত, যদিও স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞাধীন হয়ে থাকে। পিতৃ-আবাসিক (patrilocal) ব্যবস্থা। পরিবারটি নিছক স্বামী-স্ত্রী-মূলক নয়, ছোট আকারের extended family বা সংযুক্ত পরিবারের ধারণা সৃষ্টি করে। পরিবারের অন্তর্গত স্বামীর পিতামাতা ও স্বামী-স্ত্রী। ননদ-নন্দাই বোধ হয় পরিবারের সভ্য নয়, সাময়িক অতিথি মাত্র। ভৃত্যবর্গ ও পরিজন সমৃদ্ধির পরিচায়ক। গৃহস্থালীতে স্ত্রী কর্ত্রী, বাহিরে স্বামী কর্তা। শ্রমবিভাগ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বীকৃত।

কামসূত্রে সংযুক্ত পরিবারের চিত্র লক্ষিত হয় কন্যা-নির্বাচন সংক্রান্ত প্রকরণে। নির্বাচনযোগ্যা কন্যা "ধনবতি পক্ষবতি কুলে প্রসূতা" হবে। কন্যার কুল পক্ষযুক্ত, অর্থাৎ, জ্ঞাতি-যুক্ত হবে। কন্যার পরিবারে বহু সম্বন্ধী বা রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয় থাকা বাঞ্ছনীয়। এতাদৃশ কুল যে সংযুক্ত পরিবার এবিষয়ে সন্দেহ থাকে না। (৩।১।২)

দুইস্ত্রী বা বহুস্ত্রী বিবাহের ক্ষেত্রে সপত্নী বা সতীনেরা (co-wives) আবির্ভূত হত। জ্যেষ্ঠা বা বড় বউ, কনিষ্ঠা বা ছোট বউ, দুর্ভগা বা অনাদৃতা বউ-এর আচরণ বাৎস্যায়নের গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এদের মধ্যে ঈর্ষা-সম্পর্ক, প্রীতির সম্পর্কও চিহ্নিত হয়েছে। (রূপকথার রাজার সুয়োরাণী ও দুয়োরাণীর কথা; বৈদিক সাহিত্যে রাজার মহিষী বা পাটরাণী, বাবাতা বা প্রিয়তমা পত্নী, পরিবৃক্তা বা অবহেলিতা স্ত্রীর কথা জানা যায়।) কামসূত্রের জ্যেষ্ঠা-বৃত্ত থেকে জ্যেষ্ঠার জ্ঞাতিজনের কথা জানতে পারি। জ্ঞাতিজন কারা তা পরিষ্কার নয়,—সম্ভবত পিতা-মাতা, ভাই-ভ্রাতৃজায়া ইত্যাদি। এরূপ পরিবার নিছক দম্পতী-মূলক নয়, একালের conjugal family বা দম্পতী-মূলক পরিবারের সঙ্গে তুলনীয় নয়। (৪।২।৭)

সেকালের উচ্চবিত্ত অভিজাত মহলে অন্তঃপুর বহির্জীবন থেকে বিযুক্ত ছিল। (এই অন্তঃপুর বা অন্দরমহল ফার্সী জানানা, আরবী হারেম-এর সঙ্গে তুলনীয়। হারাম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ।) একচারিণী-বৃত্ত প্রসঙ্গে বর্ণিত গৃহস্থালীতে নারী অসূর্যম্পশ্যা নয়, তার বহির্জীবন আছে। এই গৃহস্থালীটি সমাজের মধ্যস্তরের আলেখ্য হওয়াই সম্ভব। একালের শহর অঞ্চলে সংযুক্ত গৃহস্থালী প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আবাসিক বা অর্থনৈতিক কারণবশত। এর পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রী-মূলক পরিবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহস্থালী গড়ে উঠছে, যেখানে বধূরা আর পর্দানশীন নয়, পরন্তু কোথাও কোথাও চাকরীজীবিনী বা বাহ্য বৃত্তিতে নিযুক্তা। ক্ষেত্রবিশেষে গৃহকর্ম স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভক্ত, স্বামীর পূর্বাহ্ণিক ভাতরাঁধা ও স্ত্রীর সায়ংকালীন ভাতরাঁধার দৃশ্যও চোখে পড়ে। এরূপ পরিবারের ঝোঁক স্বামীর জ্ঞাতিদের চেয়ে স্ত্রীর জ্ঞাতিদের সঙ্গে অধিক সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখবার দিকে।

(২) জীবিকাবতীদের বৃত্তান্ত।

সেকালে মেয়েদের মধ্যে সম্ভবত গণিকারাই সর্বাধিক স্বাধীনতা ভোগ করত, কেননা জীবিকার জন্য তার পরমুখাপেক্ষিতা ছিল না এবং তার চাল-চলন অনেকখানি বন্ধনমুক্ত ছিল। সেকালে নারীসমাজের একটা অংশে চাকুরিয়া এবং স্বাধীন বৃত্তি জীবিনীদের সাক্ষাৎ মিলত।

একধরণের স্ত্রীলোক রঙ্গোপজীবিনী-রূপে পরিচিতা ছিল। তারা মঞ্চাভিনয়কে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করত।

সুতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন মেয়েদের কাজ-রূপে পরিচিত ছিল। পশম (ঊর্ণা), গাছের আঁশ (বল্ক), কার্পাস, তূল, শণ, ক্ষৌম (flax) ইত্যাদি

জাত বিভিন্ন প্রকার সূত্র প্রস্তুতকরণে বহু মেয়ে অংশ গ্রহণ করত। এদের মধ্যে ছিল বিধবা, পঙ্গু স্ত্রীলোক (ন্যঙ্গা), সন্ন্যাসিনী (প্রব্রজিতা), রূপাজীবার মাতা, বৃদ্ধা রাজদাসী, মন্দিরের কাজ থেকে বিযুক্তা দেবদাসী। সরকারী সূত্রশালা থেকে সুতা কাটার জন্য নিযুক্তা হত ঘরোয়া মেয়ে (যে গৃহের বাহির হয় না), প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী, ন্যঙ্গা, কন্যা, বিধবা ইত্যাদি। [অর্থশাস্ত্র ২।২৩.২, ১১]

স্বাধীন জীবিকাবতী (ছন্দবাসিনী) কিছু সংখ্যক বিধবা ছিল। সম্ভবত তারা জ্ঞাতিজনের সূত্রে খোরপোষ পেত না। (৩।২০।১৬)

কিছু কিছু "শিল্পবতী" স্ত্রীলোক ছিল। কিছু কিছু মেয়ে ছিল ক্রয়-বিক্রয়কারিণী। তারা পণ্যের কেনাবেচার দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। এদের ভিতরেই সম্ভবত স্বাধীন বিচরণ-শালিনী (অটন্তী) স্ত্রীলোক দেখা যেত। [অর্থশাস্ত্র ১।১২।২০ ; কামসূত্র ৫।৪।৯, ১০]

কোন কোন মেয়ে পতিবিয়োগের পরে চৌষট্টি কলার দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করত। (কামসূত্র ১।৩।২০)

রাজার অন্তঃপুরে মহিলারা নিযুক্তা হত। যথা, সূতিকাগারে (গর্ভসংস্থা) নিযুক্তা স্ত্রীলোক, অন্তঃপুরবাসিনীদের দৈহিক শুচিতা পরীক্ষণে নিযুক্তা স্ত্রীলোক, রাজার অন্তঃপুরের পরিচালিকা (মহত্তরিকা), পরিচারিকা, দাসী (চেটিকা) প্রভৃতি উল্লিখিত হতে পারে। অন্তঃপুরের পরিচালক ছিল কঞ্চুকী (বয়স্ক ব্রাহ্মণ) এবং পরিচালিকা ছিল মহত্তরিকা। এক কক্ষে পুনর্ভূ রমণীরা থাকত। এক কক্ষে থাকত বেশ্যারা। একটি কক্ষ ছিল নাটকীয়া বা অভিনেত্রীদের জন্য। দেবীর সংখ্যা ছিল একাধিক। যে দেবীর ঋতুকাল উপস্থিত হয়েছে, সে বাসকের (রাজার সহিত সহবাসের) অধিকারিণী। বাসক পরিচালনা করত বাসকপালী নামে মহিলা কর্মচারী। [অর্থশাস্ত্র ৪।২০।১৯, ২১ ; কামসূত্র ৩।২ ৫৬-৬৬ ; ৫।৫।২২]

মন্ত্রীর (মহামাত্রের) শুচিতা পরীক্ষায় নিযুক্তা হত পরিব্রাজিকা-রূপিণী স্ত্রীলোক গুপ্তচর। শিল্পকারিকা বা শিল্পবতী গুপ্তচর বৃত্তিতে নিযুক্তা হত। রূপাজীবা যোগস্ত্রীও হচ্ছে নারী গুপ্তচর। [অর্থশাস্ত্র ১।১০।৭; ১।২।১৩, ২১ ; ১১।১।৪২]

ভিক্ষুকী, শ্রমণা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী), ক্ষপণা (জৈন সন্ন্যাসিনী), মূলকারিকা, অর্থাৎ, বশীকরণের উপায়ে অভিজ্ঞা স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে বিচরণ করত। ভিক্ষুকী, ক্ষপণিকা, তাপসীদের ভবনে নায়ক-নায়িকার মিলনের সুযোগ ঘটত। এক প্রকার গোষ্ঠীযোজিনী স্ত্রীলোক ছিল, যারা স্বাধীনভাবে গোষ্ঠীতে যোগদান করত। কুশীলব, অর্থাৎ, নট, নর্তকের ভার্যাও স্বাধীন বিচরণ-শীলা ছিল। [কামসূত্র ৬।১।৯ ; ৫।১।৫৩ ; ৫।৪।৪৩]

ষষ্ঠ প্রকরণঃ

আর্য পরিবারে পুত্রের স্থান

(১) পুত্রের প্রকারভেদ

বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। তালিকাগুলি হুবহু অভিন্ন নয়। বহুলাংশে মিল আছে, সামান্য অমিল আছে। তালিকাগুলিতে প্রতিভাত হয় যে সেকালে সামাজিক স্বীকৃতি-প্রাপ্ত পুত্রেরা ছিল তিন শ্রেণীভুক্ত। যথা,—(ক) নিজের দ্বারা উৎপাদিত পুত্র, (খ) পরের দ্বারা উৎপাদিত পুত্র, যার উপর নিজের দাবি রয়েছে, (গ) কৃত্রিম তনয় (adopted sons)।

নিজের দ্বারা উৎপাদিত পুত্র :—(১) ঔরস, নিজের ক্ষেত্রে বা পত্নীতে নিজের দ্বারা উৎপন্ন; (২) পৌনর্ভব, পুনর্ভূ রমণীতে নিজের দ্বারা উৎপন্ন; (৩) যত্র ক্বচন উৎপাদিতঃ, অর্থাৎ, যে কোন রমণীতে নিজের দ্বারা উৎপন্ন; [বিষ্ণু সং ১৫/১-২ ; ৭-৯ , ২৭];

(৪) শৌদ্র বা শূদ্রাপুত্র, অর্থাৎ, শূদ্রা পত্নীতে বা উপপত্নীতে নিজের দ্বারা উৎপন্ন। (মনু ৯।১৬০)।

পরের দ্বারা নিজের পত্নীতে উৎপাদিত পুত্র :—(১) ক্ষেত্রজ, অর্থাৎ, নিজের দ্বারা নিযুক্ত বা অন্য অভিভাবক দ্বারা নিযুক্ত পরপুরুষ কর্তৃক নিজের পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র; (২) কানীন, অর্থাৎ, বিবাহের পূর্বে নিজের স্ত্রীর কুমারী অবস্থায় জাত পুত্র, যে নিজের দ্বারা উৎপন্ন না হলেও যার উপর নিজের দাবি রয়েছে;

(৩) গূঢ়োৎপন্ন বা গূঢ়জ, অর্থাৎ, বিবাহের পরে নিজের স্ত্রীতে কোন অচেনা পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র, যার উপর নিজের দাবি রয়েছে,

(৪) সহোঢ়, অর্থাৎ, পর-সংসর্গে গর্ভবতী অবস্থায় বিবাহিতার পুত্র, যার উপর নিজের দাবি রয়েছে। (স্বামী জেনে বা না জেনে গর্ভবতীকে বিবাহ করেছে। এরূপ গর্ভজাত সন্তান পরের দ্বারা উৎপাদিত হলেও এর উপর পরিণেতার দাবি অগ্রগণ্য।) [বিষ্ণু সং ১৫/৩ ; ১০-১৭]

পুত্রিকা-পুত্র বা নিজের একমাত্র ভ্রাতৃহীনা কন্যাতে জামাতার দ্বারা উৎপন্ন পুত্র বিবাহকালীন শর্ত অনুসারে নিজের পুত্ররূপেই বিবেচিত হয়। (বিষ্ণু সং ১৫/৪-৬)

পুত্রিকা-পুত্র বস্তুত দৌহিত্র হলেও সাধারণ দৌহিত্র থেকে তাকে তফাৎ করা হত।

কৃত্রিম তনয়ের তালিকা :—

(১) দত্তক ;
(২) ক্রীত ;
(৩) স্বয়ম্ উপগত বা স্বয়ং দত্ত ;
(৪) অপবিদ্ধ ;
(৫) কৃত্রিম বা কৃতক।

কৌটিল্য কৃতক পুত্রের কথা বলেছেন। তাঁর মতে ক্ষেত্রজ পুত্র হচ্ছে দ্বিপিতৃক এবং দ্বিগোত্র। জনক পিতা (বীজী পিতা) এবং সামাজিক পিতা (ক্ষেত্রী পিতা) উভয়েই তার উপর দাবি করতে পারে। সে জনক পিতার গোত্রে এবং সামাজিক পিতার গোত্রে অন্তর্ভুক্ত। (অর্থশাস্ত্র ৩।৭।৬, ৭, ১৭)

প্রচলিত ধারণা অনুসারে কলিকালে ঔরস, দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের সামাজিক স্বীকৃতি থাকা সঙ্গত। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে পূর্বকালে যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বকালে সামাজিক পিতৃত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হত এবং পুত্র অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। পুত্রের জন্মদাতা যে কেউ হোক না কেন, তাকে সামাজিক পিতা গ্রহণ করতে কুন্ঠিত হত না। স্বামী নিজেই পরের দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করাত। পরের দ্বারা উৎপন্ন গূঢ়জ, সহোঢ় ও কানীন পুত্রকেও স্বীকৃতি দিত, যদিও এরূপ ক্ষেত্রে নিজের অনুমোদন সহকারে পুত্র উৎপন্ন হয়নি। প্রয়োজনমতো পুত্রিকাপুত্রকে, অর্থাৎ, দৌহিত্রকেও নিজ পুত্ররূপে অঙ্গীকার করত। পরবর্তীকালে সতীত্বের (chastity) ধারণা বদলেছে এবং পরপুরুষের সংসর্গ-কারিণী স্ত্রী পতিতা এই ধারণা বিকশিত হয়েছে। এর ফলে জারজ পুত্রমাত্রই পরিত্যাজ্যরূপে বিবেচিত হয়েছে। পূর্বকালীন ধারণায় সাময়িক যৌন সংসর্গ দ্বারা সতীত্বভ্রংশের প্রশ্ন উঠত না, যদিও সহমরণ ও অনুমরণের দৃষ্টান্তও (সতী প্রথা) ছিল। পরাশর বিধবার ব্রহ্মচর্য পালনকে প্রশংসা করেছেন (৪।২৭)। বিষ্ণু বলেছেন,—মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্যং তদন্বারোহণং বা (২৫/১৪)। অর্থাৎ, বিধবার ব্রহ্মচর্য কিংবা স্বামীর চিতায় অনুমরণ বা সহমরণ পালনীয়। অনুমরণ প্রথা প্রাচীন ভারতে ছিল এবং প্রাগৈতিহাসিক কালে ইউরোপেও ছিল। পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে তদীয় পত্নী মাদ্রী অনুমরণ বরণ করেন। (মহা ১/১২৫/২৯-৩১)। ঋগ্বেদীয় দুইটি মন্ত্রে অনুমরণের এবং বিধবাবিবাহের বা নিয়োগের আভাস পাওয়া যায়। মৃত পতির নিকটে শয়ানা পত্নীকে গাত্রোত্থান করতে এবং মনোমত পতি লাভ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

[ঋ ১০।১৮।৭, ৮। অথর্ব ১৮।৩।১, ২। দ্রষ্টব্য বিধবা বিবাহ, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত কলিকালের পুত্রসংখ্যা সূচক পরাশরের ৪।১৯ বচনের ব্যাখ্যা ; Social Evolution, G. Childe, 1963, p. 84.]

(২) কৃত্রিম তনয় প্রথা

কৃত্রিম তনয় প্রথা (adoption) অতি প্রাচীনকাল থেকে আর্য সমাজে প্রচলিত ছিল বলে অনুমান হয়। বৈদিক, গ্রীক ও রোমীয় সমাজে এই প্রথার অস্তিত্ব বিষয়ে নজীর পাওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের সমাজে দত্তক প্রথার বহু নিদর্শন রয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে প্রদত্ত পুত্র-তালিকায় কয়েক প্রকার কৃত্রিম তনয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথা,—

(১) দত্তক পুত্র। মাতা পিতা-কর্তৃক প্রদত্ত। —বিষ্ণু সং ১৫।১৮,১৯।

(২) ক্রীত পুত্র। ক্রেতার পুত্ররূপে গণ্য। —বিষ্ণু সং ১৫।২০, ২১।

(৩) স্বয়ম্ উপগত পুত্র। যে নিজেই কারও পুত্র-রূপে স্বীকৃত হতে ইচ্ছুক। (তুলনীয় একালের ধর্ম-বাপের ছেলে।)
— বিষ্ণু সং ১৫.২২, ২৩।

(৪) অপবিদ্ধ পুত্র। পিতা মাতার দ্বারা পরিত্যক্ত এবং কারও দ্বারা গৃহীত। —বিষ্ণু সং ১৫।২৪-২৬।

(৫) স্বয়ংদত্ত। যে নিজেই নিজেকে দান করেছে। উল্লিখিত ৩নং পুত্রের সজাতীয়। গৌতম ২৯ অ।

(৬) কৃত্রিম পুত্র। গ্রহীতা যাকে পুত্রত্বে বরণ করেছে এবং যে গ্রহীতার সজাতীয়। — মনু ৯।১৬৯।

বর্তমান কালে ১নং, ৩নং এবং ৬নং পুত্রের দৃষ্টান্ত সমধিক। অপবিদ্ধ পুত্র কখনও কখনও দৃষ্টিগোচর হয় বটে, তবে পরিত্যক্ত সন্তানের চিরপরিচিত স্থানটি অনাথাশ্রম। ক্রীত পুত্রের উদাহরণ লোক-গোচর নয়। অপহৃত বালক বালিকাকে বিক্রয়ের ঘটনা অবশ্য ঘটে।

প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীতে সামাজিক পিতা (ক্ষেত্রী পিতা) ও জন্মদাতা পিতা (বীজী পিতা) সর্বদা একব্যক্তি হত না। কৃত্রিম তনয়দের গ্রহীতা তাদের সামাজিক পিতা, জন্মদাতা পিতা নয়।

একালে প্রকাশ্যত নিয়োগ প্রথা নেই, ক্ষেত্রজ পুত্রও নেই। তবে দত্তক প্রথা রয়েছে, সুতরাং সামাজিক পিতা ও জন্মদাতা পিতার পার্থক্য একেবারে উঠে যায়নি।

কৃত্রিম তনয় প্রথার ফলে কুলগত বিশুদ্ধি নষ্ট হয়। একরক্তে বিশ্বাস

বা আদিপিতা থেকে বংশোৎপত্তির জনশ্রুতি যে অনেকাংশে কল্পিত তা পরিস্ফুট হয় এই প্রথার ভিতর দিয়ে।

দায়বিভাগের ব্যাপারে স্মৃতিকর্তারা একমত নন। মনুর মতানুসারে ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রই পৈত্রিক ঋক্‌থের অধিকারী। এই দুই প্রকার পুত্রের অভাবে দত্ত পুত্র, দত্তপুত্রের অভাবে কৃত্রিম পুত্র, কৃত্রিম পুত্রের অভাবে গূঢ়োৎপন্ন (গূঢ়জ) পুত্র, গূঢ়োৎপন্নের অভাবে অপবিদ্ধ পুত্র, অপবিদ্ধের অভাবে কানীন পুত্র, কানীনের অভাবে সহোঢ় পুত্র, সহোঢ়ের অভাবে ক্রীত পুত্র, ক্রীত পুত্রের অভাবে পৌনর্ভব পুত্র, পৌনর্ভবের অভাবে স্বয়ংদত্ত পুত্র, স্বয়ংদত্তের অভাবে শূদ্রাপুত্র উত্তরাধিকারী হতে পারে। (মনু ৯।১৬৫)

(৬) পুত্রিকা প্রথা

মনুসংহিতায় পুত্রিকা প্রথা বিবৃত হয়েছে। যার ভাই নেই এমন কন্যাকে বিবাহ করতে মনু নিষেধ করেছেন, যেহেতু এরূপ কন্যা হয়ত পুত্রিকা রূপে ধার্য হয়েছে। পুত্রিকা পিতৃগৃহেই অবস্থান করে, স্বামীর ঘর করে না। এই দিক দিয়ে পুত্রিকাপুত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে একটা পার্থক্য পরিস্ফুট হয়েছে। পুত্রিকাপুত্রের উপর মাতামহের দাবি অগ্রগণ্য, কিন্তু দৌহিত্রের উপর সেরূপ দাবি নেই। (মনু ৩।১১)

একটি মনু বচনে প্রতিভাত হয় যে আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্রাতা-বিহীন কন্যাকে পুত্রিকারূপে ঘোষণা করা হত, আর একপ্রকার অঘোষিতা পুত্রিকা ছিল। উভয়প্রকার পুত্রিকার পুত্র মাতামহের পৌত্র-রূপে গণ্য। এই পুত্রিকা-পুত্র মাতামহকে পিণ্ডদানের অধিকারী এবং মাতামহের ধনাধিকারী। (মনু ৯।১৩৬)

বিষ্ণু সংহিতায় দ্বাদশ-বিধ পুত্রের তালিকায় তৃতীয় স্থানে পুত্রিকা-পুত্র উল্লিখিত হয়েছে। "এই কন্যার পুত্র আমার পুত্র রূপে গণ্য হবে"—এরূপ শর্ত (contract) সহ যে কন্যার বিবাহ হয় সে পুত্রিকা। (অর্থাৎ, পুত্রিকার পুত্র মাতামহেরই পুত্র।) পুত্রিকা-বিধির দ্বারা অপ্রতিপাদিতা ভ্রাতাবিহীনা কন্যাও পুত্রিকা। এস্থলে প্রতীত হচ্ছে যে পুত্রিকা ঘোষিতা হত কিংবা অঘোষিতা হত। (বিষ্ণু সং ১৫।৪—৬)

গৌতমের মতে পুত্রিকাপুত্র মাতামহের গোত্র লাভ করে। অপুত্রক পিতা পূর্বেই ঘোষণা করে যে পুত্রিকার গর্ভজাত পুত্র তারই পুত্র হবে। কোথাও কোথাও ঘোষণা থাকে না, শুধু অভিসন্ধি থাকে। উভয়ক্ষেত্রেই পুত্রিকাপুত্র মাতামহেরই পুত্র। (২৯ অ)

বসিষ্ঠের মতেও পুত্রিকা-পুত্র মাতামহেরই পুত্র। পূর্বকৃত চুক্তির সাহায্যে মাতামহ পুত্রিকাপুত্রকে দাবি করতে পারেন। (১৭ অ)

পুত্রিকা পিতৃগৃহেই অবস্থান করত বিবাহের পরে। সম্ভবত তার স্বামী মাঝে মাঝে তাকে পরিদর্শন করত। Visiting marriage বা পরিদর্শন ঘটিত বিবাহ প্রথা এক্ষেত্রে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। পুত্রিকা-পুত্র মাতার সঙ্গে মাতামহের গৃহে থাকত, জনয়িতা পিতার গৃহে যেত না। এরূপ ব্যবস্থা মাতৃ-আবাসিক রীতির (matrilocy) সজাতীয়।

অর্জুনের অন্যতমা পত্নী চিত্রাঙ্গদা মণিপুররাজের পুত্রিকা-রূপে গণ্যা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অর্জুন তিন বৎসর-কাল অতিবাহিত করেন এবং পুত্রের জন্ম হলে মণিপুর পরিত্যাগ করেন। অর্জুন ঠিক গৃহজামাতার মতো মণিপুররাজের গৃহে স্থায়িভাবে অবস্থান করেন নাই। (মহা ১।৮১৫)

বাংলাদেশের ঘরজামাই প্রথা কতক পরিমাণে পুত্রিকা প্রথার সঙ্গে তুলনীয়। যাঁর একটিমাত্র সন্তান এবং তাও কন্যাসন্তান, তিনি ঘরজামাই রাখেন। গৃহজামাতা বিবাহের পর থেকে শ্বশুরালয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়। তার পুত্রকন্যা মাতামহের গৃহে থাকে মাতৃ-আবাসিক রীতিতে (matrilocy)। ঘরজামাইয়ের সন্তান মাতামহের সন্তান-রূপে অবশ্য গণ্য হয় না। প্রাচীনকালের পুত্রিকাপ্রথার অবিকল নকল নয় ঘর-জামাই প্রথা।

(৪) নিয়োগ প্রথা

নিয়োগ প্রথা প্রাচীন আর্য সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। কারও কারও মতে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলিতে, অর্থাৎ, গ্রীক, রোমীয়, জার্মান ও স্কান্ডিনেভীয়দের মধ্যে নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল। নিয়োগের অর্থ পুত্র লাভের উদ্দেশ্যে অভিভাবক দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত বিধবার সাময়িক যৌন সম্পর্ক স্থাপন। সাধারণ রীতি হচ্ছে মৃতস্বামীর সহোদরকে, তার অভাবে সপিণ্ড জ্ঞাতিকে নিয়োগ। মনুর মতে একটি পুত্র উৎপাদনের পরেই নিয়োগের মেয়াদ শেষ হওয়া উচিত, কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানের জন্য নিয়োগের কথাও কেউ কেউ বলেছেন। (মনু ৯।৫৯, ৬০)

গৌতম-সংহিতা অনুসারে বিধবা স্ত্রী পুত্রের জন্য নিয়োগের আশ্রয় নিতে পারে। দেবরকে, দেবরের অভাবে সপিণ্ড জ্ঞাতিকে, সপিণ্ডের অভাবে সগোত্রকে, সগোত্রের অভাবে সমান প্রবর পুরুষকে নিয়োগের বিধান গৌতম দিয়েছেন। একমতে দেবর ব্যতীত আর কাউকে নিয়োগ করা চলবে না। নিয়োগের দ্বারা দুটির বেশি সন্তান উৎপাদন চলবে না। পূর্বকৃত শর্ত (সময়) না থাকলে উৎপন্ন পুত্রের মালিক হবে জনক পিতা। যদি স্বামীর জীবিতকালে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়, তাহলে স্বামীরই দখল থাকবে পুত্রের উপর। অথবা ক্ষেত্রবিশেষে স্বামীর ও নিযুক্ত পুরুষের উভয়েরই দাবি থাকবে পুত্রের উপর। (১৮ অ)

মহাভারতের দৃষ্টান্তগুলিতে প্রতীত হয় যে (১) বিধবা ও সধবা উভয় প্রকার পত্নীতেই সন্তানের জন্য কাউকে নিযুক্ত করা হত। (২) নিযুক্ত পুরুষ সর্বত্র স্বামীর জ্ঞাতি নয়। (৩) কোন কোন সময়ে গুরুর পত্নীতে শিষ্য নিযুক্ত হত। (৪) ক্ষত্রিয় রাজার পত্নীতে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হত। নিয়োগের কতিপয় দৃষ্টান্ত :—

(ক) ভীষ্মের উক্তি অনুসারে পরশুরাম কর্তৃক একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হলে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়া রমণীতে নিযুক্ত হয়ে পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। – মহা ১।১০৪।১-৬।

(খ) বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পরে তাঁর দুই পত্নীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্মের নিয়োগ প্রস্তাবিত হয়েছে সত্যবতীর তরফ থেকে। ভীষ্ম বিমাতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। — মহা ১।১০৩।

এস্থলে প্রতিভাত হয় যে স্বামীর বড় ভাইকেও নিয়োগ করার রীতি ছিল।

উক্ত দুই পত্নীতে ব্যাস নিযুক্ত হন। ব্যাস হচ্ছেন সত্যবতীর কানীন পুত্র, অর্থাৎ, বিচিত্রবীর্যের বড় ভাই। এই নিয়োগের ফলে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। —মহা ১।১০৬।

(গ) পাণ্ডুর অনুমতিতে তার দুই পত্নী, কুন্তী ও মাদ্রী জ্ঞাতি-বহির্ভূত পুরুষদের সহিত (তথাকথিত দেবতাদের সহিত) সঙ্গতা হন। এর ফলে পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হয়।

নিয়োগ প্রথায় কুন্তী তিনটির অধিক পুত্র উৎপাদন করতে রাজী হননি। —১।১২৩, ১২৭।

(ঘ) অনুবংশীয় রাজা বলির পত্নী সুদেষ্ণাতে দীর্ঘতমা নিযুক্ত হন। এই নিয়োগ স্বামীর অনুমোদিত। বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৮।১ ; মহা ১।১০৪।৪১—৫৩।

(ঙ) রাজা সৌদাসের পত্নীতে বশিষ্ঠ পুত্র উৎপাদন করেন। এই নিয়োগ স্বামীর অনুমোদিত। বিষ্ণুপুরাণ ৪।৪।১৯, ৩৮ ; মহা ১।১৭৭।৪২-৪৫।

(চ) উদ্দালক স্বীয় পত্নীতে শিষ্যকে নিয়োগ করেন। এর ফলে শ্বেতকেতুর জন্ম হয়। —মহা ১২।৩৪।২২।

নিয়োগজাত পুত্র হচ্ছে ক্ষেত্রজ পুত্র। স্বামী ক্ষেত্রী, অর্থাৎ, ক্ষেত্রের মালিক। স্ত্রী ক্ষেত্র। উৎপাদক পিতা বীজী। ক্ষেত্রী পিতাই সামাজিক পিতা (social father)। বীজী পিতা (biological father) সাধারণত ক্ষেত্রজ পুত্রের উপর দাবি রাখত না।

অনেকের মতে নিয়োগ প্রথার মূলে রয়েছে দেবর-বিবাহ প্রথা। আবার, দেবর-বিবাহ প্রথার উৎস ভ্রাতৃমূলক বহুপতিত্ব। বস্তুতপক্ষে প্রাচীন আর্য

সমাজে বহুপতিত্বের দৃষ্টান্ত বিরল, কিন্তু নিয়োগের দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

(৫) ক্ষেত্র ও বীজ

স্মার্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে স্ত্রীলোক ক্ষেত্রসদৃশ। স্বামী হচ্ছে ক্ষেত্রের মালিক বা ক্ষেত্রী। ক্ষেত্রের উপর তারই অধিকার। যার বীজ থেকে সন্তান উৎপাদিত হয় সে বীজী। নিয়োগজাত সন্তানকে বলা হয় ক্ষেত্রজ। ক্ষেত্রজ পুত্রের দুই পিতা, ক্ষেত্রী পিতা ও বীজী পিতা। যেখানে ক্ষেত্রী ও বীজী একই ব্যক্তি, সেখানে একই পিতা বর্তমান; দুই পিতা বা দুই গোত্রের প্রশ্ন ওঠে না, যেমন, ঔরস পুত্রের বেলায়। কানীন, ক্ষেত্রজ, গূঢ়জ ও সহোঢ় পুত্রদের দুই পিতা—ক্ষেত্রী এবং বীজী। ক্ষেত্রী সামাজিক পিতা (social father)। বীজী জন্মদাতা পিতা (biological father)। আদিম কৌম-গুলিতে জন্মদাতার পিতৃত্বের বা জৈব পিতৃত্বের পরিবর্তে সামাজিক পিতৃত্বকেই বিবেচনা করা হয়। তাই প্রাক্-বিবাহ বা বিবাহোত্তর স্বেচ্ছাচারের স্থলেও স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। সামাজিক পিতাই পিতা-রূপে গণ্য হয়। প্রাচীন আর্য দৃষ্টিভঙ্গীও কতকটা এই ধরণের। আর্যেরা সন্তানের উৎপাদনে বীজ ও ক্ষেত্রের ভূমিকা জানতেন, কিন্তু আদিম সমাজে বহুস্থলে বীজের ভূমিকা অজ্ঞাত। আর্য সমাজে ক্ষেত্রী ও বীজী পৃথকীকৃত হয়েছে, সন্তানের মালিকানা নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে। যেখানে ক্ষেত্রী ও বীজী একব্যক্তি নয়, সেখানে সন্তানকে কার সন্তান বলা হবে? ক্ষেত্রীর না বীজীর? সাধারণত ক্ষেত্রীই সন্তানের পিতা রূপে গণ্য হত।

বিষ্ণুর মতে কানীন, গূঢ়জ ও সহোঢ় পুত্রের মালিক পাণিগ্রহীতাই।

(১৫।১০-১৭)

বশিষ্ঠের মতে কানীন পুত্র হচ্ছে মাতামহের পুত্র। সে মাতামহকে পিণ্ড দান করবে এবং তাঁর ধনভাগী হবে। (১৭ অ)

মনু বলেছেন,—

(১) পরক্ষেত্রে (পরস্ত্রীতে) বীজ বপন করলে তার ফল (পুত্র) ক্ষেত্রীর প্রাপ্য, বীজীর প্রাপ্য নয়।

(২) যদি পূর্বকৃত শর্ত থাকে, তাহলে ফল (পুত্র) বীজী ও ক্ষেত্রীর উভয়েরই প্রাপ্য। (৯।৫১, ৫৩)

আচার্যদের মতে পরস্ত্রীতে উপ্ত বীজ থেকে উৎপন্ন পুত্র ক্ষেত্রীরই পুত্র-রূপে গণ্য হয়। কেউ কেউ আবার বলেন যে মাতা ভস্ত্রা বা চর্ম-নির্মিত আধার-তুল্য, সুতরাং যার বীজ তারই অপত্য। কৌটিল্যের মতে ক্ষেত্রী ও বীজীর উভয়েরই অধিকার সন্তানের উপর রয়েছে। (অর্থশাস্ত্র ৩।৭।১-৩)

বস্তুত পক্ষে বীজী পিতা একেবারে উপেক্ষিত হত না। পাণ্ডবেরা ক্ষেত্রী পিতা (পাণ্ডু) ও বীজী পিতাদের দ্বারা পরিচিত হয়েছেন, তবে ক্ষেত্রী পিতার প্রতি বেশি আনুগত্য দেখিয়েছেন। ক্ষেত্রজ, কানীন ও স্বয়ংদত্ত পুত্রেরা দ্বিগোত্র সন্তান-রূপে বিবেচিত হয়েছেন। তাঁরা ক্ষেত্রী পিতার গোত্রে এবং বীজী পিতার গোত্রেও অন্তর্ভুক্ত।

শুনঃশেপ ক্রীত পুত্রও বটে, আবার বিশ্বামিত্রের স্বয়ংদত্ত পুত্রও বটে। তিনি বীজী পিতার গোত্রে (অঙ্গিরাব গণে বা ভৃগুব গণে) অন্তর্ভুক্ত, আবার বিশ্বামিত্রের গোত্রেরও অন্তর্গত। গোত্রতালিকায় বিশ্বামিত্র গোত্রের শাখারূপে দেবরাত (শুনঃশেপ) গোত্র বিবেচিত হয়েছে।

[ঐব্রা ৭।১৭ ; আপ শ্রৌ সূ ২৪।৯।১, ২]

ক্ষেত্রীর পুত্র না জনয়িতার পুত্র এইরূপ বিবাদ ক্ষেত্রজাদি পুত্রের বেলায় ছিল। ক্ষেত্রিনঃ পুত্রঃ জনয়িতুঃ পুত্রঃ ইতি বিবদন্তে। এই বিবাদের পুরাপুরি মীমাংসা কখনও হয়নি, তবে সামাজিক আচারে ক্ষেত্রী পিতার বা সামাজিক পিতার দাবি অগ্রাধিকার পেয়েছে। (বশিষ্ঠ, ১৭ অ)

সপ্তম প্রকরণ ঃ

যৌন সম্পর্ক সমাচার

(১) যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিষেধ ও অনুমোদন

ব্যভিচার সংক্রান্ত বিবিধ নিষেধ (Taboo) প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় অগম্যাগমনের প্রায়শ্চিত্ত (expiation) বর্ণিত হয়েছে।

অগম্যার তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। যথা,—

(১) গুরুস্ত্রী (মনু ১১।৫৫),
(২) সখার স্ত্রী (১১।১৭১) ;
(৩) পুত্রবধূ (১১।১৭১) ;
(৪) কুমারী (১১।১৭১) ;
(৫) অন্ত্যজা রমণী (১১।১৭১) ;
(৬) পিসতুত বা মাসতুত বা মামাত ভগিনী (১১।১৭২) ;
(৭) পরস্ত্রী (১১।৬০) ;
(৮) রজস্বলা স্ত্রী (৪।৪১) ;
(৯) চণ্ডালী (১১।১৭৬),
(১০) ভ্রাতার ভার্যা, বিমাতা, ভ্রাতার কন্যা, মাতুলানী, সগোত্রা (পরাশর ১০।১৩, ১৪) ;
(১১) বেশ্যা (১০।১৫),
(১২) ভার্যার সখী, শ্যালিকা, নিজের কন্যা, নিজের ভগিনী, পিতৃষ্বসা, নিজের ভাগিনেয়ী (উশনঃ সংহিতা ৯।১-৪) ;
(১৩) পিতৃব্যপত্নী, বৈমাত্রেয় ভগিনী, শ্বশ্রূ ইত্যাদি (সংবর্ত সংহিতা ১৫৮, ১৫৯, ১৬২)।

অকামা কন্যার দূষণে (defloration) বধ দণ্ড। সকামা কন্যার দূষণে অবশ্য বধ দণ্ড নেই। যদি কোন কন্যা উচ্চ বর্ণের পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহলে দণ্ডযোগ্যা নয়। কিন্তু যদি সে নীচবর্ণের পুরুষের প্রতি আকৃষ্টা হয়, তাহলে তাকে গৃহে অবরুদ্ধ ক'রে রাখতে হবে। যে পুরুষ উচ্চবর্ণের কন্যাকে ভোগ করেছে, সে বধদণ্ডের যোগ্য। (মনু ৮।৩৬৪-৩৬৬)

মনুর মতে পরস্ত্রীর সঙ্গে সম্ভাষণ অপরাধ-রূপে বিবেচ্য, যেক্ষেত্রে তার স্বামীর নিষেধ রয়েছে। এরূপ অপরাধের জন্য এক সুবর্ণ দণ্ড বা জরিমানা। (৮।৩৬১)

পরাশরের মতে যে নারী ঋতুস্নাতা হয়ে স্বামীর নিকটে গমন করে না, তার অপরাধ হয়। আবার, ঋতুস্নাতা স্ত্রীকে যে স্বামী প্রত্যাখ্যান করে, সেও অপরাধী। অদুষ্টা ও অপতিতা ভার্যাকে যৌবনে যে স্বামী পরিত্যাগ করে, সে সাত জন্মে স্ত্রীলোক হয়। (পরাশর ৪।১৩-১৫)

যে জারের দ্বারা গর্ভবতী হয়, সেই বিধবা নারী পতিতা। যে ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করে, সে নষ্টা নারী, তাকে পুনরায় গ্রহণ করা চলে না। (পরাশর ১০।৩০, ৩১)

এই নিষেধগুলি বর্তমান সমাজেও চলতী, তবে ঠিক অলৌকিক চেতনা-যুক্ত টাবু হিসেবে নয়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে। বর্তমানে পাপ, প্রায়শ্চিত্ত, নরক, পরজন্মে অপগতি প্রভৃতি বিষয়ে অলৌকিক বিশ্বাস বহুলাংশে বিলুপ্ত, তবে সামাজিক সম্মতির বা অসম্মতির প্রশ্ন কেউ এড়াতে পারে না। সেকালে নিষেধ সত্ত্বেও ব্যভিচার ঘটত এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাজকীয় দণ্ডবিধানও হত, একালেও সামাজিক নিষেধ সত্ত্বেও ব্যভিচার ঘটে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজকীয় বা লৌকিক শাস্তির ব্যবস্থাও হয়।

কুমারী-সংসর্গ সেকালে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু কানীন সন্তানের জন্মও হত এবং সমাজে তার স্থানও ছিল। কর্ণ কুন্তীর কানীন সন্তান, কুন্তী কর্তৃক পরিত্যক্ত, সূতনন্দন রাধাভর্তা কর্তৃক প্রতিপালিত।

[মহাভারত ১।১১১।১১-২০]

দাশরাজ (ধীবর-রাজ) কর্তৃক পালিতা মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতী কন্যা অবস্থায় পরাশরের সংসর্গে দ্বৈপায়ন ব্যাসকে উৎপাদন করেন। সুতরাং ব্যাস কানীন সন্তান। (১।৬৩।৬৬-৮৮)

এই দুইটি দৃষ্টান্ত মহাভারতীয় আমলের। পরবর্তী কালেও এজাতীয় দৃষ্টান্তের অস্তিত্ব অনুমেয়।

বর্তমানের ভারতীয় কৌমী সমাজে প্রাক্-বিবাহ (pre-marital) সংসর্গ বহুক্ষেত্রে অনুমোদিত হয়ে থাকে। মধ্যভারতীয় কৌমগুলিতে কুমারী সংসর্গ দূষণীয় নয়। যদি কোন কুমারী এর ফলে গর্ভবতী হয়, তাহলে তার দ্বারা নির্দিষ্ট পুরুষটি তাকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়।

ভারতীয় কৌমগুলিতে শৈশব-নিকেতন বা যৌবন-নিকেতন (dormitory or sodality or youth-house) দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থলেও ডর্মিটরি কৌমীজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ-রূপেই গণ্য। ভারতবর্ষের কোন কোন কৌমের ক্ষেত্রে বালকাগার ও বালিকাগার পৃথক্‌ভাবে দেখা যায়, কোথাও বা বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই, একটিমাত্র শৈশব-নিকেতনেই বালক ও বালিকার সান্ধ্য অবসর যাপনের ব্যবস্থা হয়। শৈশব-নিকেতনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৌমী জনশ্রুতি, লোক-কথা (folk-tale), লোক-প্রবাদগুলির সহায়তায় বালক-বালিকাকে শিক্ষাদান।

'ডর্মিটরি' শব্দের অর্থ শয়নাগার। 'সোডালিটি' হচ্ছে বান্ধব সমিতি। ব্যাপক অর্থে বা সংকীর্ণ অর্থে দুটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কৌমী সমাজে তথা সভ্য সমাজে এরূপ ক্লাব-জাতীয় সংগঠন বহুক্ষেত্রে বয়ঃক্রম দ্বারা নির্ধারিত হয়। আইবুড়ো-কুটীর বহু অঞ্চলে দৃষ্ট হয়; কিন্তু অঞ্চল-বিশেষে পৃথক্ তাৎপর্য সূচিত করে। কোথাও বালকাগারে বিবাহিতেরাও সভ্য হতে পারে, কোথাও বা বিবাহিত এবং অবিবাহিতদের জন্য আলাদা ক্লাব-ঘরের ব্যবস্থা। বুলগেরিয়ায় চাষীসমাজে কুমারীর দলের সঙ্গে তরুণ দলের যোগাযোগ ঘটত। সুইডেনের কৃষক-সমাজে দল বেঁধে ছেলেরা ও মেয়েরা প্রাক্-বিবাহ প্রণয়ে অংশ গ্রহণ করত। নাইজেরিয়ায় হব্বে (Habbe) কৌমের ভিতরে যে বালকদের সুন্নত বা ত্বক্‌ছেদন সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে, তারা পৃথক্ বয়োগোষ্ঠী গঠন করে এবং তাদের ক্ষেত্রে প্রাক্-বিবাহ প্রণয় অনুমোদিত। [Social Organization, Lowie, pp. 304-306]

শৈশব-নিকেতনে বড়রা ছোটদের কাছে গল্প বলে, প্রবাদ বাক্যগুলিকে ব্যাখ্যা করে। উভয়ে মিলে মিশে নাচ, গান করে বা নানারকমের খেলা করে। সাধারণত সান্ধ্যকালীন ভোজনের শেষে এখানে সকলে সমবেত হয় এবং এখানেই নৈশ নিদ্রার আয়োজন করে।

মধ্যভারতের মুরিয়াগোন্দ কৌমের শৈশব-নিকেতন "গোতুল" নামে প্রসিদ্ধ। এখানে ছেলে ও মেয়েরা সন্ধ্যাকালে একত্রিত হয়। ছেলেরা চেলিক। মেয়েরা মোতিয়ারি। মোতিয়ারিরা চেলিকদের শ্রান্ত দেহাঙ্গ সংবাহন করে, কেশ বিন্যাস করে। গোতুলের সভ্য ও সভ্যার মধ্যে যৌন সম্পর্কও ঘটে। এর ফলে সাধারণত কুমারীরা গর্ভবতী হয় না। যদি কদাচিৎ হয়, তাহলে তাদের বিবাহের পরে তাদের স্বামীরাই কানীন সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

মধ্য ভারতের গোন্দ (Gond) কৌমের মধ্যে প্রাক্-বিবাহ স্বেচ্ছাচার, নারী কর্তৃক স্বামী নির্বাচন, নারীর পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার লক্ষিত হয়।

আসামের মাতৃধারাবিশিষ্ট গারো কৌমের মধ্যে, পুরুষ বহু স্ত্রী বিবাহ করতে পারে। তিনটির বেশি স্ত্রী সাধারণত দেখা যায় না, কিন্তু বিধবার বিবাহে প্রচুর বাধা। তার সন্তান সাবালক হলে সে স্বামীর ভাগিনেয়কে বৈধভাবে বিবাহ করতে অনুমতি পায়, অন্যথায় ভাগিনেয়কে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। বেশ্যাবৃত্তি নেই গারোদের মধ্যে, কিন্তু বিবাহোত্তর ব্যভিচার ঘটে। ব্যভিচারী পুরুষের কখনও কখনও বধদণ্ড। ব্যভিচারিণীর দণ্ড কর্ণ-বেধন। ব্যভিচারের ফলে কখনও কখনও বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়।

(Majumdar and Madan, op. cit., pp. 144, 145)

উত্তর প্রদেশের খশ কৌমের মধ্যে দ্বৈত নৈতিক মানদণ্ড (double moral standard) বিকশিত হয়েছে। স্ত্রী যখন স্বামীর গৃহে থাকে, তখন তার কোন যৌন স্বাধীনতা থাকে না। কিন্তু বাপের বাড়ীতে তার তরফে যৌন স্বেচ্ছাচার বাধানিষেধহীন। স্ত্রী (রন্তি) হিসেবে সে ব্যভিচারিণী হতে পারে না, কিন্তু কন্যা (ধান্তি) হিসেবে তার ব্যভিচারে অধিকার আছে। খশদের ভিতরে বহুপতিবিবাহ (polyandry) চলতী। ইদানীং যৌথবিবাহের (group marriage) দিকে বিবর্তন ঘটছে।

আসামের মাতৃধারাবিশিষ্ট খাসি কৌমের ভিতরে বিবাহোত্তর ব্যভিচার অনুমোদিত নয়। এর ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।

আসামের লুশেই কৌমের মধ্যে স্ত্রীর ব্যভিচার যদি ধরা পড়ে, তাহলে বিবাহকালে প্রাপ্ত শুল্ক (bride price) সে স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ-কারী পুরুষ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ-কারিণী নারীর মধ্যেই পুনর্বিবাহ কাম্য।

মধ্যভারতের খারিয়া কৌমের মধ্যে দাম্পত্য পবিত্রতা রক্ষার নিয়ম রয়েছে। এই পবিত্রতা থেকে স্খলনের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটতে পারে। [Ibid., pp. 92-93]

মধ্যভারতের হো, ওরাওঁ, মুণ্ডা, খারিয়া, ভীল, কামার, ভূমিজ প্রভৃতি কৌমের মধ্যে সগোত্রাকে, অর্থাৎ, নিজের ক্লানের নারীকে বিবাহ করা যায় না। সগোত্রা সংক্রান্ত নিষেধ বৈদিক জনগণের মধ্যেও ছিল। [Vide pp. 24-28, The Bhumijas of Seraikella, T. C. Das, 1931 ; pp, 23, 24, The Kharias of Dhalbhum, T. C. Das, 1931.]

মামাত বোনকে বিবাহ (cross cousin marriage) প্রাচীন ভারতে নিষিদ্ধ হলেও এধরণের বিবাহ অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়। যথা, অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ। বসুদেব ও পৃথা (কুন্তী) সহোদর ভাইবোন। বসুদেবের কন্যা সুভদ্রা এবং কুন্তীর পুত্র অর্জুন। সুতরাং সুভদ্রা অর্জুনের মামাত বোন। উভয়ের বিবাহ নিষিদ্ধ যৌন সম্পর্কের তালিকাভুক্ত। এই পরিণয় আর এক দিক দিয়ে রাক্ষস বিবাহের দৃষ্টান্ত (marriage by capture)। [বিষ্ণু পুরাণ ৪।১৪।৯, ১০ ; মহা ১।২১৯।১৭, ১৮ ; ১।২২০।৬, ৭]

দক্ষিণ ভারতে মাতুল-কন্যা বিবাহের রেওয়াজ ছিল। এর তেলুগু নাম মেনরিকম্। এর সঙ্গেই কতকটা যুক্ত মরুমক্কথায়ম্ বা মাতুল ধারায় উত্তরাধিকার প্রথা। এই তামিল প্রথা অনুসারে ভাগিনেয় মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত।

স্বামী ও স্ত্রীর সহভোজন আর্যদের মধ্যে নিষিদ্ধ থাকলেও দক্ষিণ ভারতে এর প্রচলন ছিল। (মনু ৪।৪৩)

হিন্দু সমাজে প্রচলিত কতগুলি পারিবারিক প্রথা বর্তমানে উঠে যাচ্ছে। যথা, পরিহার-প্রথা (avoidance), পরিহাস-সম্পর্ক (joking relationship), সন্তানের নামের সাহায্যে আহ্বান-রীতি (teknonymy), নাম বর্জন (name taboo) ইত্যাদি।

ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে দেবরের ও ভাশুরের সম্পর্কের কথাই ধরা যাক। দেবরের সঙ্গে বৌঠাকুরাণীর পরিহাস-সম্পর্ক, কিন্তু ভাশুরের সঙ্গে বৌমাটির পরিহার সম্পর্ক। দেবর বৌদির সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি, এমন কি অশ্লীল রঙ্গ-রস করবার অধিকারী। কিন্তু ভাশুরকে ভ্রাতৃজায়া এড়িয়ে চলে এবং ভ্রাতৃ-জায়াকেও ভাশুর বর্জন করে। এর কারণ হতে পারে এই যে প্রাচীন কালে দেবরের সঙ্গে বিধবা ভ্রাতৃজায়ার বিবাহ প্রচলিত ছিল, সেই সূত্র ধরে উভয়ের পরিহাসের সম্পর্ক চলে এসেছে। স্বামীর বড় ভাইয়ের সঙ্গে বিধবা ভ্রাতৃজায়ার বিবাহ সাধারণত ঘটত না, তাই উভয়ের মধ্যে পরিহার-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

নিয়োগ প্রথায় দেবরের উল্লেখ সর্বপ্রথমে দৃষ্ট হয়, তারপর অন্যের। মনুসংহিতায় ভাশুরকে সন্তানার্থে ভ্রাতৃজায়াতে নিয়োগের কথাও রয়েছে, কিন্তু বলা হয়েছে যে ভাশুরের নিকটে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী স্নুষা-তুল্যা। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নীতে ব্যাসের নিয়োগের কথাও সুবিদিত। (মনু ৯।৫৯—৬২)

হিন্দু সমাজে শ্বশুর ও পুত্রবধূর (স্নুষার) মধ্যে পরিহার-সম্পর্ক দেখা যায়, যদিও কৌমী সমাজের মতো কড়াকড়ি ভাবে পালিত হয় না। ঈদৃশ পরিহার-সম্পর্কের বিবিধ ব্যাখ্যা টাইলর, ফ্রেজার, ফ্রয়েড, লাউই, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন প্রভৃতি উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই সবত্র প্রযোজ্য নয়। ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা আলাদা কারণে পরিহার-সম্পর্ক বা পরিহাস-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা সেই বিশেষ কারণগুলি অনুসন্ধেয়। স্নুষার সহিত যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল, সেই কারণে শ্বশুর ও স্নুষার পরিহার সম্পর্ক এদেশে প্রচলিত হওয়া অসম্ভব নয়।

বৈদিক আমলে শ্বশুরের মুখ দেখাই পুত্রবধূর তরফে বারণ ছিল। কামসূত্রের একচারিণী-বৃত্ত প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে যে পুত্রবধূ শ্বশুরের ও শ্বশ্রূর কথার প্রতিবাদ করবে না, কিন্তু পরিমিত আলাপ নিষিদ্ধ হয়নি, তাই পরিহার-সম্পর্ক যথার্থভাবে প্রতীত হয় না। [ঐ ব্রা ৩।২।১১ ; কামসূত্র ৪।১।৩৭]

ভারতের গ্রামাঞ্চলে সন্তানের নামের সাহায্যে আহ্বান-রীতি লক্ষিত হয়। অমুকের মা, অমুকের বাপ—এই ধরণের আহ্বান-রীতি চলতী। নাম ধরে আহ্বান বড় দেখা যায় না। স্ত্রীকে ডাকতে হলে স্বামী অমুকের মাকে ডেকে আনার কথা বলে। স্ত্রীও এই রীতি অনুসরণ করে। নাম

বর্জনও দেখা যায়। স্বামী স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করলেও স্ত্রী সাধারণত স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। পুত্রবধূ শ্বশুরের নাম মুখে উচ্চারণ সাধারণত করে না। বর্তমানে শহুরে পরিবেশে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নাম উল্লেখে দ্বিধা করে না। এটা হচ্ছে কালিক বিবর্তন বা নব্য সংস্কৃতিতে উত্তরণের পরিচায়ক অথবা অতি প্রাচীন রীতির পুনঃ প্রবর্তন, যেহেতু সংস্কৃত গ্রন্থে সংবাদ-রীতিতে পতি-পত্নীর নাম ধরে সম্বোধন দেখা যায়। উর্বশী পুরূরবাকে নাম ধরে সম্বোধন করছেন; ঋ ১০।৯৫।২, ৫। শকুন্তলা দুষ্মন্তের নাম উচ্চারণ করছেন; মহা ১।৭৪।৮৩।

(২) প্রাক্-বিবাহ যৌন সম্পর্ক

প্রাচীন ভারতে কুমারী-সংসর্গ মহাপাতকের সজাতীয় অপরাধ-রূপে নিন্দিত হয়েছে, কিন্তু এধরণের সম্পর্ক কখনও কখনও যে ঘটত এবিষয়ে নজীর দুর্লভ নয়। পৈশাচ বিবাহের অঙ্গ ছিল সুপ্তা বা মত্তা কুমারীর সংসর্গ। (মনু ১১।৫৯)

Pre-marital license বা প্রাক্-বিবাহ যৌনতার নিদর্শন হচ্ছে সহোঢ় ও কানীন পুত্রসন্তান। কানীন হচ্ছে কন্যা অবস্থায় জাত পুত্রসন্তান। কন্যা অবস্থাতেই গর্ভবতী হয়েছে এমন মেয়ের বিবাহের পরে প্রসূত পুত্র হচ্ছে সহোঢ়। নিজের ঔরসজাত না হলেও এরূপ সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করে পাণিগ্রহীতা। (মনু ৯।১৭২-১৭৩)

একালেও কোর্টশিপের পর্যায়ে তরুণ তরুণার যৌন সংশ্রব অনেক সময়েই ঘটে এবং গর্ভাবস্থা ধরা পড়বার পরে বিবাহ রেজিস্ট্রীকৃত হয়। এজাতীয় গর্ভজ সন্তান সেকালের সহোঢ় পুত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য-যুক্ত।

কানীন সন্তানের স্বীকৃতি একালের সমাজে নেই, তার স্থান অনাথ আশ্রমে। কিন্তু সেকালে তার সামাজিক স্বীকৃতি ছিল। সমসাময়িক নাগরিক জীবন মাঝে মাঝে বিব্রত হয় ফুটপাথে বা ডাস্টবিনে পরিত্যক্ত নবজাতকের রোদন-ধ্বনিতে। এরূপ সন্তান অবিবাহিতার গর্ভজাত। সেকালের মতো একালে পাণিগ্রহীতা বা মাতামহ কানীন সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হন না। (বিষ্ণু সংহিতা ১৫।১০-১২; বসিষ্ঠ সংহিতা, ১৭ অ)

(৩) বিবাহোত্তর যৌন সম্পর্ক

সেকালের বিবাহোত্তর ব্যভিচারের (adultery) দৃষ্টান্ত গূঢ়জ পুত্র। স্বামীর গৃহে অবস্থানকালে স্ত্রীর গর্ভে অজ্ঞাত পরপুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র

হচ্ছে গূঢ়জ। সন্তানের উপর ঐ স্বামীরই দাবি থাকত। (মনু ৯।১৭০ ;
বিষ্ণু সং ১৫।১৩,১৪)

পতির জীবিতকালে পরপুরুষের দ্বারা উৎপন্ন পুত্র কুণ্ড। পতির মৃত্যুর পরে পরপুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র গোলক। অর্থাৎ, গোলক বিধবার গর্ভজাত। (পরাশর সং ৪।১৮)

কুণ্ড ও গোলক পাণিগ্রহীতার পুত্র-রূপেই স্বীকৃত হত। পাণিগ্রহীতা ক্ষেত্রী বা ক্ষেত্রের মালিক। স্ত্রী ক্ষেত্র। উৎপাদক বীজী। উক্ত পুত্রদ্বয়ের উপর উৎপাদকের কোন দাবি নেই। এদের ক্ষেত্রী পিতা হচ্ছে জননীর স্বামী এবং বীজী পিতা উৎপাদক।

অত্রি বলেছেন :—

(১) ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ। জার বা উপপতির দ্বারা স্ত্রী দূষিত হয় না।
(অত্রি সং ১৮৯)

(২) ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী * * পুষ্পকালেন শুধ্যতি।
যে নারী পর পুরুষ দ্বারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুষ্ট হয়েছে, সে ঋতুর দ্বারা শুদ্ধ হয়, অতএব স্বামীকর্তৃক পরিত্যাজ্যা নয়। (১৯৪)

(৩) যদি অসবর্ণ (উত্তমবর্ণ) পরপুরুষ দ্বারা স্ত্রীর গর্ভ হয়, তাহলে সন্তান প্রসবের সময় পর্যন্ত সে অশুদ্ধা। সন্তান প্রসবের পরে রজঃ দর্শন হলেই সে শুদ্ধা। (১৯১, ১৯২)
যদি স্ত্রীর অমত সত্ত্বেও কেহ বঞ্চনা বা বলের আশ্রয়ে তার সঙ্গ করে অথবা চৌর্য পূর্বক তার সঙ্গে উপগত হয়, তাহলে ঋতুকালে সে শুদ্ধা হবে। (১৯৩, ১৯৪)

(৪) ম্লেচ্ছ পুরুষ দ্বারা বা পাপকর্মকারীর দ্বারা যদি একবার মাত্র কোন নারী উপভুক্তা হয়, তাহলে ঋতুর দ্বারা এবং প্রাজাপত্য ব্রত দ্বারা সে শুদ্ধা হবে। (১৯৭)

সেকালের ধারণা ছিল যে ঋতুমতী নারী ঋতুর অন্তে শুদ্ধা হয়, তার দেহগত অশুদ্ধি অপগত হয়। ব্যভিচারকে দেহগত অশুচিতা-রূপে এস্থলে গণ্য করা হচ্ছে। অত্রিসংহিতার বিচার সামাজিক ব্যবস্থা-গত। সামাজিক ব্যবস্থায় দেহগত প্রশ্নই বিচার্য। সেকালের ব্যবস্থায় ব্যভিচারিণী স্ত্রী ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ব্যভিচারের জন্য পরিত্যক্তা হত না, তার প্রমাণ এস্থলে পাওয়া যায়। ব্যভিচারের উপর নানাজাতীয় টাবুও (taboo) ছিল। তা সত্ত্বেও ব্যভিচার ঘটত, যেমন আজকের দিনেও ঘটে। কিন্তু বর্তমান কালের ঝোঁক স্ত্রীর ব্যভিচারের ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের বা পত্নী-ত্যাগের দিকেই।

পারদারিক হচ্ছে বিবাহোত্তর ব্যভিচার বা পরস্ত্রী-সংসর্গ। বাৎস্যায়নের

মত অনুযায়ী স্ত্রীর পক্ষে ব্যভিচারে অপ্রবৃত্তির কারণ :—(১) পতির প্রতি অনুরাগ; (২) অপত্য সম্বন্ধে বিবেচনা; (৩) অতিক্রান্ত বয়স; (৪) শোক; (৫) স্বামীর অবিরহ; (৬) স্বামীর সখার সঙ্গে প্রণয়ে সঙ্কোচ; (৭) স্বজনদ্বারা বহিষ্কারের ভয়; (৮) ব্যভিচারের প্রলোভন দ্বারা স্বামী-কর্তৃক স্ত্রীকে পরীক্ষার আশঙ্কা ইত্যাদি। (কামসূত্র ৫।১।১৮-২২; ৩২, ৩৯, ৪১)

মেধাবী নায়ক কখনও শঙ্কাযুক্তা, সুরক্ষিতা, ভীতা, শ্বাশুরী-শাসিতা পরস্ত্রীর সঙ্গ কামনা করে না। (৫।২।২৮)

পর-বনিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের স্থান হচ্ছে মিত্র, জ্ঞাতি, মহামাত্র ও চিকিৎসকের ভবন। এর সুযোগ সৃষ্টি হয় বিবাহ, যজ্ঞ, উৎসব, বিপদ, উদ্যান-গমন প্রভৃতি জনসমাবেশ-যুক্ত ব্যাপারগুলিতে। পারিবারিক সম্মিলনে (বিশ্রম্ভগোষ্ঠীতে) নিজের স্ত্রীর উপস্থিতিতে অভিলষিতা নায়িকার সঙ্গে সংসর্গ ঘটতে পারে। (৫।২।৬, ১০)

এক্ষেত্রে নায়ক ও নায়িকার মধ্যে আদান-প্রদানের দ্রব্য ছিল সৌগন্ধিক, সুপারী (পূগফল), তাম্বূল, গন্ধযুক্ত উত্তরীয়, কুসুম ও অঙ্গুরীয়। (৫।২।৯, ২০, ২১)

বাৎস্যায়নের মতে সবর্ণা বা নিজ বর্ণে অন্তর্গত স্ত্রীতে কাম হচ্ছে পুত্রীয়, যশস্য ও লোকাচার-অনুমোদিত। উত্তমবর্ণা স্ত্রীলোকের প্রতি, পরস্ত্রীর প্রতি কাম লোকাচার-সম্মত নয়। বেশ্যা ও পুনর্ভূতে কাম শিষ্টও নয়, প্রতিষিদ্ধও নয়। নায়িকা তিন প্রকার,—

(১) কন্যা, অর্থাৎ, কুমারী, যার বিবাহ হয় নাই; (২) পুনর্ভূ এবং (৩) বেশ্যা। কামসূত্র-ধৃত একটি মতানুসারে পর-পরিগৃহীতা, অর্থাৎ, পরস্ত্রী চতুর্থী নায়িকা। (১।৫।১—৪)

পরস্ত্রী সংসর্গের পিছনে বহুক্ষেত্রে নানারকম বৈষয়িক বিবেচনাও থাকত, শুধুমাত্র কামের প্রেরণাই থাকত না। (১) প্রণয়-পাত্রীর স্বামীকে অনিষ্ট সাধন থেকে বিরত করা যেতে পারে। (২) প্রণয়পাত্রীর সাহায্যে তার স্বামীর দ্বারা অপহৃত সম্পদ লাভ করার সুযোগ হতে পারে। (৩) অবৈধ প্রণয়ের দ্বারা প্রচুর ধনলাভ হতে পারে। দরিদ্র নায়কের তরফে ঈদৃশ প্রত্যাশা বহুক্ষেত্রে দেখা যেত। (৪) কোন কোন ক্ষেত্রে, যেখানে নায়িকা নিজেই প্রেমের পথে অগ্রসর, সেস্থলে তার কামনার অপূরণে সে নায়কের উপর মিথ্যা দোষ চাপিয়ে ক্ষতি সাধন করতে পারে। (৫) যেখানে নায়িকার স্বামী নায়কের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় নায়ক অনুরূপ ব্যভিচারে উদ্যোগী হতে পারে। (১।৫।৮—১৬)

পরস্ত্রী-সম্পর্কের এই চিত্রগুলি সমাজের বিত্তবান্ অভিজাত স্তরের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করে। প্রেম এস্থলে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। অবৈধ প্রেমের দ্বারা বিবিধ প্রকার কাজ হাসিল হয়।

অবৈধ প্রেমের পাত্রী :—(১) রাজার বা মহামাত্রের সঙ্গে সংবদ্ধা মহিলা; (২) বিধবা; (৩) বিধবা সন্ন্যাসিনী; (৪) গণিকার দুহিতা; (৫) গণিকার পরিচারিকা। (১।৫।২২—২৪)

অগম্যা রমণী :—(১) পতিতা; (২) সংবন্ধিনী, অর্থাৎ, বৈবাহিক সম্বন্ধের কোন স্ত্রীলোক; (৩) স্ত্রীর সখী; (৪) বন্ধুপত্নী; (৫) শ্রোত্রিয়ের পত্নী; (৬) রাজার বনিতা। (১।৫।২৯)

অবৈধ প্রেমের ব্যাপারে নাগরকদের সহায়িকা :—(১) রজকের স্ত্রী; (২) নাপিতের স্ত্রী; (৩) মালাকারের স্ত্রী; (৪) গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতকারকের (গান্ধিকের) স্ত্রী; (৫) শুঁড়ীর স্ত্রী; (৬) গোয়ালার স্ত্রী; (৭) তাম্বূলিকের স্ত্রী; (৮) স্যাকরার স্ত্রী; (৯) ভিক্ষুকী। (১।৫।৩৪)

সংস্কৃত সাহিত্যে অবৈধ প্রেম চিত্রণ বিষয়ে কোন সংকোচের মনোভাব দেখা যায় না। অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে নায়িকা তিন প্রকার। যথা,—

(১) স্বস্ত্রী;
(২) পরস্ত্রী;
(৩) সাধারণ-স্ত্রী।

রত্যাদির আলম্বন-বিভাব (stimulus) এই জাতীয়া নায়িকা। পরস্ত্রী বা পরাধীনা নায়িকা দ্বিবিধা :—

(১) পরোঢ়া বা অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী;
(২) কন্যকা, অর্থাৎ, অবিবাহিতা কুমারী।

এস্থলে ব্যভিচারিণী পরভার্যা ও বেশ্যা (সাধারণ-স্ত্রী) সাহিত্যে বর্জনীয়া-রূপে বিবেচিতা হয়নি। [সাহিত্যদর্পণ ৩।৬৯, ৮১, ৮৪]

সাহিত্যের পাত্র পাত্রীগণের মধ্যে বিট, ভৃত্য, বিদূষক, শকার (রাজার শ্যালক), পীঠমর্দ, নটী, দাসী, ধাত্রেয়ী, প্রতিবেশিনী, প্রব্রজিতা (সন্ন্যাসিনী), শিল্পিনী ইত্যাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। [৩।৪৬—৫৭; ৩।১৩১]

(৪) অবৈধ যৌন সম্পর্ক

কামসূত্রে অবৈধ যৌন সংযোগের বহু নিদর্শন. রাজকীয় স্তরে বা রাজকর্মচারীদের স্তরে অবৈধভাবে কাম উপভোগ, রাজার অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রাণীদের অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের বিভিন্ন প্রণালী,

নারীর বা পুরুষের তরফে যৌন স্খলন বিষয়ে জ্ঞাতব্য উপকরণসমূহ সংরক্ষিত হয়েছে। বাৎস্যায়ন যৌন ব্যভিচারের নিখুঁত বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে ব্যভিচারের সঙ্গে যুক্ত থাকে অবদমন, ব্যক্তিগত প্রবণতা, পরিবেশের প্রভাব, দাম্পত্য জীবনের অপূরণ ইত্যাদি কারণ-সমূহ। বর্তমানের যৌন মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ঈদৃশ বিশ্লেষণের অতিরিক্ত নূতনতর আলোকপাত করতে পারেনি।

উক্ত গ্রন্থগত বিবরণ থেকে জানা যায় যে চর্ষণী বা গ্রামীণ যোষিৎ, অর্থাৎ, কৃষিকর্মে নিযুক্তা রমণী অতিসহজেই ব্যভিচারেব পথে অগ্রসর হয়। গ্রামাধিপতি, আযুক্ত বা কৃষিসংক্রান্ত সরকারী কর্মচারী, হলোত্থ-বৃত্তির পুত্র-কৃত প্রস্তাব মাত্রেই এরা সম্মতি জ্ঞাপন করে। হল বা লাঙ্গল থেকে যার জীবিকা অর্জিত হয়, অর্থাৎ, সম্পন্ন চাষী বা গাঁয়ের মোড়ল হচ্ছে হলোত্থবৃত্তি।

বিষ্টিকর্মে, অর্থাৎ, পেষণ, কুট্টন প্রভৃতি বিনা বেতনের বেগার খাটুনিতে,—কোষ্ঠাগারে বা গোলায় ধান্যাদি রাখার কাজে, গোলা থেকে ধান্যাদি নিষ্ক্রামণের কাজে,—গৃহসংস্কারের কাজে, ক্ষেত্রকর্মে,—কর্পাস, ঊর্ণা বা পশম, অতসী (flax), শণ, বল্কল বা গাছের আঁশ থেকে সূত্র প্রস্তুত করণের কাজে,—ক্রয়, বিক্রয় ও বিনিময়ের কাজে,—এই গেঁয়ো মেয়েরা নিযুক্ত থাকত। অর্থাৎ, ধনী চাষীব জন্য এরা বেগার খেটে দিত, গোলায় ধান মজুত করত, ঘরামীর কাজ করত, চাষের কাজ করত, সূতা কাটত, স্বাধীনভাবে হাটে বাজারে কেনা-বেচা করত। সেই সময়ে এদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক সহজ হত। [কামসূত্র ৫।৫।২, ৬ ; বিষ্টি, corvee]

ব্রজযোষিৎ হচ্ছে গোয়ালিনী। তার সঙ্গে গবাধ্যক্ষ নামক সরকারী কর্মচারীর ব্যভিচার ঘটত। (৫।৫।৭)

সূত্রাধ্যক্ষ সূত্রশালার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। সূতা-কাটনী বিধবা, অনাথা ও প্রব্রজিতা মেয়েদের দ্বারা সূতা কাটিয়ে সেই সূতা সংগ্রহ করত। এইসব স্ত্রীলোকের সহিত তার অবৈধ সম্পর্কও ঘটত। (৫।৫।৮)

নিশিকালে নাগর, অর্থাৎ, নগর-রক্ষক পুলিশ কর্মচারী নগরে চৌকি দিত। তার সঙ্গে অটন্তী (বিচরণশীলা) রমণীর যোগসাজশ হত। (৫।৫।৯)

পণ্যাধ্যক্ষও সরকারী কর্মচারী। তার কাজ ছিল সর্বপ্রকার পণ্যের বেচাকেনার তদারক। ক্রয়-বিক্রয়রত বাজারিয়া মেয়েদের সঙ্গে তার অবৈধ যোগাযোগ হত। (৫।৫।১০)

পত্তন বন্দরস্থ শহর। খর্বট ছোট শহর। এই সব শহরের মেয়েরা উৎসব-কালে রাজার অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশার ও আমোদ-প্রমোদের সুযোগ লাভ করত। উৎসবগুলি হচ্ছে—কার্তিক মাসের কৌমুদী বা পূর্ণিমার উৎসব, সুবসন্তিকা বা চৈত্রমাসের বসন্তোৎসব ইত্যাদি।

উৎসবে আপানকের (drinking party-এর) ব্যবস্থা থাকত। এতে যোগ দিত শহুরে মেয়েরা। সারাদিন রাজভবনে অতিবাহন করত; প্রদোষে রাজান্তঃপুর থেকে নিষ্ক্রান্ত হত। সেই সময়ে রাজদাসীর সাহায্যে তাদের মধ্যে অভিলষিতা একজনের সঙ্গে রাজার মিলন সম্পন্ন হত। রাজার পরস্ত্রীসহ ব্যভিচার ছিল এই ধরণের। যার উপর রাজার দৃষ্টি পড়ত, তার স্বামী রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করত। (৫।৫।১১—২১)

কোন প্রজার রাজকুল থেকে ভয়ের কারণ ঘটেছে, এই সুযোগে তার স্ত্রী ভিক্ষুকীর মধ্যস্থতায় রাজার শিকার হত। যে বৃত্তি বা কাজ খুঁজছে, অর্থাৎ, বেকার, যে মহামাত্রের দ্বারা পীড়িত, যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দ্বারা অভিভূত,—যে ব্যবহারে দুর্বল, অর্থাৎ, আদালতে যার দুর্বল মোকদ্দমা আসন্ন,—যে রাজার অনুগ্রহ লাভ করতে চায়,—এমন ব্যক্তির স্ত্রীও রাজার লালসার কবলে পড়ত। (৫।৫।২৪-২৫)

কখনও কখনও রাজদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে কোন প্রজার কলত্রকে আটক করা হত এবং রাজকীয় অন্তঃপুরে তার প্রবেশ ঘটত। (৫।৫।২৭,)

অঞ্চলবিশেষে প্রকাশ্যে রাজার পরস্ত্রীসংসর্গ অনুমোদন পেত। যথা,—

(১) অন্ধ্রদেশে বিবাহের পরে দশম দিনে জনপদ-কন্যা উপহারসহ রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করত এবং রাজার দ্বারা উপভুক্তা হত।

(২) দাক্ষিণাত্যের বৎস-গুল্ম অঞ্চলে মহামাত্র প্রভৃতি রাজকর্মচারীর অন্তঃপুর-চারিকারা নিশিকালে পরিচর্যার উদ্দেশ্যে রাজার সমীপে গমন করত।

(৩) বিদর্ভ দেশে রাজার অন্তঃপুরিকারা সুন্দরী জনপদ-যোষিৎকে একমাসের জন্য বা পক্ষকালের জন্য নিজেদের কাছে এনে রাখত।

(৪) অপরান্তক (কঙ্কণ) দেশে প্রজাগণ মহামাত্রকে বা রাজাকে উপহার-স্বরূপ নিজেদের সুন্দরী স্ত্রী দান করত।

(৫) সৌরাষ্ট্র দেশে রাজার সঙ্গে ক্রীড়ার জন্য নগর ও জনপদের মহিলারা রাজকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করত।

এইগুলি হচ্ছে পারদারিক প্রয়োগ। যে রাজা লোকহিতে রত, তাঁর পক্ষে এসব প্রয়োগ অবলম্বন বাঞ্ছনীয় নয় বাৎস্যায়নের মতে। (৫।৫।৩১-৩৭)

সেকালে রাজার বা অভিজাতদের অন্তঃপুর সুরক্ষিত থাকত। অন্তঃ-পুরিকারা বাইরের পুরুষের দর্শন পেত না। রাজার বহু স্ত্রী। তাই রাজার দ্বারা কোন স্ত্রী তৃপ্তি লাভ করত না। রাণীরা কৃত্রিম উপায়ে ভোগ বাসনা চরিতার্থ করত। (৫।৬।১-৩)

রাজার দিক থেকে ব্যবস্থা ছিল এই প্রকার। যে রাণীর ঋতুকাল বা বাসক (মিলনকাল) সমাগত, তার সহিত মিলন ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু

রাজা কখনও কখনও কৃত্রিম পদ্ধতিতে বহু রাণীর এক রাত্রেই তৃপ্তি সম্পাদন করতেন। (৫।৬।৪)

অন্তঃপুরিকাদের অবৈধ কামনা-পূরণের প্রণালী এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকার ছিল। যথা,—

(১) অপরান্তক দেশে অরক্ষিত অন্তঃপুরে সুলক্ষণ পুরুষের প্রবেশ সহজ ছিল।

(২) আভীরক দেশে ক্ষত্রিয় বর্ণের রক্ষীদের সঙ্গে অন্তঃপুরিকাদের সংশ্রব ঘটত।

(৩) বংসগুল্ম দেশে দাসীর ছদ্মবেশে দাসীদের সহিত নাগরকদের পুত্রেরা অন্তঃপুরে যাতায়াত করত।

(৪) বিদর্ভ দেশে অন্তঃপুরিকারা সপত্নীর পুত্রের সহিত অবৈধ সঙ্গ করত।

(৫) স্ত্রীরাজ্যের অন্তঃপুরিকাদের লক্ষ্যস্থল ছিল জ্ঞাতিসম্পর্কীয় পুরুষ।

(৬) গৌড়দেশীয় অন্তঃপুরচারিণীরা ব্রাহ্মণ, মিত্র, ভৃত্যাদি দ্বারা কলুষিত হত।

(৭) সিন্ধুদেশে দ্বার-রক্ষক ও কর্মকরদের সঙ্গে অন্তঃপুরের মেয়েদের অবৈধ সম্পর্ক ছিল।

(৮) হিমালয় অঞ্চলে সাহসিক পুরুষরা রক্ষীদের উৎকোচ দিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করত।

(৯) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ অঞ্চলে নগরবাসী ব্রাহ্মণেরা রাজার অনুজ্ঞায় পুষ্প উপহার দিতে অন্তঃপুরে গমন করত, পর্দার আড়ালে রাণীদের সঙ্গে আলাপ করত এবং এই সুযোগে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হত। (৫।৬।২৯-৩৮)

বাৎস্যায়নের মতে স্ত্রীলোকের পদস্খলনের কারণ-সমূহ হচ্ছে :—অতিগোষ্ঠী, অর্থাৎ, মেয়েদের জটলা; নিরঙ্কুশত্ব, অর্থাৎ, অবাধ অনিয়ন্ত্রণ; স্বামীর স্বৈরাচার; পুরুষের সহিত অবাধ মেলামেশা; স্বামীর প্রবাস যাপন; বিদেশে নিবাস; জীবিকাহানি; স্বৈরিণীর সহিত যোগাযোগ; পতির ঈর্ষাপরায়ণতা। (৫।৬।৪৫)

সহজলভ্যা বিবাহিতা রমণীরা এইরূপ :—

(১) দ্বারদেশে অবস্থায়িনী; (২) প্রাসাদ থেকে রাজমার্গ অবলোকিনী; (৩) তরুণ প্রতিবেশীর গৃহে গোষ্ঠীযোজিনী; (৪) সতত প্রেক্ষিণী, অর্থাৎ, সর্বদা নিরীক্ষণকারিণী; (৫) বিনা কারণে যার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেছে; (৬) স্বামী-বিদ্বেষিণী; (৭) স্বামীর দ্বারা বিদ্বিষ্টা; (৮) সন্তানহীনা;

(৯) সদা জ্ঞাতিগৃহে অবস্থিতা; (১০) গোষ্ঠীযোজিনী; (১১) কুশীলবের, অর্থাৎ, নটের ভার্যা; (১২) বালবিধবা; (১৩) জ্যেষ্ঠের ভার্যা, যার বহু দেবর আছে; (১৪) যে রমণী স্বামীকে হীন মনে করে; (১৫) কুমারী অবস্থায় যার ভালবাসার পাত্র ছিল; (১৬) বিনা অপরাধে স্বামীর দ্বারা অবমানিতা; (১৭) যার স্বামী প্রবাসী কিংবা ঈর্ষালু কিংবা ক্লীব কিংবা দীর্ঘসূত্র কিংবা কাপুরুষ কিংবা কুব্জ বা বামন বা গ্রাম্য বা দুর্গন্ধি বা রোগী বা বৃদ্ধ। (৫।১।৫২-৫৪)

সিদ্ধ, অর্থাৎ, প্রেমের ব্যাপারে সাফল্যপ্রাপ্ত পুরুষেরা এইরূপ :—

(১) যে কামসূত্র বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছে। (২) আখ্যানকুশল, যে ভাল গল্প বলতে পারে। (৩) বাল্যসঙ্গী। (৪) যৌবন-প্রাপ্ত। (৫) যে মেয়েদের প্রিয় কর্ম করে। (৬) যে পূর্বে কোন প্রেমের ব্যাপারে দূতের কাজ করেছে। (৭) মর্মজ্ঞ। (৮) একসঙ্গে লালিত পালিত। (৯) কামুক প্রতিবেশী। (১০) কামুক পরিচারক। (১১) নূতন জামাতা। (১২) প্রেক্ষাশীল, অর্থাৎ, নাটকাভিনয়ে আকৃষ্ট। (১৩) উদ্যানযাত্রায় আসক্ত। (১৪) বৃষ-রূপে খ্যাত। (১৫) সাহসিক। (১৬) কোন বিবাহিতার স্বামীর চেয়ে অধিকতর বিদ্বান, রূপবান্, গুণবান্ ও ভোগপ্রবণ। (১৭) মূল্যবান্ বেষ ও উপচার যুক্ত। (৫।১।৫০)

উদ্ধৃত বিবরণ থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে সমাজের উচ্চতম স্তরে, অভিজাত মহলে এবং নিম্নতম স্তরে অবৈধ যৌন সম্পর্ক অধিক পরিমাণে ঘটত। এজাতীয় অবৈধ সঙ্গমের পিছনে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর যৌন অক্ষমতা কিংবা অমনোযোগ থাকত। বহুপত্নীত্ব ছিল অভিজাত রীতি বা রাজকীয় ব্যাপার। এরূপ স্থলে স্ত্রীদের অবদমন অসহনীয় হত এবং বিকৃত উপায়ে তৃপ্তিলাভের চেষ্টা দেখা যেত কিংবা অশালীন যৌনতার দিকে প্রবণতা স্ফুট হত। স্বাধীন জীবিকাবতী সমাজের নীচ স্তরের মেয়েরাও যৌন ব্যাপারে অনেকটা শিথিল ছিল। একালের সমাজেও উচ্চতম ও নিম্নতম স্তরে এই দৃশ্যই কম-বেশি প্রকট। সমাজের মধ্যবর্তী অংশে যৌন সংযমের মাত্রা বেশি।

সেকালে শিল্প-কলার সঙ্গে যৌন শিথিলতার একটা সম্পর্ক ফুটে উঠত। গণিকাদের কলা-চর্চা, তাদের সন্তানদের রঙ্গ (অভিনয়) দ্বারা জীবিকার্জন, কুশীলবদের স্ত্রী-সহ বিচরণ ইত্যাদি ব্যাপারে এরূপ ধারণাই হয়। একালেও রঙ্গালয়ের সঙ্গে দুর্নাম জড়িত রয়েছে।

(৬) পারিবারিক বেশ্যাবৃত্তি

পারিবারিক বেশ্যাবৃত্তি (family prostitution) বিষয়ে আভাস পাওয়া

যায় স্মৃতিশাস্ত্রে ও কামসূত্রে। উপপাতক প্রসঙ্গে মনু-কর্তৃক "স্ত্রী-আজীব" উল্লিখিত হয়েছে। স্ত্রীর দ্বারা জীবিকা অর্জনের তাৎপর্য স্ত্রীকে ব্যভিচারে নিয়োগ। এই ধরণের জীবিকা উপপাতক-রূপে গণ্য হবে। (মনু ১১/৬৪)

কামসূত্রের বিবরণে দেখতে পাই যে অনর্থ থেকে পরিত্রাণের জন্য, বৃত্তি (জীবিকা) লাভের জন্য, মহামাত্রের (উচ্চ রাজকর্মচারীর) অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, বলবানের নিগ্রহ থেকে মুক্তির জন্য, দুর্বল মোকদ্দমায় জয়লাভের জন্য, উচ্চবিত্ত-শ্রেণীতে উত্তরণের জন্য, অভিজাত-পংক্তিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য, জ্ঞাতিজনের (সজাত) নিপীড়ন থেকে অব্যাহতির জন্য, জ্ঞাতিজনকে জব্দ করবার জন্য, রাজসভায় কোন কাজ হাসিল করবার জন্য,—ভার্যাদূষণের ঘটনা ঘটত। (৫।৫।২৪, ২৫)

সমসাময়িক কালে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে পারিবারিক বেশ্যাবৃত্তির প্রসার ঘটেছে। এর সূত্রপাত হয় বিগত পঞ্চাশের মন্বন্তরে, যখন ভাগ-চাষী ও ক্ষেত-মজুরদের গৃহবধূরা উদরের তাড়নায় দেহ বিক্রয় করতে শুরু করেছিল। বঙ্গবিচ্ছেদের পরে পূর্ববঙ্গাগত শরণার্থীদের একাংশ জীবিকার অভাবে পারিবারিক বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন ধারণের উপায় সুলভ হওয়া সত্ত্বেও এরূপ অনাচার প্রশ্রয় পেয়েছে।

(৬) বিবাহ-বিহীন-যুগ্ম-পরিবার

প্রাচীন কালের "পুনর্ভূ"-এর বিবরণ কতকটা যেন অবিবাহিত যুগ্ম-পরিবারকে নির্দেশ করে। মনুসংহিতার বর্ণনাতে পুনর্ভূ হচ্ছে স্বামী-পরিত্যক্তা রমণী বা বিধবা স্ত্রীলোক, যে পত্যন্তর গ্রহণ করেছে। তার পুত্র হচ্ছে পৌনর্ভব। (মনু ৯।১৭৫)

বসিষ্ঠসংহিতা অনুযায়ী কোন কোন রমণী ক্লীব, পতিত বা উন্মাদ স্বামীকে ত্যাগপূর্বক অথবা স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্য পতিকে গ্রহণ করত। তারাই পুনর্ভূ-রূপে কথিতা হত। (১৭ অ)

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে পুনর্ভূ দুইপ্রকার। যথা,—(১) অক্ষতা এবং (২) ক্ষতা। পূর্বস্বামীর সঙ্গে যার যৌন সংসর্গ হয়নি, সে বাগ্‌দত্তা বা অক্ষতা। যার এরূপ সংসর্গ হয়েছে সে ক্ষতা। এই দুই প্রকার রমণী পুনরায় সংস্কৃতা হয়ে পুনর্ভূ-রূপে সংজ্ঞিতা হয়। এস্থলে পুনর্বিবাহিতাকে পুনর্ভূ-শ্রেণীভুক্তা করা হচ্ছে। (১।৬৭)

যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি সম্ভবত সর্বাংশে যথার্থ নয়। বিষ্ণুর মতে বিবাহ সংস্কার ব্যতিরেকেই কোন কোন রমণী দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করত এবং

পুনর্ভূ-রূপে কথিতা হত। কামসূত্র অনুসারে যে বিধবা ইন্দ্রিয়-দৌর্বল্য বশত ভোগী গুণ-সম্পন্ন পুরুষকে আশ্রয় করে, সেই হচ্ছে পুনর্ভূ। বাৎস্যায়ন-ধৃত বাভ্রবীয়দের মতানুসারে স্বেচ্ছায় নির্গুণ স্বামীর গৃহ ত্যাগিনী কোন কোন মেয়ে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করত। উভয়ের সম্পর্ক বিবাহের দ্বারা সংস্কৃত নয়। ঈদৃশ সম্পর্ক অবিবাহিত যুগ্ম পরিবারের ইঙ্গিত দেয়। (কামসূত্র ৪।২।৩১-৩২ ; বিষ্ণু সং ১৫।৭-৯)

বাৎস্যায়নের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে পুনর্ভূ হচ্ছে স্বেচ্ছায় স্বামীর গৃহ-ত্যাগিনী বা স্বামীর গৃহ থেকে বিতাড়িতা। যে স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছে, সে একমাত্র প্রীতিদায় (প্রীতি-উপহার) ছাড়া বিবাহকালে প্রাপ্ত সমস্ত যৌতুকাদি প্রত্যর্পণ করত ;—যে বিতাড়িতা হয়েছে, সে এই সকল দ্রব্য প্রত্যর্পণ করত না। নূতন নায়কের গৃহে পুনর্ভূ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তার অন্যান্য স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখবে,—এই হচ্ছে বাৎস্যায়নের উপদেশ। এই উপদেশের মর্ম এই যে পুনর্ভূর নূতন সংসার সপত্নী-বহুল। এস্থলে পুনর্ভূ-সম্পর্ক উপপত্নী বা রক্ষিতা-সম্পর্কের (Concubinage) সদৃশ। ঠিক বিবাহিতা বধূর মর্যাদা তার নয়। (৪।২।৩৬-৪৪)

পুনর্ভূ-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিবরণ থেকে ধরে নেওয়া চলে যে (১) কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্ভূ পুনর্বিবাহিতা স্ত্রী; (২) কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্ভূ নারীর সপত্নী আছে; (৩) কোথাও কোথাও তার দ্বিতীয় স্বামী নিছক সঙ্গীমাত্র, অর্থাৎ, উভয়কে নিয়ে অবিবাহিত যুগ্ম পরিবার সৃষ্ট হয়েছে এবং এরূপ পরিবারে কোন সপত্নী নাই।

ইদানীন্তন কালে একধরণের বিবাহ-বিহীন যুগ্ম পরিবারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ছোট-বড় শহর অঞ্চলে। একজন তথাকথিত স্বামী ও একজন তথাকথিত স্ত্রী নিয়ে এজাতীয় পরিবার গঠিত। তথাকথিত স্বামী হয়ত উঞ্ছবৃত্তিশীল এবং তথাকথিত স্ত্রী হয়ত মিড্ ওয়াইফ বা নার্স বা সেবিকার কর্মে নিযুক্তা। তথাকথিত স্বামী-স্ত্রীর কুলজী অনেকক্ষেত্রে অস্পষ্ট বা প্রয়োজন অনুসারে কল্পিত। এদের বাসস্থান উচ্চ বা মাঝারি আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট-ব্যবস্থাযুক্ত গৃহ এবং নিম্ন অবস্থার ক্ষেত্রে শহরের উপকণ্ঠে স্থিত বস্তি-অঞ্চল। তথাকথিত স্বামী-স্ত্রী বিশেষ ক্ষেত্রে বিপত্নীক ও বিধবা কিংবা পত্নীত্যাগী ও স্বামী ত্যাগিনী। কোথাও বা তথাকথিত স্বামীটি visiting husband বা পারদর্শক পতির ভূমিকা অভিনয় করে এবং তথাকথিত ভার্যাটি একাকিনী কোন ভাড়া করা ঘরে বাস করে। এজাতীয় পরিবারের দৃষ্টান্ত সুদূর অতীত থেকে বোধ হয় আমাদের সমাজে ছিল, তবে বর্তমানে যেন সংখ্যায় বেড়ে চলেছে, যেহেতু সামাজিক অনুশাসন ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের কবলিত হচ্ছে।

(৭) যৌন সমন্বয়

স্বামীর বা স্ত্রীর যৌন অতৃপ্তি ব্যভিচারের অন্যতম কারণ। উভয়ের যৌন অসমন্বয় থেকে এর সূত্রপাত হয়। যৌন সমন্বয় পরীক্ষণের জন্য বর্তমান কালে পাশ্চাত্য সমাজে একপ্রকার **Test marriage** বা পরীক্ষা-মূলক বিবাহের দিকে প্রবণতা দেখা দিয়েছে এবং এজাতীয় পরীক্ষণ-রীতিতে প্রাক্-বিবাহ স্বেচ্ছাচার অনুমোদিত। যৌন সমন্বয় বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারাও ছিল। বাৎস্যায়ন তিন প্রকার যৌন সামঞ্জস্য-যুক্ত যোটকের কথা বলেছেন। যথা,—

শশ পুরুষ ও মৃগী স্ত্রী ;
বৃষ পুরুষ ও বড়বা স্ত্রী ;
অশ্ব পুরুষ ও হস্তিনী স্ত্রী।

ঈদৃশ যোটক সমরত রূপে বর্ণিত হয়েছে। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে ছয় প্রকার বিষমরত। অর্থাৎ, তিন প্রকার উচ্চরত এবং তিন প্রকার নীচরত। উচ্চরতের দৃষ্টান্ত—(১) বৃষ ও মৃগী ; (২) অশ্ব ও বড়বা ; (৩) অশ্ব ও মৃগী। নীচরতের দৃষ্টান্ত—(১) শশ ও বড়বা ; (২) বৃষ ও হস্তিনী ; (৩)শশ ও হস্তিনী। নীচরতের চেয়ে উচ্চরত শ্রেষ্ঠ। (কামসূত্র ২।১।১-৪)

মানসিক সামঞ্জস্যের দিক দিয়ে সম যোটক তিন প্রকার। যথা,—

মন্দবেগ নায়ক ও মন্দবেগা নায়িকা ;
মধ্যমবেগ নায়ক ও মধ্যমবেগা নায়িকা ;
চণ্ডবেগ নায়ক ও চণ্ডবেগা নায়িকা।
(২।১।৫-৭)

যৌন অসামঞ্জস্যের ফলে বিবাহের অংশীদারদের একজন অপরজনকে তৃপ্তি দিতে পারে না। এই অতৃপ্তি কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষত চণ্ডবেগ পুরুষের বা নারীর ক্ষেত্রে, সহনীয়তার মাত্রা অতিক্রম করলেই ব্যভিচার-প্রবণতা দেখা দেয়। বস্তুতপক্ষে যৌন সমন্বয় খুব কম দম্পতীর ক্ষেত্রেই আশা করা যেতে পারে, যেহেতু বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত দুই অংশীদার পরস্পরের নিকটে অনেকখানি অচেনা থাকে,—নির্বাচন-মূলক বিবাহে তো সম্পূর্ণই অচেনা থাকে। একজনের অপরজনকে জানবার পর্ব শুরু হয় পারিবারিক জীবনে এবং পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার পরীক্ষাও আরম্ভ হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভয়ের অন্তত একজনের সহনশীল না হয়ে উপায় থাকে না।

কোথাও স্বামী অধিকতর সহনশীল, কোথাও বা স্ত্রী। যৌন অতৃপ্তি সত্ত্বেও স্বামী বা স্ত্রী অবদমনে অভ্যস্ত হয়। অবদমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক

চেতনাজাত। যৌন চেতনা অপেক্ষা বাস্তব বিচারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেতনার দ্বারা অধিকাংশ দাম্পত্য সম্পর্ক বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়। যৌন সামঞ্জস্যের চেয়েও সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সচ্ছলতা দাম্পত্য জীবনে অধিকতর আকর্ষণ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, যৌন ব্যাপারটা গৌণ, যদিও অবহেলার যোগ্য নয় কোন প্রকারেই। যৌন বিবেচনায় সুসমঞ্জস যোটক খুব কম ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত, পরন্তু অসামঞ্জস্যই ধরে নিয়ে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করতে হয় এবং স্বামী বা স্ত্রী এই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে না। বিবাহের অংশীদারদের একজনকে সহনশীল হতেই হয় এবং অবদমনকে মেনে নিতে হয়। সাধারণত অবদমনের মাত্রা সহনক্ষমতাকে অতিক্রম করে না। তা যদি করত, তাহলে ঘরে ঘরে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হত। কিন্তু তা হয় না এবং হয় না বলেই প্রমাণ করে যে যৌন তৃপ্তির পরিমাণ যাচাই করবার আগ্রহ খুব কম দম্পতীরই থাকে। অধিক যৌন চেতনা-সম্পন্ন (over-sexed) স্ত্রী বা পুরুষ,—বাৎস্যায়নের ভাষায় চণ্ডবেগ নায়ক বা নায়িকা—সামাজিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে। এদের তরফে অবদমন অসহ্য হলে যৌন বিচ্যুতি বা ব্যভিচার অবকাশ-সাপেক্ষ মাত্র। অতৃপ্ত স্বামীর জন্য পুরুষ-প্রধান সমাজ গণিকালয়ের দরজা খোলা রেখেছে, কিন্তু নারীর অতৃপ্তি বহুস্থলে স্নায়বিক বা মানসিক বিকারে পর্যবসিত হয়। এজাতীয় মানসিক বিকারের বিশ্লেষণ থেকে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড একটা মারাত্মক রকমের ভুল সিদ্ধান্তে—সার্বিক যৌনতাবাদে (pansexualism)—উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর অবদমন-তত্ত্ব বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সর্বক্ষেত্রে নয়। অবদমন সামাজিক জীবনে অপরিহার্য এবং দাম্পত্য সমন্বয়ের দিক দিয়ে সমর্থনীয়ও বটে। সাধারণ স্বামী-স্ত্রী অবদমনে অভ্যস্ত এবং সামাজিক জীবনের জটিলতার মধ্যে নিজেদের যৌন জীবন বিষয়ে সচেতন হওয়ার অবকাশে বঞ্চিত।

অষ্টম প্রকরণ ঃ

শহরের পরিবেশে গণিকা প্রথার প্রসার

(১) নাগরক-বৃত্ত

কামসূত্রে নাগরক-বৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। অনেকের মতে বহির্বাণিজ্য দ্বারা সমৃদ্ধ নগর ও পত্তনের ধনী বিলাসী নাগরিকদের চরিত-কথা হচ্ছে এই বর্ণনা চিত্র। এই আলেখ্য ঐহিকতা, সুখপ্রীতি ও ভোগ-লালসার অকাট্য নিদর্শন। জীবনকে উপভোগ করবার দৃষ্টিভঙ্গী কতখানি নিরঙ্কুশ হতে পারে তার পরিচয় এতে মিলছে।

নাগরক প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠে দন্তধাবন করবে এবং তার নিত্য কৃত্যরূপে গণ্য—অনুলেপন বা গন্ধদ্রব্য, ধূপ ও মাল্য গ্রহণ; মোম (সিক্থ) ও আলতা (অলক্তক) প্রয়োগ, আয়নায় মুখ অবলোকন, মুখবাস বা সুগন্ধ-যুক্ত তাম্বূল চর্বণ, স্নান। একদিন অন্তর তৈল দ্বারা মালিশ, তৃতীয় দিনে সাবান (ফেনক) ব্যবহার, চতুর্থ দিনে শ্মশ্রুকর্তন (আয়ুষ্য), পঞ্চম দিনে গোপন অঙ্গে ক্ষুর প্রয়োগ (প্রত্যায়ুষ্য) করণীয়। পূর্বাহ্ণে ভোজনের শেষে শুক ও সারিকাকে কথা বলতে শেখাবে, মোরগ ও মেষকে যুদ্ধ করতে শেখাবে, তারপর দিবাশয়ন। তারপর অপরাহ্ণে গোষ্ঠীবিহার।
[কামসূত্র ১।৪।৫-৯]

নাগরকদের দ্বারা আয়োজিত উৎসবাদির নমুনা হচ্ছে :—

(১) ঘটানিবন্ধন;
(২) গোষ্ঠীসমবায়;
(৩) সমাপানক;
(৪) উদ্যানগমন;
(৫) সমস্যা এবং ক্রীড়া।

দেবতার ভবনে যাত্রা হচ্ছে ঘটা। সরস্বতী বিদ্যা ও কলার দেবতা। সরস্বতীর ভবনে সমাজের প্রচলন ছিল। সমাজ হচ্ছে উৎসবার্থে মিলন বৈদিক আমলের সমন কতকটা এই ধরণের সম্মিলন। নির্দিষ্ট দিনে সমাজ বসত। এই সমাজে যোগদান করত কুশীলব বা শিল্পীরা। বর্তমানে "সমাজ" শব্দের অর্থ সোসাইটি। [কামসূত্র ১।৪।১৪-১৮]

গোষ্ঠীসমবায় হচ্ছে দল বেঁধে উৎসব। বেশ্যাভবনে বা সভায় (মণ্ডপে) বা কারও গৃহে সমান বিদ্যা, শীল, বিত্ত ও বয়সের লোকেরা

একত্রিত হত এবং বিবিধ আলাপন করত। আলাপের বিষয় হত কাব্য-সমস্যা ও কলাসমস্যা। ঈদৃশ আলোচনার মজলিস হচ্ছে গোষ্ঠী। [কামসূত্র ১।৪।১৯, ২০]

পরস্পরের ভবনে আপানক অনুষ্ঠিত হত। এই জিনিসটা হচ্ছে drinking party-এর সজাতীয়। এতে পানদ্রব্য ছিল,—

মধু—মধু হতে প্রস্তুত মদ্য ;

মৈরেয়—দেশবিশেষে প্রস্তুত মদ্য ;

সুরা—মদ্যবিশেষ ;

আসব—মদ্যবিশেষ।

মদ্যের সঙ্গে ভক্ষ্যের ব্যবস্থাও ছিল। যথা, বিবিধ লবণ, ফল, শাক (তরকারি), বিভিন্ন স্বাদযুক্ত উপদংশ বা মুখরোচক সামগ্রী। এরূপ বৈঠকে বেশ্যার অংশ গ্রহণ আবশ্যক ছিল। (১।৪।২২, ২৩)

উদ্যান-গমন হচ্ছে গার্ডেন পার্টি। কিছুদিন আগেও বাগানবাড়ী বা বড়লোকদের রক্ষিতার জন্য বাসস্থানের প্রচলন বাংলাদেশে ছিল, কিন্তু বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। কামসূত্রের যুগে নাগরকরা অলংকৃত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেশ্যা ও পরিচারকদের সঙ্গে পূর্বাহ্ণে উদ্যানে গমন করত। সেখানে কুক্কুট-যুদ্ধ (মোরগের লড়াই), দ্যূত বা পাশাখেলা, প্রেক্ষা বা কলাকৌশল প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকত। অপরাহ্ণে সকলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত। (১।৪।২৪, ২৫)

গ্রীষ্মকালীন উৎসব জলক্রীড়া-গমন। বাপী, দীর্ঘিকা প্রভৃতিতে জলক্রীড়া অনুষ্ঠিত হত। (১।৪।২৬)

ক্রীড়া হচ্ছে যৌথ ক্রীড়ামোদ। যথা, যক্ষরাত্রি উৎসব হত, যার নাম বর্তমানে দীপালী (দীপাবলী)। সম্ভবত এ উৎসবে যক্ষের পূজা হত। আর একটি যৌথ ক্রীড়া ছিল কৌমুদী জাগর। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় এর অনুষ্ঠান-কাল। সুবসন্তক উৎসবও যৌথ ক্রীড়া। সম্ভবত এটি বসন্ত কালে অনুষ্ঠিত মদনোৎসব। যৌথ ক্রীড়ার আরও নিদর্শন :—

(১) সহকারভঞ্জিকা বা আম্রমঞ্জরীর খেলা।

(২) অভ্যূষ-খাদিকা বা ছোলা মটর প্রভৃতি সেঁকে খাওয়ার উৎসব, কতকটা চড়ুই ভাতি-জাতীয়। [অভ্যূষ—চানাচুর জাতীয় খাদ্য।]

(৩) বিস-খাদিকা বা পদ্মফুলের নাল ভক্ষণ।

(৪) নবপত্রিকা বা বর্ষার সূচনায় তরুণ ঘাস ও নব পল্লব নিয়ে খেলা।

(৫) উদক-ক্ষ্বেড়িকা। ক্ষ্বেড়া হচ্ছে বাঁশের পিচকারি। এরূপ

পিচকারির দ্বারা জল ছুঁড়ে দেওয়ার খেলা, বর্তমানের হোলী খেলার সজাতীয়। (অমর ৩।৩।৪০)

(৬) একশাল্মলী, অর্থাৎ, একটি শাল্মলী বা শিমুল বৃক্ষের নীচে কুসুম সংগ্রহের ক্রীড়া।

(৭) কদম্বযুদ্ধ বা কদম্ব ফুল নিয়ে যুদ্ধ-ক্রীড়া।

নাগরকের সহযোগী ও সহযোগিনী ছিল। যথা :—

(১) পীঠমর্দ—কলারসিক কলাশিক্ষক। তার সম্পত্তি হচ্ছে মল্লিকা বা দণ্ডাসন, ফেনক (সাবান), কষায় বা প্রসাধন দ্রব্য।

(২) বিট—বেশ্যামহলে ও নাগরক-মহলে বহুমান্য ব্যক্তি, যার অর্থসম্পদ বিলাসের ফলে নিঃশেষিত হয়েছে। তার স্ত্রী বর্তমান।

(৩) বিদূষক—পরিহাস রসিক ব্যক্তি।

(৪) ভিক্ষুকী—সন্ন্যাসিনী।

(৫) মুণ্ডা—মুণ্ডিতা রমণী।

(৬) বৃষলী—ব্যভিচারিণী বন্ধ্যা রমণী।

(৭) বেশ্যা।

(৮) বৃদ্ধগণিকা।

(৯) অভিসারিকা। [১।৪।১০, ২৭-৩৫]

নাগরকের গৃহ ছিল দ্বিধাবিভক্ত। বাহ্য বাসগৃহ আমোদ প্রমোদের জন্য। অন্তঃকক্ষ পত্নীর জন্য। বাইরের ঘরের আসবাব হচ্ছে—

(১) উপধান বা তাকিয়াযুক্ত শয্যা ; (২) প্রতিশয্যিকা—ছোট শয্যা ; (৩) সিক্‌থ-করণ্ডক বা মোমের পাত্র ; (৪) সৌগন্ধিক-পুটিকা বা সুগন্ধি দ্রব্যের পাত্র ; (৫) তাম্বুল ; (৬) হস্তীদন্তে ঝুলন্ত বীণা ; (৭) চিত্রফলক ; (৮) বর্তিকা সমুদ্গক বা তুলির বাক্স ; (৯) পুস্তক ;(১০) মেঝেয় পাতা আস্তরণ ; (১১) দ্যূত-ফলক বা পাশা খেলার ফলক।

বাহ্য বাসগৃহের বহির্দেশে ক্রীড়ার্থ পাখীর খাঁচা। একদিকে তক্ষণ-স্থান বা কাঠের কাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। বৃক্ষ-বাটিকায় টাঙানো থাকত প্রেঙ্খা দোলা—দোল খাওয়ার জন্য। স্থণ্ডিল-পীঠিকা থাকত উপবেশনের জন্য। (১।৪।৩-৫)

উক্ত বর্ণনা থেকে স্ফুট হয় যে নাগরক গৃহস্থ-জীবন যাপন করত বটে, কিন্তু বিবিধ প্রকার বিলাসে অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিত।

(২) গণিকাবৃত্ত

সেকালের শহরে আভিজাত্য দ্বারা পরিপোষিত ছিল বেশ্যাবৃত্তি। বেশ্যার সামাজিক মর্যাদা এখনকার মতো নয়। চৌষট্টি কলায় কুশলা হয়ে সে গণিকারূপে পরিচিতা এবং রাজার দ্বারাও পূজিতা হত। (১।৩।১৭, ১৮)

বেশ্যার শ্রেণীবিভাগ ছিল। যথা,—

(১) কুম্ভদাসী বা বেশ্যাপতির দাসী (whore); (২) পরিচারিকা; (৩) কুলটা, অর্থাৎ, পতির অগোচরে পরপুরুষগামিনী; (৪) স্বৈরিণী বা পতির জ্ঞাতসারে পরপুরুষগামিনী; (৫) নটী, অর্থাৎ, মঞ্চাভিনেত্রী; (৬) শিল্পকারিকা, অর্থাৎ, শিল্পকর্মে নিযুক্তা; (৭) প্রকাশ-বিনষ্টা, বিবাহিতা হয়েও পরপুরুষের আশ্রিতা, অর্থাৎ, রক্ষিতা বা উপপত্নী (concubine); (৮) রূপাজীবা বা দেহ বিক্রয়কারিণী; (৯) গণিকা (courtesan)।
[৬।৬।৫০]

প্রকৃতপক্ষে কুম্ভদাসী, রূপাজীবা ও গণিকা পরিচিতা ছিল বেশ্যারূপে।

গোষ্ঠী-পরিগ্রহ হচ্ছে মিলিতভাবে কয়েকজন বিটের দ্বারা একজন বেশ্যাকে গ্রহণ। [৬।৬।৪৪]

গণিকা নিজের কন্যাকে নাগরিকপুত্রদের নিকটে বর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত করত। গন্ধর্বশালায় বা ভিক্ষুকীভবনে এই যুবকেরা কলা (arts) শিখতে যেত। সেখানে তাদের যোগসাজশ ঘটত গণিকা-কন্যার সঙ্গে। গন্ধর্বশালা ছিল নৃত্য গীত শিক্ষা-নিকেতন। ভিক্ষুকীর বা সন্ন্যাসিনীর ভবনেও নৃত্যগীতাদি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। যে যুবক প্রার্থিত ধন দিত, তাকে গণিকা তার কন্যা দান করত। আসুর বিবাহ প্রথার সঙ্গে তুলনীয় এই রীতি। কোন কোন ক্ষেত্রে চতুরতার খেলাও ছিল। গোপনে কোন যুবকের সঙ্গে নিজ কন্যার সংযোগ ঘটিয়ে গণিকা ধর্মস্থদের বা বিচারকদের শরণাপন্ন হত এবং ঐ যুবকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করত। (৭।১।১৩-২০)

বিবাহিতা গণিকা-কন্যা এক বছর পর্যন্ত পরিণেতার সঙ্গে বাস করবে, তারপর নিজ ইচ্ছামতো চলবে। যখন তার স্বামী সঙ্গ প্রার্থনা করবে, তখন নৈশ অর্থপ্রাপ্তি উপেক্ষা ক'রে স্বামীর সহিত রাত্রি যাপন করবে। এস্থলে প্রতিভাত হচ্ছে যে গণিকার বিবাহ মানে নিজ বৃত্তি বর্জন নয়।
(৭।১।২১, ২২)

বেশ্যা পণ্যের সঙ্গে তুলনীয়া। তার সহায় হচ্ছে,—আরক্ষ পুরুষ বা পুলিশ বিভাগের লোক, ধর্মাধিকরণস্থ বা বিচারবিভাগীয় লোক, দৈবজ্ঞ, কলাবিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, পীঠমর্দ, বিট, বিদূষক, মালাকার, গান্ধিক বা গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত কারক, শৌণ্ডিক বা সুরাবিক্রেতা, রজক, নাপিত, ভিক্ষুক।
(৬।১।৮, ৯)

অর্থের জন্য যে সকল পুরুষকে বেশ্যা গ্রহণ করত, তারা হচ্ছে,—(১) বিত্তবান্, যার প্রকাশ্য বৃত্তি বা জীবিকা, (২) অধিকরণবান্, অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কোন বিভাগীয় কর্তা, (৩) অনায়াসে অধিগতবিত্ত, (৪) নিয়ত উপার্জনশীল লোক, (৫) পণ্ডক, অর্থাৎ, নপুংসক, যে পুরুষত্ব জাহির করতে চায়, (৬) রাজার নিকটে সিদ্ধ, অর্থাৎ, যার বচন রাজার নিকটে

গ্রহণযোগ্য, (৭) মহামাত্রের নিকটে সিদ্ধ, অর্থাৎ, যার বচন উচ্চ রাজ-কর্মচারীর নিকটে গ্রহণযোগ্য, (৮) বিত্তাবমানী, যে অর্থকে অবহেলা করে, (৯) গুরুজনের শাসন অমান্যকারী, (১০) সবিত্ত একপুত্র, অর্থাৎ, বাপের এক ছেলে, যার টাকা আছে, (১১) লিঙ্গী প্রচ্ছন্নকাম, অর্থাৎ, সন্ন্যাসী, যে গোপনে কাম চরিতার্থ করে, (১২) বৈদ্য, অর্থাৎ, চিকিৎসক। (৬/১/১০)

যে হিরণ্য দান করে, বেশ্যার নিকটে সেই পুরুষ বাঞ্ছনীয়। (৬।৫।৬)

গণিকাদের অর্থলাভ বেশি হলে তারা দেবকুল (মন্দির), তড়াগ (পুষ্করিণী), আরাম (উদ্যান), স্থলী (বাঁধ), অগ্নিচৈত্য, অর্থাৎ, অগ্নিদেবতার গৃহ প্রভৃতি নির্মাণে অর্থ ব্যয় করে, মধ্যস্থের দ্বারা ব্রাহ্মণকে সহস্র গো দান করে, দেবতার পূজা প্রবর্তন করে। (৬।৫।২৮)

রূপাজীবার রোজগার অধিক হলে সে সর্বাঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করে, সুন্দর গৃহ তৈরী করে। মূল্যবান্ ভাণ্ড ও পরিচারকদের দ্বারা তার গৃহের রূপসজ্জা সম্পন্ন হয়। (৬।৫।২৯)

কুম্ভদাসীর অধিক আয়ের নিদর্শন হচ্ছে শুক্ল আচ্ছাদন পরিধান, উপযুক্ত অন্ন-পান গ্রহণ, সৌগন্ধিক বা গন্ধদ্রব্য ব্যবহার, তাম্বূল চর্বণ। (৬।৫।৩০)

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে রাজসভায় গণিকাধ্যক্ষ কর্তৃক এক সহস্র পণ বেতনে গণিকা নিযুক্তা হত। তার অর্দ্ধেক বেতনে একজন প্রতিগণিকাও নিযুক্তা হত। [অর্থশাস্ত্র ২।২৭।১, ২]

রাজসভায় বিভিন্ন কর্মে গণিকাদের নিযুক্ত করা হত। ছত্র, ভৃঙ্গার (স্বর্ণকুম্ভ), ব্যজন (পাখা) ধারণ,—শিবিকায় (পাল্কীতে), পীঠিকায় (সিংহাসনে), রথে রাজার পরিচর্যার কাজ করত গণিকারা এবং মর্যাদা অনুসারে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ শ্রেণীভুক্তা হত। [·।২৭।৪]

সৌভাগ্য (সৌন্দর্য) অপগত হলে মাতৃকার কাজ করত গণিকারা। মাতৃকা শুশ্রূষাকারিণী। [২।২৭।৫]

আট বছর বয়স থেকে গণিকা রাজার নিকটে কুশীলবের কাজ, গানবাজনা করত। [২।২৭।৭]

ভোগ দানে অক্ষম গণিকা কোষ্ঠাগারে বা মহানসে (রান্নাঘরে) কাজ গ্রহণ করত। বিশেষ ক্ষেত্রে গণিকার শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ছিল। গণিকাকৃত অপরাধের নিদর্শন :—

(১) মাতা ব্যতীত অপরের হস্তে গহনা গচ্ছিত করণ ;
(২) সম্পত্তি বিক্রয় বা আধান (মর্টগেজ) ;
(৩) বাক্ পারুষ্য —দুর্বাক্য ব্যবহার ;
(৪) দণ্ড পারুষ্য —আঘাত করণ ;
(৫) কর্ণচ্ছেদন ;
(৬) রাজসভায় গমনে অনিচ্ছা ;

(৭) রাজার আজ্ঞায় কোন পুরুষকে দেহদান-বিধির লংঘন ;

(৮) অর্থ গ্রহণের পরে দেহদানে অনিচ্ছা ;

(৯) সঙ্গ প্রার্থীকে হত্যা। [২।২৭।৮, ৯, ১১, ১২, ১৯, ২০, ২২]

গণিকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার উপর বলাৎকারের (সাহসের) জন্য পুরুষের শাস্তি বিহিত ছিল। যদি কোন পুরুষ গণিকাকে অবরুদ্ধ করত বা ধর্ষণ করত বা আঘাতের দ্বারা তার রূপ নষ্ট করত, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হত। গণিকার আভরণ, অর্থ, দৈনিক আয় (ভোগ) অপহরণকারীও শাস্তি পেত। (২।২৭।১৩, ১৪, ২৩)

রূপাজীবা নিজের দৈনিক আয়ের দ্বিগুণ প্রতি মাসে সরকারকে কর হিসেবে দিতে বাধ্য থাকত। (২।২৭।২৭)

যারা গণিকাকে, দাসীকে, রঙ্গোপজীবিনীকে (অভিনেত্রীকে) গীত, বাদ্য, পাঠ্য, নৃত্ত, নাট্য (অভিনয়), অক্ষর (লিখনবিদ্যা), চিত্র, বীণাবাদন, বেণু ও মৃদঙ্গ (খোল) বাদন, পরচিত্ত জ্ঞান, গন্ধ ও মাল্য প্রস্তুতকরণ, সংবাহন, বৈশিক কলাজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিত, তারা ভরণ পোষণ পেত সরকার থেকে। এরাই আবার গণিকার পুত্রকে রঙ্গোপজীবী (অভিনেতা) হতে শিক্ষা দিত। (২।২৭।২৮,২৯)

রঙ্গালয়ের কাজগুলিতে সম্ভবত গণিকারাই অংশ গ্রহণ করত।

কামসূত্র ও অর্থশাস্ত্রের বিবরণে গণিকার উচ্চ সামাজিক মর্যাদা প্রতীত হয়, যার সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের Hetaira—হিটেইরাদের মান-সম্ভ্রম তুলনীয়।

(৩) শহুরে ভোগবাদ

বাৎস্যায়নের আবির্ভাব-কাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও আন্দাজ করা হয়েছে যে পূর্ণ-বিকাশিত নগর-জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং তাঁর সময়ে নগরের ধনী বিলাসীরা ভোগী জীবনাদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন,—এই সময়টা বিশেষ সমৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির যুগ হওয়াই সম্ভব। শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিবিধ কলাবিকাশের যুগ-রূপে চিহ্নিত গুপ্ত আমলে বাৎস্যায়নকে স্থাপন করা অসমীচীন নয়। অনেকের মতে তাঁর বাসস্থান হয়ত ছিল অবন্তী রাজ্যের উজ্জয়িনী শহর,—সেকালের একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। বাক্‌ট্রিয়া (বাল্‌খ, বাহ্‌লিক) থেকে শুরু ক'রে উজ্জয়িনী, ভৃগুকচ্ছ (ভরুকচ্ছ, Broach) প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রের সহিত যুক্ত ছিল উত্তর-পশ্চিম বাণিজ্য-পথ। উজ্জয়িনীর ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি বিলাসীদের আকর্ষণ ছিল,—এরাই সম্ভবত কামসূত্র-গ্রন্থে নাগরক রূপে বর্ণিত হয়েছে। এই নাগরকদের গার্হস্থ্য জীবন এক বা একাধিক স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু গণিকা-সাহচর্য প্রায় আবশ্যকীয় ছিল। [Foreword by P. C. Bagchi, Kamasutra, tr. by B. N. Basu, 1960.]

কামসূত্র গ্রন্থে বাৎস্যায়ন বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ করেছেন। যথা,

(১) অন্ধ্র, দাক্ষিণাত্যের তেলুগু অঞ্চল;

(২) বিদর্ভ, বেরার অঞ্চল;

(৩) অপরান্তক, ভারতের পশ্চিম প্রান্ত বা উত্তর কংকণ, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত অঞ্চল;

(৪) আভীর, সৌরাষ্ট্রের সংলগ্ন অঞ্চল;

(৫) সৌরাষ্ট্র, গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াবাড় অঞ্চল;

(৬) বৎসগুল্ম, একমতে দাক্ষিণাত্যের অঞ্চলবিশেষ;

(৭) গৌড়, মালদহের অন্তর্গত অঞ্চল;

(৮) বঙ্গ, পশ্চিমবাংলা অঞ্চল, Rapson-এর মত অনুসারে); মতান্তরে পূর্ববাংলা অঞ্চল;

(৯) অঙ্গ, বিহারের অন্তর্গত মুঙ্গের ও ভাগলপুর অঞ্চল;

(১০) কলিঙ্গ, বর্তমান উড়িষ্যার অন্তর্গত অঞ্চল,

(১১) সিন্ধুদেশ, সিন্ধু তীরবর্তী অঞ্চল;

(১২) বাহ্লিক, Bactria;

(১৩ স্ত্রীরাজ্য, স্ত্রীলোকের আধিপত্য-যুক্ত উত্তর-পশ্চিম প্রান্তীয় কোন অঞ্চল (?) ইত্যাদি।

(Ancient India, E. J. Rapson, 1960, pp. 78-87)

সম্ভবত বাৎস্যায়ন পশ্চিম ভারতের লোক ছিলেন এবং তাঁর সময়ের নগর-জীবনের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেছিলেন। নগরের বিলাসী নাগরকদের পারস্পরিক সমাচার তথা গণিকা সমাচার বিষয়ে তাঁর বিবরণগুলি অংশতঃ নির্ভরযোগ্য হতে পারে। প্রাচীন ভারতে গণিকা-সম্পর্ক অভিজাত-মহলে নিন্দনীয় ছিল না এই প্রকার ধারণা হয়। শহর অঞ্চলের পক্ষে বিশেষভাবে একথা প্রযোজ্য।

কৌটিল্য প্রদত্ত বিবরণেও গণিকার উচ্চ মর্যাদা প্রতীত হয়। রাজসভায় গণিকারা বিভিন্ন মর্যাদায় আসীন এবং অলঙ্কার-স্বরূপ ছিল। রাজকীয় নীতি অনুসারে গণিকারা অন্তঃপুরে নিযুক্ত হত।

বিনয়-গ্রন্থ অনুসারে আম্রপালী ছিলেন বৈশালীর ধনী-কন্যা। বৈশালী বিহারের অন্তর্গত অঞ্চল। বহু ধনী তরুণ তাঁর পাণি-প্রার্থী হলে তাঁর পিতা ব্যাপারটা লিচ্ছবি নামক গণের গোচর করলেন। লিচ্ছবিদের বিচারে আম্রপালী স্ত্রীরত্ন রূপে বিবেচিতা হলেন। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী তাঁর পক্ষে ব্যক্তিবিশেষের গৃহিণী হওয়া সাজে না। তাঁকে হতে হবে গণের উপভোগ্যা। আম্রপালী সম্মতি না দিয়ে পারলেন না।

আম্রপালী চতুঃষষ্টি কলায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। রাজা বিম্বিসার তাঁর রূপ ও গুণের কথা শ্রবণ করেন। বৈশালীতে এসে তাঁর সঙ্গে অবস্থান

করেন। রাজার ঔরসে আম্রপালীর গর্ভজাত পুত্র রাজসভায় উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন।

গৌতম বুদ্ধ বৈশালীর নিকটে উপস্থিত হলে আম্রপালী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বহু উপদেশ শ্রবণ করেন। পরদিবসে নিজগৃহে ভোজনের জন্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন। লিচ্ছবিদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ক'রে বুদ্ধ আম্রপালীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। ঈদৃশ কাহিনীতে গণিকার উচ্চ সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি পরিস্ফুট হয়। [pp. 568-570, The age of Imperial Unity, 1960.]

প্রাচীন এথেন্সের Hetairai (বেশ্যা) এবং প্রাচীন ভারতের গণিকার বিশেষ মর্যাদা পণ্ডিত-মহলে স্বীকৃত। এথেন্স অঞ্চলে প্রাচীন কালে ঘরের গৃহিণীরা অনেকটা বন্দিনী-সদৃশা ছিল, কিন্তু হিটেইরাই-এর বিবিধ গুণপনা উচ্চ সামাজিক সম্মান-ভূষিত হত। প্রাচীন ভারতীয় শহরে সমাজের দৃশ্যটাও কতকটা এই প্রকার।

অধুনাতন কালেও গণিকা-প্রথা লুপ্ত হয়ে যায়নি,—বৈশিক সংগঠন পুরাতন শহরগুলিতে রয়েছে ছড়িয়ে এবং নানাজাতীয় নূতন ধাঁচের গণিকা-বৃত্তি বিকশিত হয়েছে, যা পূর্বের সামাজিক ব্যবস্থায় এতখানি প্রকট ছিল না। কয়েক দশক পূর্বে যৌন ব্যবসায় বাজারিয়া পণ্য-বিক্রয়ের আকারে শহরে-গঞ্জে বিরাজ করত, কিন্তু সমাজ-জীবন ও গণিকা-পল্লীর মধ্যে একটা ব্যবধান রক্ষিত হত। বর্তমানে সমাজ জীবনে যৌন ব্যবসায় প্রবেশ করেছে, বিশেষত মধ্য ও নিম্ন সমাজ-স্তরে। এর মূল কারণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়। গরীবের ঘরে এরূপ ব্যবসায় অনেক ক্ষেত্রে প্রায় পারিবারিক বেশ্যাবৃত্তি-রূপে গণ্য হতে পারে। আর এক প্রকার দুর্নীতি যৌন অপূরণ-জনিত; তার দৃষ্টান্ত-স্থল হচ্ছে অবিবাহিতা তরুণী বা চাকুরিয়া যুবতী। এরূপ ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক পটভূমি নেই এমন কথা বলা চলে না। পণপ্রথার দরুণ অসচ্ছল অবস্থার ঘরে উপযুক্ত পাত্রের অভাব ঘটে এবং কুমারী-জীবনের অপূর্ণ কাম ব্যভিচারের কবলিত হয়। অল্প আয়ের গ্লানি দূরীকরণে যৌন ব্যবসায় কোন কোন ক্ষেত্রে শহরে রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামাজিক নৈতিকতা এখন আর পূর্বেকার টাবু (taboo) দ্বারা শহর অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। টাবুগুলি সামাজিক পরিবেশে নিয়ন্ত্রণের কাজ করে এবং যৌন বৃত্তিকে সংযত রাখে। বর্তমানে এ জাতীয় নিষেধ ধর্মীয় আকৃতি হারিয়ে ফেলেছে। যৌন স্খলনে কোন পাপের তাৎপর্য বহুস্থলে বিশ্বাসের বিষয় নয়। জড়বাদের সংক্রমণ যৌন জীবনকে নব্য তাৎপর্য দান করছে, যা কয়েক দশক পূর্বে ছিল অভাবনীয়। পাপের ধারণা-মুক্ত যৌন আচরণরীতি রূপান্তর লাভ করছে, যদিও আশ্চর্যের বিষয় এই যে কানীন বা ব্যভিচারজ সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি কোথাও নেই।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ-কৌশল কিংবা ক্লিনিকের যান্ত্রিক ভ্রূণ-নাশ-পদ্ধতি প্রাক্‌বিবাহ যৌনতাকে বিচিত্র সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু নব্য দৃষ্টিভঙ্গী ভোগসুখের বহির্ভূত সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে অনবহিত। কোন কৌশল বা পদ্ধতির ব্যর্থতায় নবজাত অবৈধ সন্তান আজও তার জনক-জননীর পরিচয়-বঞ্চিত হয়ে অনাথ আশ্রমে প্রবেশ করে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নব্য ভারতকে নানাভাবে গ্রাস করছে এবং একটা ব্যাপার ঘটছে, যাকে বলা চলে স্বকীয় সংস্কৃতি-বিলোপ (acculturation)। দেশজ নৈতিকতা নূতন প্রভাবের দ্বারা প্রায় বিপর্যস্ত হতে চলেছে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই রূপান্তর সমাজ-জীবনে বিপুল পরিবর্তন সূচিত করছে, যার প্রারম্ভিক অধ্যায়মাত্র শুরু হয়েছে।

শহরে ভোগবাদ কত দূর অগ্রসর হতে পারে? প্রাচীন ভারতীয় শহরের নিদর্শন আলোচিত হয়েছে,—সেই আলেখ্য খুব রুচিকর নয়। হালের শহরে নৈতিকতা নৈশ আমোদ-প্রমোদের নিকেতনে আকণ্ঠ মগ্ন। শহুরে নৈতিকতা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও ভোগমুখীন। সংযমের নীতিবাক্য কোথাও অনুসৃত হতে দেখা যাচ্ছে না। এর ফলে কি একক পরিবার বা দাম্পত্য জীবন বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে? বোধ হয় সেরূপ সম্ভাবনা আপাতত নেই। আদিম সমাজের নিদর্শনে পরিবার-প্রথার অভাব কোথাও লক্ষিত হয়নি। অবাধ যৌনতার কোন বাস্তব নিদর্শন কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। যে সব ক্ষেত্রে প্রাক্‌বিবাহ যৌনতা বা বিবাহোত্তর ব্যভিচার সামাজিক সমর্থন-প্রাপ্ত, সেক্ষেত্রেও পরিবার-প্রথা বর্তমান। নব্য ভোগবাদ পরিবার-প্রথাকে খণ্ডিত করতে পারবে না, যদিও তা যৌন শিথিলতাকে সহ্য করতে অভ্যস্ত হবে।

নিছক যৌনতা যদি পরিবারের ভিত্তি হত, তাহলে ভোগবাদের প্রসারের ফলে যৌন তৃপ্তির অধিক কিছু চিন্তনীয় হত না এবং পরিবারের প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত। কিন্তু শহুরে পরিবেশ ব্যক্তিকে যেন জন-সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং তার একাকিত্বকে প্রতি পদে পদে প্রকট করতে থাকে। রক্ত-সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্যতা শহুরে দৃষ্টিভঙ্গীতে ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকে। এর ফলাফল হয় সুদূরপ্রসারী। ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সম্পর্ক-বোধ গভীর আন্তরিকতা-যুক্ত এবং সকলের নিকটে সকলে পরিচিত,—কেউ কারও অচেনা নয়। বৃহৎ সমাজে জন-সংখ্যা বিপুল-পরিমাণ এবং সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় কল্পনাতীত;—সামাজিক বন্ধন নিছক ভাব-গত, বস্তুগত নয়। এক্ষেত্রে সকলেই বেশ অনুভব করে যে কেউ কারও নয়। "সকলের তরে সকলে আমরা"—এই সমষ্টিগত নীতি বৃহৎক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে নিছক অর্থহীন ধারণায় পর্যবসিত হয়। এই কারণেই একটা আকর্ষণ-কেন্দ্র আবশ্যক হয়ে ওঠে ব্যক্তির জীবনে। ক্লাব্‌, সংঘ বা বহু লোকের প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির নিঃসঙ্গতাকে দূর

করতে অক্ষম। একমাত্র পারিবারিক বন্ধনে মানসিক আশ্রয় মেলে, যা অন্য কোন প্রকারেই আয়ত্ত নয়। স্বামী-স্ত্রী-মূলক পরিবার শহুরে জীবনে অপরিহার্য প্রয়োজন। একথা সত্যি যে শহুরে সমাজ অনেক বাহ্যিক আকর্ষণ (ক্লাব, রেস্তোরাঁ, সমিতি, পার্টি ইত্যাদি) সৃষ্টি করেছে এবং পরিবার-বিমুখ ও রক্তসম্পর্ক-বিমুখ মনোভাবকে ইন্ধন দিয়েছে, কিন্তু এই আকর্ষণগুলি কৃত্রিম বন্ধন মাত্র, পরিবারের বিকল্পরূপে গণ্য হতে পারে না। বাহ্যিক উপভোগের চেয়েও স্থায়ী নির্ভরযোগ্য আশ্রয় ও আকর্ষণকেন্দ্র ব্যক্তির নিকটে অধিকতর কাম্য এবং তা হচ্ছে দাম্পত্য-সম্পর্ক। তাই পরিবার-প্রথার বিলুপ্তির কথা ভাবা যায় না।

নবম প্রকরণ :

মৃচ্ছকটিকম্ নাট্যগ্রন্থে শহরের বিবরণ

(১) গ্রন্থ পরিচয়।

লুই রেণো মৃচ্ছকটিক প্রকরণকে চতুর্থ শতকে স্থাপন করেছেন এবং তাঁর মতে এই প্রকরণ বা নাট্যগ্রন্থ হচ্ছে "The liveliest comedy of manners which Ancient India has left us." (p. 15. The Civilization of Ancient India, tr., 1959)

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে গণিকার একটি বিশেষ স্থান ছিল এবং গণিকা বিষয়ক "কথা" বা গল্প উপাখ্যান প্রচলিত হয়েছিল, যার নিদর্শন কথাসরিৎ-সাগরে সংরক্ষিত হয়েছে। কথাসাহিত্যের উৎস থেকে সম্ভবত Hetaera Drama বা গণিকা-নাট্যের প্রচলন হয়। গণিকা-নাট্যের অসমাপ্ত অংশ অশ্বঘোষের রচনার পাণ্ডুলিপির সঙ্গে একত্র গ্রথিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নাটকে বেশ্যা, বিদূষক, নায়ক, দুষ্ট প্রভৃতি চরিত্র; পুরাতন উদ্যান, শকটে আরোহণ, গণিকা-গৃহ প্রভৃতির সমাবেশ মৃচ্ছকটিকের বিষয়-সন্নিবেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গণিকা-নাট্যের রচয়িতা অশ্বঘোষ হতে পারেন, যদিও এই বিষয়ে জোর ক'রে কিছু বলা যায় না। এর পরবর্তী গণিকা-নাট্যের নমুনা ভাস-কৃত "চারুদত্ত"। এর কাহিনীতে গণিকা বসন্তসেনার সঙ্গে চারুদত্তের প্রেম; রাজশ্যালক কর্তৃক বসন্তসেনাকে অনুগমন; চারুদত্তের গৃহে বসন্ত-সেনার আশ্রয় গ্রহণ এবং নিজ গহনা গচ্ছিতকরণ; গহনা-চুরি; চোরের সহিত বসন্তসেনার পরিচারিকার প্রণয়;—উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ। এই সকল ঘটনা ও চরিত্র মৃচ্ছকটিকেও লক্ষিত হয়। ভাসের "চারুদত্ত" অসমাপ্ত। এর সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের প্রথম চারি অংকের মিল রয়েছে। মৃচ্ছকটিকে গণিকা-কাহিনীর সঙ্গে রাজকীয় কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে। [pp. 83-85, 103, 104, 131, Sanskrit Drama, A. B. Keith, 1959]

মৃচ্ছকটিক মানে মাটি দিয়ে তৈরী খেলনা শকটিকা। একটি তুচ্ছ ঘটনা থেকে প্রকরণের নামকরণ। চারুদত্তের গৃহে বসন্তসেনার উপস্থিতিতে চারু-দত্তের পুত্র রোহসেন নিজ মৃত্তিকাশকটিকা হাতে নিয়ে কাঁদছে। প্রতি-বেশীর গৃহে সে স্বর্ণশকটিকা নিয়ে খেলা করেছে। একটি স্বর্ণ-শকটিকার জন্য তার অভিমান ও রোদন। বসন্তসেনা তাকে অলঙ্কার দিয়ে স্বর্ণ-শকটিকা তৈরী ক'রে নিতে বলছে। এই ঘটনার সূত্রে প্রকরণের নাম

মৃচ্ছকটিকম্। মূল বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ বণিক চারুদত্ত ও গণিকা বসন্তসেনার প্রেম। [মৃচ্ছকটিকম্, ৬ষ্ঠ অংক, নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ, ১৯৫০]

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে সংলাপযুক্ত রচনার নাম রূপক। রূপকের প্রকারভেদ নাটক, প্রকরণ ইত্যাদি। মৃচ্ছকটিক প্রকরণরূপে পরিচিত।

শূদ্রক মৃচ্ছকটিকের রচয়িতারূপে পরিচিত। এক মতে শূদ্রক কল্পিত নাম। এই প্রকরণের তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। গুপ্তযুগে এই তারিখ স্থাপন হয়ত অসমীচীন নয়। এই প্রকরণে পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা অনেক। এদের নাম ও পরিচয় উল্লিখিত হচ্ছে :

(ক) চারুদত্ত—ব্রাহ্মণ সার্থবাহ (বণিক্)।
রোহসেন—চারুদত্তের পুত্র।
ধূতা বধূ—চারুদত্তের পাণিগৃহীতী পত্নী।
মৈত্রেয়—চারুদত্তের বয়স্য, বিদূষক।
বর্ধমানক—চারুদত্তের পরিচারক চেট।
মদনিকা—চারুদত্তের পরিচারিকা চেটী।
ভিক্ষু সংবাহক—চারুদত্তের পূর্ব পরিচারক, দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্যূতোপজীবী, তৃতীয় পর্যায়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু।

(খ) বসন্তসেনা—চারুদত্তের প্রতি অনুরক্তা গণিকা।
বৃদ্ধা মাতা—বসন্তসেনার মাতা।
মদনিকা—বসন্তসেনার পরিচারিকা চেটী, শর্বিলকের প্রতি অনুরক্তা।
চেটী—বসন্তসেনার অন্যা পরিচারিকা।
কুম্ভীলক—বসন্তসেনার পরিচারক চেট।
কর্ণপূরক—বসন্তসেনার সেবক।
বিট—বসন্তসেনার পরিচারক।

(গ) পালক—মঞ্চে অনুপস্থিত উজ্জয়িনীর রাজা।
সংস্থানক, শকার—উক্ত রাজার শ্যালক।
বিট—শকারের পরিচারক।
স্থাবরক—শকারের পরিচারক চেট।
চন্দনক—নগর-রক্ষী।
বীরক—নগর-রক্ষী।
অধিকরণিক—বিচারক।
শ্রেষ্ঠী—বিচারকের সহায়ক।
কায়স্থ—বিচারকের সহায়ক লেখক।
শোধনক—বিচারকর্মের সহায়ক।
গোহা চাণ্ডাল—বধকর্মে নিযুক্ত।
আহীন্তা চাণ্ডাল—বধকর্মে নিযুক্ত

মাথুর, সভিক—দ্যূতগৃহের অধ্যক্ষ।
দ্যূতকর—দ্যূতক্রীড়ক।
দর্দুরক—দ্যূতক্রীড়ক।

(ঘ) আর্যক—গোষ্ঠাধ্যক্ষ, পালককে হত্যা ক'রে উজ্জয়িনীর রাজ-সিংহাসন দখলকারী।

শর্বিলক—চৌর্যে নিযুক্ত, মদনিকার প্রণয়ী ব্রাহ্মণ।

(ঘটনার পরিণতিতে আর্যকের দলভুক্ত হয়েছে শর্বিলক, চন্দনক, দর্দুরক, শকারের পরিচারক বিট। আর্যক-কর্তৃক চারুদত্ত বান্ধব-রূপে স্বীকৃত হয়েছে।)

মৃচ্ছকটিক প্রকরণ দশ অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথম অঙ্কে আমুখ বা Prologue অন্তর্ভুক্ত। আমুখে সূত্রধার ও নটীর সংলাপ, হাস্যকৌতুকের সমাবেশ। প্রথম অঙ্কে শকার-চরিত্রের আভাস। দ্বিতীয় অঙ্কে জুয়াখেলার আলেখ্য। তৃতীয় অঙ্কে চৌর্য বৃত্তান্ত। চতুর্থ অঙ্কে মদনিকা ও শর্বিলকের বিবাহ। পঞ্চম অঙ্কে চারুদত্তের গৃহে বসন্তসেনার অভিসার। ষষ্ঠ অঙ্কে শকট-বিপর্যয়, আর্যকের পলায়ন। সপ্তম অঙ্কে চারুদত্তের সহিত আর্যকের সখ্য সংঘটন। অষ্টম অঙ্কে শকার কর্তৃক বসন্তসেনাকে মারণাঘাত। নবম অঙ্কে চারুদত্তের বিরুদ্ধে বসন্তসেনাকে হত্যার অভিযোগ উপস্থাপন, চারুদত্তের বধদণ্ড। দশম অঙ্কে পালকের পতন, আর্যকের রাজ্যপ্রাপ্তি, চারুদত্তের দণ্ডমুক্তি ও বসন্তসেনাকে বধূরূপে লাভ।

ঘটনা-স্থান চারুদত্তের গৃহ, বসন্তসেনার গৃহ, রাজপথ, পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান, শ্মশান। উজ্জয়িনী নগরীর পরিধিতে ঘটনাস্থল সীমাবদ্ধ।

(২) সমাজ চিত্র

শূদ্রক-কৃত মৃচ্ছকটিকে বর্ণিতব্য বিষয় প্রধানত গণিকাপ্রেম ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। নাটকীয় বিবরণে দুইটি গণিকা-বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। অত্যাচারী রাজার পতন ও জনপ্রিয় আর্যকের রাজ্যলাভ চিত্রিত হয়েছে। ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাভব চিত্রণ নাট্যকারের উদ্দেশ্য। গণিকা-প্রেম অধর্মীয় অনৈতিক ব্যাপার নয়। গণিকাকে বিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। গণিকা-বৃত্তির নিন্দা স্থানে স্থানে লক্ষিত হয় বিদূষকের উক্তিতে, শর্বিলকের উক্তিতে বা অন্যত্র। কিন্তু বিদূষক গণিকা-বিবাহের বিরোধিতা করে নি। শর্বিলক নিজেই গণিকা মদনিকাকে বিবাহ করেছে। উজ্জয়িনী নগরের খ্যাতনামা নাগরিক চারুদত্ত গণিকা বসন্তসেনাকে বিবাহ করেছে। কিন্তু গণিকাকে ইচ্ছামাত্রই বিবাহ করা চলে না। গণিকা ইচ্ছা করলেই তার বৃত্তি ত্যাগ করতে পারে না। গণিকা বৃত্তি থেকে নিষ্কৃতির জন্য নিষ্ক্রয় বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় কিংবা রাজার অনুমোদন আবশ্যক হয়। মদনিকা বসন্ত-সেনার পরিচারিকা চেটী। গণিকার চেটীও বেশ্যা। মদনিকাকে চেটীবৃত্তি (slavery) বা গণিকাবৃত্তি থেকে মুক্ত করবার জন্য তার কর্ত্রীকে নিষ্ক্রয়

দানের কথা ভেবেছে শর্বিলক। নিষ্ক্রয় অবশ্য দিতে হয় নি। বসন্তসেনা স্বেচ্ছায় মদনিকাকে মুক্তি দিয়েছে। রাজ্যলাভের পরে আর্যক বসন্তসেনাকে গণিকাবৃত্তি থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে এবং বসন্তসেনাও চারুদত্তের বধূরূপে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মৃচ্ছকটিক-চিত্রিত সমাজে দাসত্ব বা গোলামী (slavery) চালু ছিল। চেট ও চেটীরা গোলাম ছাড়া অন্য কিছু নয়। চেট বা চেটী প্রভুর বা কর্ত্রীর অধীন। দাসবৃত্তি বা দাসীবৃত্তি ইচ্ছানুসারে বর্জন করা যায় না। প্রভুর বা কর্ত্রীর অনুমতি আবশ্যক হয় এই ব্যাপারে। উচ্চতর রাজকীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমেও দাসত্ব থেকে মুক্তি ঘটতে পারে। শর্বিলক স্থাবরকের প্রসঙ্গ তুললে চারুদত্ত বলছে,—স্থাবরক সুবৃত্ত, অর্থাৎ, শোভন-আচরণ যুক্ত, সুতরাং সে অদাসরূপে পরিচিত হোক। এই নির্দেশ দানের সময়ে চারুদত্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতির পদে অধিষ্ঠিত।

চেট বা চেটীর সামাজিক মর্যাদা প্রায় নেই। শকার ও চেটের কথোপকথনে চেটের নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বসন্তসেনাকে হত্যা করতে স্থাবরককে প্ররোচিত করছে শকার। তাকে নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছে। তখন উভয়ের সংলাপ।

শকার। তুমি আমার ভৃত্য হয়ে কি ভয় করছ ?

চেট। ভট্টক, পরলোকের।

[ভট্টক, ভট্টারককরূপে মর্যাদাবান্‌কে সম্বোধন রীতি। একালে বাবুরূপে, সাহেবরূপে সম্বোধন রীতি।]

শকার। কি সেই পরলোক ?

চেট। ভট্টক, সুকৃত ও দুষ্কৃতের পরিণাম।

শকার। সুকৃতের পরিণাম কিরূপ ?

চেট। যেমন ভট্টক বহু সুবর্ণমণ্ডিত।

শকার। দুষ্কৃতের পরিণাম কিরূপ ?

চেট। যেমন আমি পরপিণ্ড (পরান্ন) ভক্ষক। তাই অকার্য (হত্যা) করব না। (৮ম অংক)

অবাধ্য চেটকে বহুবিধ তাড়না ক'রেও হত্যাকর্মে নিয়োজিত করা যায় নি। "পরলোক-ভীরু গর্ভদাস" শকারের নিকটে ঘৃণার পাত্র। চেটের দৃষ্টিতে গোলামীর বিড়ম্বনা পূর্বজন্মকৃত কুকর্মের ফল। শকার-সদৃশ শহুরে অভিজাতরা পরলোকের ব্যাপারে ঘোরতর অবিশ্বাসী।

দাসের শরীরের উপর প্রভুর অধিকার স্বীকৃত। দাসকে খুশীমতো মারধোর করা চলে। শকারের কাছ থেকে চেট বেদম প্রহার খেয়েছে, তবু প্রতিবাদ জানায় নি।

সংবাহক (shampooer) বোধ হয় চেটের পর্যায়ভুক্ত ছিল না। সংবাহন (অঙ্গমর্দন) বৃত্তি ছিল তার চারুদত্তের গৃহে। বসন্তসেনা সংবাহনকে "সুকুমার কলা"-রূপে গণ্য করছে। বসন্তসেনার দুই পরিচারিকা চেটীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় প্রকরণে। তাদের একজন মদনিকা। মদনিকার সঙ্গে বসন্তসেনা নিজ প্রণয়ী সংক্রান্ত আলাপনে কুণ্ঠিতা নয়। (২য় অংক)। অপরা চেটীর পরামর্শ সে নিচ্ছে চারুদত্তের সঙ্গে সংলাপকালে। গহনা সংক্রান্ত সংলাপে এই চেটীর ভূমিকা লক্ষণীয়। (৫ম অংক)।

মদনিকা ও শর্বিলকের সংবাদ (dialogue) বেশ চিত্তরোচক। মদনিকা শর্বিলককে চুরির বিষয় গোপন করতে নিপুণ পরামর্শ দিচ্ছে। এই ব্যাপারে "স্ত্রিয়ঃ নিসর্গাৎ এব পণ্ডিতাঃ"—স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই চতুর। শর্বিলক মদনিকার বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করে। তার মুখ-নিসৃত নারী-বিগর্হণ ও বেশ্যা-বিদূষণ চারুদত্তের প্রতি ঈর্ষাজনিত। তার ভ্রম হয়েছিল যে মদনিকা চারুদত্তকে ভালবাসে। তার ক্রোধ নৈপুণ্যসহকারে প্রশমিত করছে মদনিকা। বসন্তসেনার গৃহের বর্ণনায় গৃহস্থিত বহু চেট ও চেটীর কথা জানা যায়। কুম্ভীলক বসন্তসেনার একজন পরিচারক। সে পরিহাস-দক্ষ। (৫ম অংক)। অভিসারকালে বসন্তসেনার ছত্রধারিণী সম্ভবত চেটী।

চেট বর্ধমানক গাড়ীচালকও বটে। চেট স্থাবরকও গাড়ীচালক। চেটী মদনিকা চারুদত্তের গৃহে বহু দায়িত্ব পালন করে। চোর-কৃত সিঁধ সে আবিষ্কার করেছে। সে ঘুমিয়েছিল। ঘুম ভাঙলে প্রভুর ঘর দুয়ার লক্ষ্য করছে। প্রভুর সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে তার উদ্বেগ দৃষ্টিআকর্ষক। চেট বর্ধমানক গচ্ছিত অলঙ্কার দিনের বেলায় পাহারা দেয়। তাকে তার প্রভু বিশ্বাস করে। চারুদত্তের ও বসন্তসেনার গৃহে দাস দাসীরা বিশ্বাসভাজন। তাদের প্রভুভক্তির নিদর্শনও সুলভ।

বিদূষক মোসাহেবশ্রেণীর চরিত্র। বোধ হয় প্রাচীন ভারতের শহরে আভিজাত্যের অঙ্গস্বরূপ। চারুদত্ত সার্থবাহ (বণিক্) রূপে পরিচিত এবং অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিদূষক। অভিজাতকে ঘিরে মোসাহেবরা থাকত,—চেট চেটীরা হুকুম পালন করত। মোসাহেবদের বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকে নাটকে বিদূষকের আমদানি। বিটরাও অভিজাত ঘেঁষা। শকারের সঙ্গে একজন, বসন্তসেনার সঙ্গে আর একজন বিট সংশ্লিষ্ট। বিটরা সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্। সংস্কৃতভাষায় কথা বলে। বিদূষকের আলাপ প্রাকৃত ভাষায়। চৌর্যরত শর্বিলক জাত চোর নয়। প্রেমের প্রয়োজনে তার গহনা চুরি। সে সংস্কৃতভাষী। বসন্তসেনা আভিজাত্যসচেতন, কথা বলে প্রাকৃত ভাষায়। স্বকীয় বিটের সঙ্গে সংলাপে তাকে আমরা একস্থলে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতে দেখি। বিটকে "ভাব" (=মহাশয়) পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। অভিজাতকে ভট্টকরূপে সম্বোধন দৃষ্ট হয়।

ভদ্র, ভদ্রা, আর্য, আর্যা, ভাব, বয়স্য, ভট্টারক, সখা প্রভৃতি সম্বোধন পদ দৃষ্ট হয়। আর্য-পদ আভিজাত্য-সূচক। তারই অনুরূপ ভট্টারক-পদ। অধিকরণিক চারুদত্তকে আর্যরূপে সম্বোধন করছে। শোধনক অধিকরণের (বিচারালয়ের) পরিচালক। সে বসন্তসেনার মাতাকে আর্যারূপে সম্বোধন করছে। পত্নী পতিকে সম্বোধন করে আর্যপুত্র-রূপে। [দশম অংকে ধূতা কর্তৃক চারুদত্তকে সম্বোধন।]

চারুদত্ত সার্থবাহের (বণিকের) পৌত্র। তার গৃহ শ্রেষ্ঠীচত্বরে, অর্থাৎ, বেণেপাড়ায়। অধিকরণ মণ্ডপে অধিকরণিকের সহায়ক শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ,—তারা কথা বলে প্রাকৃত ভাষায়। কায়স্থ লেখক বা কেরাণী, ব্যবহার (মামলা) সংক্রান্ত বিবরণ লেখে। বর্তমান কালে বাংলাদেশে কায়স্থ একটি বর্ণ বা জাত। রাজকর্মচারীরা কালে কালে একটি জাতে পরিণত হয়েছে। শ্রেষ্ঠী (আধুনিক শেঠদের পূর্বগামী) বোধ হয় বিত্তবান্ বণিক্। আদালতে শ্রেষ্ঠীর বিশেষ মর্যাদা প্রতিভাত হচ্ছে। চারুদত্ত বৃত্তিতে বণিক্, জাতে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হয়ে গণিকাকে বিবাহ করছে, অথচ তার সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকছে। শর্বিলক চুরিতে দক্ষ, যদিও চুরি তার পেশা নয়। সে জাতে ব্রাহ্মণ। সেও গণিকাকে বিবাহ ক'রে সমাজে পতিত হয় নি। গোয়ালা আর্যক রাজা-রূপে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এই সামাজিক দৃশ্যে বৃত্তিগত বর্ণভেদের পরিবর্তে জন্মগত বর্ণভেদের নজীর মিলছে। এই চিত্রটি তুলনীয় দশ-ব্রাহ্মণ-জাতকে প্রাপ্ত বিবরণের সঙ্গে। দশ-ব্রাহ্মণ-জাতক অনুসারে বৈদ্যব্যবসায়ী, রথশিল্পে পটু, পণ্যবিক্রয়কারী, কৃষিজীবী, বাণিজ্যজীবী, ছাগমেষ-পালক, মাংসবিক্রেতা, অসিধারক, ব্যাধ-বৃত্তিরত ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব জানা যায়।

শকারের চরিত্রের মধ্যে একটি আধুনিক সামাজিক বিদূষণ-রীতির উৎস যেন খুঁজে পাওয়া যায়। শকার রাজশ্যালক। রাজার শ্যালকরূপে পরিচিতিতে তার গর্বের সীমা নেই। কোনপ্রকার নৈতিক বা ধর্মীয় জড়তা তার নেই। তার অসাধ্য কোন কুকর্ম নেই। সে মিথ্যাকে সত্য বানায়, নিরপরাধকে অপরাধী প্রতিপন্ন করে। অধিকরণে তার মামলা উত্থাপন বিচারককে শঙ্কিত ক'রে তোলে। এই জাতীয় শকার সম্ভবত একটা টাইপচরিত্র, সমাজস্থ অভিজাত বড়লোকদের শ্যালকদের প্রতিনিধিস্থানীয়। যাদের ভগিনীপতিরা সেকালে ঐশ্বর্যবান ও ক্ষমতাবান ছিল, তারা বুক ফুলিয়ে ধৃষ্টতা দেখাত এবং কুকর্মের ছাড়পত্র লাভ করত। তাদের অকার্য নিন্দিত হলেও সহজে বাধা পেত না। তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবিধান প্রায় অভাবনীয় ছিল। অভিজাতশ্রেণীর শ্যালকদের নৈতিক স্খলন কালে কালে কিংবদন্তীতে দাঁড়ায় এবং সাধারণভাবে শ্যালক-পরিচয় ও দুঃশীলতা একীভূত হতে থাকে। যে কুকার্যকারী সেই শ্যালক বা শালা পদ-বাচ্য। গুণ্ডা,

চোর, বদমায়েস, পাজী লোকমাত্রই শ্যালক-বিশেষণমণ্ডিত। বঙ্গীয় সমাজে গালিগালাজের অভিধানে শ্যালক পদটি বিশেষ স্থান দখল করেছে। 'শালা" শব্দের সমারোহ ঝগড়া-বিবাদে, কলহস্থানে প্রায় সার্বজনিক। শত্রুস্থানীয়কে, ঘৃণাভাজনকে শ্যালকরূপে সম্বোধন বা বিদূষণ সামাজিক রীতি। বিড়ম্বনামাত্রই শ্যালক কৃত। পকেটমারও শালা, কেননা সে বিড়ম্বনার কারণ। আবার অফিসের বড়কর্তা বা বড়বাবুটিও শালা অনুরূপ কারণ বশত। রূঢ়ভাষী প্রশাসনিক বিনা দোষে অধস্তনদের বিনোদচক্রে শালা পদবীতে ভূষিত হয়।

শকারের বিপরীত চরিত্র চারুদত্ত। সে পুরাপুরি সজ্জন। অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী। শকার তার উপর মিথ্যা হত্যাপরাধ চাপিয়েছে। কিন্তু সে শকারকে শাস্তিদান প্রসঙ্গে শর্বিলককে বলছে,—অপকারীকে বধের সামিল হচ্ছে পাল্টা উপকার, কুকুরের মুখে প্রদান নয়। বসন্তসেনা বোধ হয় শকারের শাস্তি চেয়েছে, যেহেতু সে চারুদত্তের কণ্ঠ থেকে বধ্যমালা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে শকারের উপর। অথচ বসন্তসেনা বুদ্ধোপাসিকা। বৌদ্ধধর্মের প্রতি পক্ষপাতের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকরণে স্থানে স্থানে পরিস্ফুট। সংবাহক বৌদ্ধ বিহারে শ্রমণ হয়েছে। চারুদত্তের উপরেও বৌদ্ধ প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। তার দুই বিবাহ প্রাচীন রীতিসম্মত। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ অভিজাত রীতি। সপত্নী বিদ্যমানে বসন্তসেনার বধূপদ গ্রহণে আপত্তি নেই। আবার ধূতাও সপত্নীকে ঈর্ষা করেনি, ভগিনীরূপে গ্রহণ করেছে। দ্বি-স্ত্রী-বিবাহজাত পরিবারের এই দৃষ্টান্তে সপত্নী বিদ্বেষের কোন আভাস নেই। তাই বলে একথা বলা যায় না যে এজাতীয় পরিবার সর্বক্ষেত্রেই সপত্নী-বিদ্বেষমুক্ত ছিল। [চারুদত্তের পূর্বস্ত্রী ধূতা, দ্বিতীয়া স্ত্রী বসন্তসেনা।]

গণিকাবিবাহ সামাজিক অনুমোদন পেলেও প্রশংসিত হত কিনা বলা কঠিন। গণিকারা সর্বক্ষেত্রেই উচ্চ মর্যাদায় আরূঢ়া ছিল না। তাদের ভিতরেও আর্থিক সম্পদ অনুসারে অভিজাত ও অনভিজাত ছিল। বসন্তসেনার উদাহরণ অভিজাত স্তরের। তার সঙ্গে চারুদত্তের সম্পর্ক আদালতের চোখে প্রশংসার যোগ্য নয়। লৌকিক অভিমতে গণিকা-সম্পর্ক নিন্দনীয়ও নয়। গণিকার সম্মান ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল সমাজে।

প্রকরণের অন্তর্গত কয়েকটি উক্তিতে সামাজিক হালচাল আন্দাজ করা যায়। বিদূষকের একটি উক্তি,—

অবঞ্চক বণিক্, অচোর স্বর্ণকার, অকলহ গ্রাম-সমাগম, অলুব্ধা গণিকা দুর্লভ। (৫ম অংক)

অর্থাৎ, বণিকের বঞ্চনা, স্যাকরার স্বর্ণচৌর্য, গ্রাম্য সভাসমিতিতে ঝগড়া-কলহ, গণিকার অর্থলোভ মৃচ্ছকটিকের আমলেও সুবিদিত ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যে কম দামের পণ্য বেশি দামে বিক্রয় স্বাভাবিক রীতি এবং সব

কালের পক্ষে প্রযোজ্য। অতি মুনাফার দিকে ঝোঁক ছিল কিনা বোঝা যায় না। গহনা তৈরী করতে খাদ বা পান মিশ্রণ সেকালেও রেওয়াজ ছিল। সুযোগ বুঝে স্যাকরা সোণা চুরি করত। একালের মতো সেকালেও গ্রাম্য কোন্দল ছিল।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অর্থশাস্ত্রে স্বর্ণকার সম্বন্ধে কয়েকটি অপরাধ ও তৎসংক্রান্ত দণ্ড কথিত হয়েছে। গৃহীত সোণা বা রূপার অংশ চুরি করত স্বর্ণকার। অপসারণ-প্রণালীতে চুরি করত কিংবা যোগ প্রণালীতে।
—৪।১২৭—৩০।

ক্রয়কালে পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিক্রয়কালে পণ্যের পরিমাণ হ্রাস বণিকের তরফে অপরাধ। ধান্য (ফসল), স্নেহ (তৈল), লবণ, গন্ধ (গন্ধদ্রব্য), ভৈষজ্য (ঔষধ-দ্রব্য) সংক্রান্ত সমবর্ণ-উপধান, অর্থাৎ, ভেজাল—দণ্ডনীয় অপরাধ।
—৪।২।১৩, ২২।]

বিদূষকের আর একটি উক্তি,—

প্রদোষকালে রাজপথে গণিকা, চেট, বিট ও রাজবল্লভদের, অর্থাৎ, রাজার প্রিয়পাত্রদের ভীড় জমতে থাকে। এদের মুখোমুখী হওয়ার অর্থ মণ্ডূক-লুব্ধ কালসর্পের মুখে মূষিকের পতন। (১ম অংক)

এক্ষেত্রে রাজার পার্শ্বচর অভিজাতদের সম্বন্ধে পথভীতি দৃষ্ট হচ্ছে। তাদের নানাবিধ দৌরাত্ম্য সাধারণ নাগরিকদের ভয় উৎপাদন করত।

রাজপুরুষদের, নগর-রক্ষীদের মধ্যে রাজভীতি, কর্তব্যচ্যুতি, মিথ্যাচার কখনও কখনও দেখা যেত। অধিকরণিক শকারের মামলা প্রথমেই গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। কিন্তু শকার ভয় দেখাল যে রাজার সহায়তায় অধিকরণিকের পদচ্যুতি ঘটাবে। তখন নিতান্ত ভীত হয়ে অধিকরণিক শকারের ব্যবহার (মামলা) মঞ্জুর করল। আবার, যখন অভিযোগ সম্বন্ধীয় জেরা চলছে, তখন বীরক প্রেরিত হল বসন্তসেনার শব-বিষয়ক তদন্তে। বীরক-প্রদত্ত বিবরণ যে কল্পিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। একালের বহু পুলিশ রিপোর্টের মতো সেকালের পুলিশ-তদন্তেও অলীক সংযোজন-বিযোজন হত।

বিচার দৃশ্যটি সেকালের বিচারালয়ের একটি চমৎকার আলেখ্য। সেকালের বিচারেও অপরাধ সংক্রান্ত জেরার ব্যবস্থা ছিল। জেরার ভিতর দিয়ে প্রকৃত অপরাধী নির্ণয়ের চেষ্টা চলত। চেষ্টা সর্বদা সফল হত না। তার প্রমাণ নিরপরাধ চারুদত্তের দণ্ডলাভ। চারুদত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয়েছে যে সে বসন্তসেনাকে গহনার লোভে হত্যা করেছে। বস্তুত বসন্তসেনার আঘাতকারী শকার। বসন্তসেনার মৃত্যু ঘটে নি। সে বেঁচে উঠেছে। চারুদত্তও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড হতে অব্যাহতি পেয়েছে।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণটি এক দিক দিয়ে কেচ্ছামূলক বা অপরাধমূলক। ক্রাইম-প্লট নাটকায় ঘটনার বহুলাংশ জুড়ে রয়েছে। শহরে জীবনের গ্লানি অভিজাত সমাজে অপরাধ প্রবণতা। Urban culture বা শহরে সংস্কৃতির অঙ্গ অপরাধ।

শহরে অপরাধের বিচারে অপরাধী বহুক্ষেত্রে খালাস পায়, শাস্তি হয় নিরপরাধের। বিচার-বিভ্রাট এড়াবার কোন উপায় নেই। অপরাধের স্থান রাজপথ কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যান কিংবা জুয়াখেলার আড্ডাস্থল। জুয়াখেলা নিন্দিত নয়। চারুদত্ত জুয়া না খেলেও ঘটনাচক্রে একস্থলে মর্যাদারক্ষার জন্য বসন্তসেনার নিকটে সামান্য মিথ্যার আশ্রয়ে নিজেকে জুয়াড়িরূপে প্রতিপন্ন করছে। দ্যূতক্রীড়া নিন্দনীয় হলে সে এরূপ করত না। জুয়াখেলায় পণ ফাঁকি দেওয়া অপরাধ। দর্দুরক ও সংবাহক সেই অপরাধে অপরাধী, যদিও বসন্তসেনার আনুকূল্যে সংবাহক দণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছে। শর্বিলক চৌর্য দ্বারা অপরাধী। চন্দনক রাজনির্দেশ লঙ্ঘনে অপরাধী। দর্দুরক, শর্বিলক, চন্দনক কোন না কোন দিক দিয়ে অপরাধী। তারা বিদ্রোহী দলভুক্ত হয়েছে। বিনা দোষে আর্যককে বন্দী ক'রে রাজা পালকও অপরাধী। রাজশ্যালক শকার তো সমাজ-বিরোধী অপরাধীর স্তরভুক্ত। কর্তৃপক্ষ যদি অপরাধী হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠান অন্যায় নয়,—এ কথাই বোধ হয় প্রকরণের প্রতিপাদ্য। আর্যকের হস্তে রাজা পালকের নিধন এবং আর্যকের রাজ্যপ্রাপ্তিতে এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠেছে।

(৩) নগর জীবনের চিত্র

মৃচ্ছকটিকে নগর-জীবন ও পৌর সমাজতত্ত্বের প্রচুর উপকরণ মিলছে। কোন কোন অংশে কামসূত্র কথিত নাগরক-জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি, আবার গণিকা-প্রেম, গণিকা-বিবাহ বিষয়ক চিত্রগুলি harlotry বা গণিকাবৃত্তির ব্যতিক্রম। মদনিকা ও বসন্তসেনা গণিকাপ্রথার যথার্থ নিদর্শন নয়। উভয়েই ঠিক নষ্টা নারী পর্যায়ভুক্তা নয়, বেশ্যা পরিবেশে নিতান্তই বেমানান। স্খলিত-চরিত্রা রমণীর কোন আচরণ এরা কোথাও দেখায়নি। অথচ বসন্তসেনার গৃহ বেশ্যালয়ের নিখুঁত ছবি। মদ্য ও শৃঙ্গার সেখানে বাধাহীনভাবে প্রবাহিত; শিল্পকলা বেশ্যার স্তর সহযোগিনী। বসন্তসেনার বিকল উদ্যান-যাত্রায় এককেন্দ্রিক প্রেম ছিল উদ্দীপনা, উচ্ছৃংখল সম্ভোগের প্রেরণা ছিল না। মদনিকা গার্হস্থ্য জীবনকে বরণ করেছে স্বাভাবিক প্রণয়বশেই। সম্ভবত পাঁকের ভিতর থেকে পদ্মফুল আহরণ করেছেন নাট্যকার। বেশ্যাজীবনের বৈশিষ্ট্য—অর্থের বিনিময়ে প্রেম বিক্রয়—শুধু কোন কোন উক্তিতে

প্রতিপাদিত হয়েছে, তার বাস্তব চিত্রণ বা ঘটনায় রূপায়ণ প্রকরণে নেই। কুট্টনীমতম্ কাব্যে গণিকা-বৃত্তির পণ্য-সদৃশ বাস্তব দিকগুলি সবিস্তারে যেমন উন্মোচিত হয়েছে, ঠিক সেজাতীয় অনুলিপি মৃচ্ছকটিকে নেই। তবে শকার সেকালের অভিজাত নির্বোধ বিলাসী নাগরক-রূপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শকারের প্রতিনিধি সর্বকালেই বোধ হয় নগরের পরিবেশে সুলভ। বঙ্গদেশীয় উনিশ-শতকীয় "নববাবুরাও" শকারের বংশধর, কিন্তু "নববিবিরা" ঠিক বসন্তসেনা বা মদনিকা নয়। মৃচ্ছকটিকের বিট কামসূত্রে বর্ণিত বিটের নকল নয়, তার শালীনতা আছে, পরলোক ভীতি আছে। সে বিলাসী নাগরক-রূপে চিত্রিত হয় নি। নাগরিক জীবনের জঞ্জাল হচ্ছে শকার, তার জুড়ি সমগ্র প্রকরণটিতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। শকার-চিত্রটি না থাকলে প্রকরণটি বোধ হয় জমত না।

জুয়াখেলা সেকালের নগর-জীবনের অঙ্গ ছিল। জুয়াখেলার গৃহ ছিল সরকারী তত্ত্বাবধানে। তার ভারপ্রাপ্ত ছিল সভিক। জুয়াড়িদের হার-জিৎ হত। সেই জয়-পরাজয়, পণ-আদায় তদারক করত সভিক। দ্যূতক্রীড়ার নেশায় সংবাহক নাস্তানাবুদ হয়েছে। তারই সমগোত্রীয় দর্দুরক। দর্দুরক সংবাহককে পলায়নে সাহায্য করেছে। কিন্তু তার পলায়ন-স্থান ধরে ফেলেছে সভিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত পণ আদায় না ক'রে সে ছাড়ে নি।

শহরে চোরদের মধ্যে গুরু-শিষ্য ছিল। গুরুরা চুরির কৌশল, সিঁধ (সন্ধি) কাটার ফন্দী-ফিকির শিক্ষা দিত একালের মতোই। চৌর্যাচার্যরা শিষ্যদের নিকটে ভক্তির পাত্র ছিল। পাকা দেয়ালে সন্ধি ছেদন খুব সহজ নয়, ছেদনযোগ্য ইট নির্বাচন কেরামতির ব্যাপার। মাঝে মাঝে সাপের ভয় আছে। দেয়ালের গর্তে সাপ লুকিয়ে থাকে। সাপ কামড়ালে অঙ্গুলী-বন্ধনের রীতি ছিল, চিকিৎসা (ঝাড়ফুঁক) ছিল। কার্তিকেয়কে চোরেরা নমস্কার জানাত, তিনি বিপদ থেকে চোরদের রক্ষা করেন। ঘরের দরজা খুলে রাখা হত, যাতে দরকার-মতো পলায়ন সম্ভব হয়। কপাট খোলার শব্দ যাতে না হয় সেজন্য কপাটে জল সিঞ্চিত হত। সুপ্ত ব্যক্তিরা প্রকৃতই ঘুমিয়ে রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হত। চোরদের কুসংস্কার (superstition) ছিল,—তার প্রমাণও মেলে। মাটির নীচে গুপ্তধন আছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য বীজ-পরীক্ষা আচরিত হত। যে স্থানে মাটির তলায় গুপ্তধন আছে, তার উপরে বীজ ফেললে বীজটি বিভক্ত হয়ে যাবে,—এরূপ বিশ্বাস ছিল। চোরেরা আয়ের কীট সঙ্গে রাখত। প্রদীপ জ্বললে ধরা পড়ার ভয়। প্রদীপ নেভাবার

অন্য কীট ছেড়ে দেওয়া হত দীপের উপর। তার পাখার ঝাপটায় নিভে যেত দীপ। শর্বিলকের স্বগত-ভাষণে কিছু কিছু চুরির তথ্য পাওয়া যায়। যতদূর মনে হয় সে চৌর্য-জীবী নয়, যদিও চুরির প্রণালীতে অভিজ্ঞ। তার চুরির উদ্দেশ্য ক্ষতিপূরণ সংগ্রহ,—ক্ষতিপূরণ দিয়ে বেশ্যালয় থেকে মদনিকাকে উদ্ধার।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে রাজপথের দৃশ্য, উদ্যানযাত্রা ও শকট (প্রবহণ) বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। রাজপথে বসন্তসেনার পাগলা হাতীর উৎপাত, পথচারীদের ত্রস্ত পলায়ন, বালকজনের অপসারণ, কারও কারও বৃক্ষে আরোহণ, ভীতা মহিলাদের নূপুর ও মেখলা স্খলন,—রোমাঞ্চকর পথ-চিত্র। রাজপথে শকটের ভীড়,—স্থাবরক শকটগুলিকে সরিয়ে দিচ্ছে, নিজের গাড়ীর চাকা বদলাচ্ছে, তার গাড়ীতেই ভ্রমবশত উঠে বসেছে বসন্তসেনা শকারের দ্বারা বিড়ম্বিতা হওয়ার জন্য। আবার এরূপ পরিস্থিতিতে রাজকীয় ঘোষণা রাজপথকে সন্ত্রস্ত করছে,—আর্যক গুপ্তি (বন্দীশালা) থেকে গুপ্তিপালককে হত্যা ক'রে পালিয়েছে। আর্যকের উক্তিতে বোঝা যায় যে গোষ্ঠী-যান, বধূসংযান, বহির্যান, গণিকা-প্রবহণ প্রভৃতি নানাজাতীয় শকটের প্রচলন ছিল। শকট-বিপর্যয়ের ফলে শকারের গাড়ীতে বসন্তসেনা এবং বর্ধমানক চালিত গাড়ীতে আর্যক আরোহণ করেছে। দুই গাড়ীরই গন্তব্যস্থল পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান।

অষ্টম অঙ্কে শকারের নিকটে বিট উদ্যান-পরম্পরায় উজ্জয়িনীতে পায়ে হেঁটে গমনের প্রস্তাব করেছে। এই উক্তি থেকে অনুমেয় যে শহরের উপকণ্ঠে সারি সারি উদ্যান ছিল। উদ্যানগুলি বোধ হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পাবলিক পার্ক-এর অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব। ব্যক্তিগত উদ্যানে অপরের প্রবেশ অবাধিত ছিল। উদ্যানে আমোদ-প্রমোদ, প্রেমাভিসারের সুযোগ থাকত। রাজপথও ছিল প্রেমের আদান-প্রদানের লীলা-স্থল।

রাজপথে নৈশ প্রদীপ-ব্যবস্থা ছিল না বলে মনে হয়। প্রথম অঙ্কে নৈশ অন্ধকারে নিমজ্জিত রাজপথের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অন্ধকারের কাব্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি। অন্ধকারে পথচারীরা কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। শকার-তাড়িতা বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ-কালে বস্ত্র-প্রান্ত দ্বারা দ্বারস্থিত দীপটি নিবিয়েছে, যাতে সে অলক্ষিতা হতে পারে। অন্ধকারে রদনিকাকে ধরেছে শকার, তার ধারণা সেই বসন্তসেনা। চারুদত্ত কর্তৃক বসন্তসেনাকে তার গৃহ পর্যন্ত অনুগমন-কালে প্রদীপ সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যদিও চন্দ্রোদয়ের ফলে সমস্যার নিরসন ঘটেছে। অভিসার-দৃশ্যে প্রনষ্ট-চন্দ্রালোকে দুর্দিনান্ধকারে চারুদত্তের গৃহে

চেটী ও বসন্তসেনার আগমন যেন অপ্রত্যাশিত। মেঘবাদলের রাতে অন্ধকার ঢাকা নগরীর ছবি ভেসে ওঠে আমাদের কল্পনায়।

প্রকরণের ঘটনা-প্রবাহ রাজ-বিদ্রোহের দিকেই যেন চালিত হয়েছে। রাজা পালকের নিধনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে পাঠকের মন। শকারের ছলা-কলা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তার নিধন পৌরজনের অভীপ্সিত। চারুদত্তের শরণ নিয়ে সে রক্ষা পেল। কিন্তু সমগ্র আলেখ্য থেকে কি প্রতিভাত হয়? এক রাজার পতন, অন্যের সিংহাসন লাভ—যেন স্বাভাবিক ঘটনা। এস্থলে রাজ্যের আয়তন বোধ হয় ক্ষুদ্র। রাজ্যও ছোট, রাজাও ছোট, শাসনতন্ত্রও মজবুত নয়। গুপ্তচর-ব্যবস্থা কিরূপ বোঝা যায় না। ছোট রাজাকে অপসারণ বা হত্যা সহজসাধ্যও বটে। গোয়ালার ছেলের রাজপাট লাভ মনোযোগ আকর্ষণ করে। জাতবিচার (বর্ণচেতনা) উগ্র থাকলে এটা বোধ হয় সম্ভাব্য হত না। এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা থাকুক বা না থাকুক, এজাতীয় কিংবদন্তী প্রকরণে রূপায়িত হয়েছে এবং অনুমান করা যায় যে ছোট রাজ্যে অধম বর্ণের লোকও যোগ্যতার বলে রাজা হতে পারত। ছোট ছোট রাজ্যের রাজা-বদল মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও ঘটত বিদ্রোহের ফলে।

(৪) গণিকা-গৃহ

মৃচ্ছকটিক নাটকের চতুর্থ অঙ্কে গণিকা বসন্তসেনার বহু প্রকোষ্ঠ-যুক্ত গৃহের বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। বসন্তসেনার চেটী বিদূষককে গৃহের প্রকোষ্ঠগুলি একে একে প্রদর্শন করেছে।

প্রথমেই গৃহদ্বারের বর্ণনা। হস্তীদন্ত-নির্মিত তোরণ। তোরণে শোভা পাচ্ছে সৌভাগ্য-পতাকাসমূহ। উভয় পার্শ্বে তোরণ-ধারক স্তম্ভ। স্তম্ভ-বেদিকায় স্ফটিক-নির্মিত মঙ্গল-কলস। মঙ্গল কলসে হরিত চূত-পল্লব। গৃহদ্বারের শোভা মনোরম।

প্রথম প্রকোষ্ঠে দৌবারিক (দ্বার-রক্ষক) শ্রোত্রিয়ের মতো নিদ্রিত।

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শকটের বলীবর্দসমূহ বদ্ধ। তারা সুপুষ্ট-দেহ, তাদের শৃঙ্গ তৈলাভ্যক্ত। একটি সৈরিভ (মহিষ) দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে। যুদ্ধশেষে মল্লের মতো মেষের গ্রীবা মর্দিত হচ্ছে। এধারে অশ্বদের কেশবিন্যাস করা হচ্ছে। চোরের মতো মন্দুরায় দৃঢ়বদ্ধ একটি শাখামৃগ (কপি)। এখানে হস্তিপকরা হাতীকে কূর (ভাত) ও তৈল-মিশ্রিত পিণ্ড খাওয়াচ্ছে।

তৃতীয় প্রকোষ্ঠে কুলপুত্রদের জন্য আসন বিরচিত হয়েছে। পাশা খেলার

পীঠে রয়েছে স্বর্ণ-পঠিত পুস্তক। একটি গণিকা ও বৃদ্ধ বিটরা ডান হাতে বিবিধ বর্ণ-যুক্ত চিত্র নিয়ে পরিভ্রমণ করছে। তারা প্রেমের সন্ধি বিগ্রহে চতুর।

চতুর্থ প্রকোষ্ঠে যুবতীর কর-তাড়িত মৃদঙ্গ, কাংস্যতাল (করতাল), বাঁশী ও অঙ্কে আরোপিত বীণা বাজছে। গণিকা-কন্যারা মধুকরীবৎ নৃত্যরত। তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় শৃঙ্গার-যুক্ত নাট্য। গবাক্ষে অবলম্বিত সলিল-গর্গরী (জলের কলস) বাতাস গ্রহণ করছে।

পঞ্চম প্রকোষ্ঠে হিঙ্গু তৈলের গন্ধ। রন্ধন-স্থান নিত্য সংতাপিত, অর্থাৎ, সর্বক্ষণ সক্রিয়; বিবিধ সুরভি ধূম উদ্‌গার করছে।

বহুবিধ ভক্ষ্য ভোজনের গন্ধ আগন্তুকের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করছে। মাংসছেদক হত পশুর উদর ও পেশি প্রক্ষালন করছে। সূপকার বহুবিধ আহার্য পাক করছে। বিদূষক আশা করছে যে সে ভোজনের জন্য আমন্ত্রিত হবে, ভোজনের প্রাক্‌কালে তাকে পাদ-প্রক্ষালনের জল দেওয়া হবে। এখানে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের মতো অলংকার-শোভিত গণিকা ও বন্ধুলেরা (অসতীপুত্রেরা) বিচরণ করছে। এই স্থান বিদূষকের দৃষ্টিতে স্বর্গরূপে প্রতিভাত হচ্ছে।

ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে মণিরত্নের শিল্পকর্ম-স্থান। বৈদূর্য, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি রত্নের পারস্পরিক সংযোগ বিচার করছে শিল্পীরা। সুবর্ণের সঙ্গে মাণিক্য যুক্ত হচ্ছে। সুবর্ণালঙ্কার ঘটিত হচ্ছে। লাল সুতায় মুক্তাভরণ গ্রথন, শাণে প্রবাল ও বৈদূর্য ঘর্ষণ, শঙ্খ ছেদন, চন্দন ঘর্ষণ, গন্ধ দ্রব্য সংযোজন চলছে। গণিকা ও কামুককে কেউ দিচ্ছে কর্পূর-যুক্ত তাম্বুল। কটাক্ষ-যুক্ত অবলোকন, হাস্য, অনবরত সীৎকার-যুক্ত মদিরা-পান দৃষ্ট হচ্ছে। এরা চেট, এরা চেটিকা। যারা গণিকা দ্বারা ত্যক্ত, তারা মদ্যপান করছে।

সপ্তম প্রকোষ্ঠ পাখীদের আস্তানা। পারাবত-মিথুন পরস্পরকে চুম্বন-রত। পঞ্জর-বদ্ধ শুক (টিয়া) সূক্ত আওড়াচ্ছে। মদন-সারিকা (শালিক) গৃহদাসীর মতো কুর কুর করছে। কুম্ভদাসীর মতো কূজনে নিবিষ্টা অনেক ফলরসাস্বাদে প্রহৃষ্ট-কণ্ঠা কোকিলা। গজদন্তে আলম্বিত পঞ্জর সমূহ। লাবকেরা (বটের পাখী, quail) যুদ্ধ করছে। কপিঞ্জলেরা (সাদা তিতির) পরস্পরের সঙ্গে আলাপনে মশগুল। পঞ্জর-কপোতেরা (নীল কবুতর) অন্যত্র প্রেরিত হচ্ছে। গৃহময়ূর নাচছে। রাজহংসমিথুন কামিনীদের পিছনে ঘুরছে। গৃহ-সারসেরা সংচরণশীল। গণিকাগৃহকে নন্দন-কাননের সঙ্গে তুলনা করল বিদূষক।

অষ্টম প্রকোষ্ঠে বসন্তসেনার ভ্রাতা পট্টপ্রাবারক (রেশমী চাদর) দ্বারা আবৃত হয়ে পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে অঙ্গভঙ্গী সহকারে টলে পড়ছে। উচ্চাসনে উপবিষ্টা বসন্তসেনার মাতা। গায়ে পুষ্পযুক্ত প্রাবারক। তৈলচিক্কণ পদযুগলে জুতা। এঁর উদর-বিস্তার দেখে বিদূষক ডাকিনীর উপমা স্মরণ করল। ইনি চাতুর্থিক জ্বরে ভুগছেন—, চেটী বলল। চেটীর সঙ্গে বিদূষকের পরিহাস।

অষ্ট-প্রকোষ্ঠ ভবনের পাশে বৃক্ষবাটিকা। এখানে বহু পাদপ রোপিত হয়েছে। পাদপতলে পট্টদোলা। কমল ও উৎপল-শোভিত দীর্ঘিকা একপার্শ্বে।

গণিকা-গৃহে পশু-শালা, পাখীর আস্তানা, ক্রীড়া-কক্ষ, নৃত্য-শালা, মণিরত্নের শিল্প-কক্ষ, রান্নাঘর,—ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। গৃহের সঙ্গে যুক্ত একটি বৃক্ষবাটিকাও রয়েছে। চারুদত্তের গৃহ প্রসঙ্গেও বৃক্ষবাটিকার উল্লেখ দেখা যায়। কামসূত্রে নাগরকের গৃহ-সংলগ্ন বৃক্ষবাটিকার কথা জানা যায়। সম্ভবত প্রাচীন ভারতে শহরে বিলাসীরা গৃহের অপরিহার্য অঙ্গরূপে বৃক্ষবাটিকাকে গণ্য করতেন। বৃক্ষবাটিকা শুধু বিশ্রামস্থান ছিল না। এখানে শৃঙ্গারের অনুশীলনও চলত।

গণিকা-গৃহে গমন লজ্জাকর গোপনীয় ব্যাপার ছিল না। বিদূষক বা শর্বিলক বসন্তসেনার গৃহে প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত নয়। রাজশ্যালকের শকট লোক-সমক্ষেই প্রেরিত হয়েছে বসন্তসেনার আগমন প্রত্যাশায়। সংবাহকের দণ্ড-মুক্তির জন্য বসন্তসেনা অলঙ্কার প্রদান করছে। চারুদত্তের গৃহিণী ধূতা বসন্তসেনার গচ্ছিত স্বর্ণভাণ্ডের অপহরণে রীতিমতো দুঃখিতা। সে অপহৃত স্বর্ণভাণ্ডের পরিপূরণের জন্য নিজ রত্নহারটি দিতে সঙ্কুচিত হচ্ছে না। চারুদত্তের গৃহে রাত কাটিয়ে বসন্তসেনা উদ্যান-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রোরুদ্যমান রোহসেনকে সুবর্ণশকটিকা নির্মাণের জন্য নিজ গহনা দিচ্ছে। তার আচরণে কোন আড়ষ্টতা বা দ্বিধা-জড়তা নেই।

দশম প্রকরণ :

কুট্টনীমতম্ কাব্যগ্রন্থে গণিকা জীবন চিত্র

অমরকোষ অনুযায়ী ব্যভিচারিণীর নাম পুংশ্চলী, বন্ধকী, স্বৈরিণী ইত্যাদি।

বারস্ত্রী, গণিকা, বেশ্যা, রূপাজীবা প্রতিশব্দ। জনগণের দ্বারা সংস্কৃতা, অর্থাৎ, সম্মানিতা বেশ্যা হচ্ছে বারমুখ্যা। কুট্টনী ও শম্ভলী একজাতীয়া বেশ্যা বা দূতী। "বার" শব্দের অর্থ সমূহ। সমূহের ভোগ্যা স্ত্রীলোক বারস্ত্রী। [অমর ২।৫।৩৯ ; ২।৬।১০, ১১ ; ২।৬।১৯]

কুট্টনীমতম্ বা শম্ভলীমতম্ বারস্ত্রী-বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ। এর রচয়িতা ভট্ট দামোদর গুপ্ত খৃস্টীয় অষ্টম শতকের মানুষ। কাশ্মীরের নৃপতি জয়াপীড়ের আমলে মুখ্যমন্ত্রীর পদটি অলঙ্কৃত করেছিলেন। কুট্টনীমতম্ একটি খণ্ডকাব্য। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের বৈশিক অধিকরণটি এই কাব্যের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। এই কাব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনী অভিজাত যুবকগণের বেশ্যাসক্তি নিবারণ। [ভূমিকা, কুট্টনীমতম্, ত্রিদিব নাথ রায়-কৃত সংস্করণ, ১৩৬০]

প্রাচীন ভারতে বেশ্যাগণ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি-রূপে গণ্য হত। তাদের আয়ের অংশ কর হিসেবে রাজার ধনাগারে গৃহীত হত। বেশ্যাগণ চতুঃষষ্টি কলায় শিক্ষিত হত। কলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন রাজা। একটা বিষয় নিশ্চিত যে গণিকারা প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।

কোন গণিকা ইচ্ছা করলে নিজ বৃত্তি ত্যাগ পূর্বক গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করতে পারত। বৃত্তি বর্জনের জন্য নিষ্ক্রয়-মূল্য দিতে হত।

(১) বিকরালা-মালতী-সংবাদ

কুট্টনী-মতম্ কাব্যগ্রন্থটি প্রাচীন ভারতীয় গণিকা-সমাজের একটি বিবরণ। বারাণসী নগরীর একটি বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থের আরম্ভ। বারাণসীতে মালতী নামে এক বারস্ত্রী বাস করত। সে গণিকা-বৃত্তির অনুকূল উপদেশ-সমূহ লাভ করবার জন্য বৃদ্ধা বিকরালার নিকটে গমন করল। বিকরালা তাকে যে সকল উপদেশ প্রদান করলেন তাই হচ্ছে কুট্টনী-মতম্ গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

বিকরালার ভাষণের মধ্যে তিনটি কাহিনী বিবৃত হয়েছে। যথা,—

(১) ভট্টপুত্র চিন্তামণি এবং মালতীর ভাবী মিলনের চিত্র ;
(২) সুন্দরসেন ও হারলতার মিলন-চিত্র ;
(৩) সমরভট ও মঞ্জরীর মিলনালেখ্য।

বিকরালা মালতীকে উপদেশ দিচ্ছেন কি প্রকারে ভট্টপুত্র চিন্তামণিকে বশীভূত করতে হবে। ভট্টপুত্র নিকটস্থ গ্রামে বাস করে। তার পিতা সর্বদা রাজধানীতে থাকেন, তাই সে নিজেই নিজের প্রভু। তার অভিজাত বেষ ও চেষ্টিত। তার কণ্ঠদেশে সুবর্ণসূত্র, গাত্রে কুংকুম, পায়ে মোম দ্বারা সিক্ত জুতা, কর্ণে সীসপত্রক, পরিধানে পীতবসন। তার অনুগামী একটি বালক পানের ডিবা বহন করে। ভট্টপুত্র রঙ্গালয়ে শ্রেষ্ঠী, বিট, বণিক্ ও পাশাক্রীড়কের সঙ্গ উপভোগ করে। সে নাট্যশাস্ত্রে, সঙ্গীতে ও মুরজাদি-বাদনে দক্ষ। সে কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। গণিকার পক্ষে সে উপযুক্ত গম্য পুরুষ। তার সঙ্গে মালতীর ভাবী মিলনের চিত্র গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছে। মালতীর দ্বারা প্রেরিত দূতী এই মিলন সাধনে সহায়িকা হবে। এই দূতী কর্তৃক প্রকাশিত নায়িকার গুণাবলী তার প্রতি ভট্টপুত্রকে আকৃষ্ট করবে। মালতীর বিবিধ বিদ্যায় দক্ষতা রয়েছে। যথা,—নাট্যশাস্ত্রে, নৃত্যে, গীতে, বাদনে, চিত্রকলায়। বিবাহিতা পত্নী থাকা সত্ত্বেও প্রীতিযোগবিধির সহায়তায় ভট্টপুত্র গণিকার কবলিত হবে। (৬০-১৭৫ শ্লোক)

(২) হারলতার উপাখ্যান

মালতী ভট্টপুত্রের নিকটে হারলতার কাহিনী বিবৃত করবে। পাটলীপুত্র মহানগরে পুরন্দর নামে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর পুত্র সুন্দরসেন সকল কলায় নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। সুন্দরসেন দেশভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর প্রিয়বন্ধু গুণপালিত পথিকের কষ্ট বর্ণনা করলেন।

পথিক কোন গৃহে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় চাইলে গৃহিণীরা বলতে থাকে,— গেহপতি বাড়ীতে নেই, বৃথা কেন বক্ বক্ করছ, কোন মন্দিরে যাও। সে স্থান থেকে অন্য গৃহে গমন করলে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার ফলে হয়ত জীর্ণ গৃহকোণ জুটতে পারে। তখন কর্তার সঙ্গে গৃহিণী কলহ করে,—অচেনা মানুষকে কেন বাসস্থান দিয়েছ? প্রতিবেশিনী এসে গৃহিণীকে বুঝাতে থাকে,—তোমার স্বামী সরলাত্মা, কি করবে, একটু অবহিতা হয়ে থাকবে, অনেক বঞ্চক ঘুরে বেড়ায়। শত গৃহে ঘুরে পথিক ভিক্ষা করে কুৎসিত

কলাই), চণ (ছোলা), অণু (চাউল বিশেষ) ইত্যাদি। পথিকের পরবশ ভোজন, ভূমি শয্যা এবং মন্দির আশ্রয়। (২১০-২৩০)

বন্ধুর কথায় সুন্দরসেনের সংকল্প টলল না। পিতাকে না জানিয়ে বন্ধুর সঙ্গে তিনি পাটলীপুত্র থেকে যাত্রা করলেন। বহু দেশে পর্যটনের শেষে এক পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপবনমণ্ডপে হারলতা নাম্নী এক পণ্যনারীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হল। উভয়ের মন উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হল। হারলতার সখী তাঁকে বলল—পণ্যনারীর পক্ষে সদ্ভাবজাত অনুরাগ হিতকর নয়। গুণপালিত বন্ধুকে বুঝালেন,—বারনারীর প্রেম কামুকের সম্পদের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সুন্দরসেনকে নিবৃত্ত করা গেল না। তিনি বেশ্যাপল্লীতে গমন করলেন। তিনি দেড় বছর কাল হারলতার সঙ্গসুখে মগ্ন থাকলেন। একদিন পিতৃপ্রেরিত লেখবাহক হনুমান্ তাঁর কাছে এসে লেখ প্রদান করলেন। লেখের মধ্যে বেশ্যাসক্তির নিন্দা ছিল। সুন্দরসেন পিতার নিকটে ফিরে যেতে সংকল্প করলেন। এর পরের ঘটনা হচ্ছে বিচ্ছেদবিধুর হারলতার মৃত্যু এবং দুই বন্ধুর সন্ন্যাস গ্রহণ। এখানেই আখ্যানের সমাপ্তি। (৪০৫-৮৯৭ শ্লোক)

এই কাহিনীতে পরিস্ফুট হচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে গণিকার প্রেম অকৃত্রিম হয়ে থাকে। গণিকাবৃত্তির প্রতি সামাজিক অসমর্থনও এস্থলে ফুটে উঠেছে। দামোদর গুপ্তের সময়ে আতিথেয়তার দৃষ্টিভঙ্গী হ্রাস পেয়েছে তাও বুঝা যায় গুণপালিতের উক্তিতে।

(৩) গণিকাপল্লীর আলেখ্য

সুন্দরসেন গণিকাপল্লীতে যে সকল দৃশ্য দেখেছেন তা বিশদভাবে কুট্টনীমতম্ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনাচিত্র বেশ্যাবৃত্তির বাস্তব রূপায়ণ। নারীর তরফে এই বৃত্তি জীবিকার একটি উপায় মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। পুরুষের তরফে বেশ্যাসক্তি নাগরিক জীবনের আতিশয্য মাত্র। গণিকাপল্লী বিষয়ে মূল গ্রন্থের বিবরণের বাংলা তর্জমায় আমরা প্রধানত ত্রিদিব নাথের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করছি।

বেশ্যাপল্লীতে কোন গণিকা পরিচিত পুরুষকে গৃহে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। সেই ব্যক্তির নিকট থেকে অর্থাগমের আশা নেই। তার সর্বস্ব হরণ করেছে গণিকা। (৩৩১ শ্লোক)

এক বঞ্চকের দ্বারা কোন বেশ্যা বঞ্চিতা হয়েছে। বঞ্চক একটি গাঁটরী রেখে গেছে। গাঁটরীর মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র একখানি জীর্ণ বসন। বঞ্চিতা গণিকা বৃথায় রজনী যাপনের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছে। (৩৩২ শ্লোক)

কোন বিট মূল্য দেয় নাই। সে গণিকার দৃষ্টিপথে হঠাৎ পতিত হয়েছে। তার দিকে ছুটে যেয়ে গণিকা তাকে ধরে ফেলছে। (৩৩৩)

গৃহের ভিতরে (বিত্তবান্) কামী রয়েছে। গৃহদ্বারে সমাগত লুপ্তবিত্ত কোন পুরুষ। কুট্টনী তাকে ফিরে যেতে বলছে। (৩৩৪)

এক গণিকা রাজপুত্রের সঙ্গে রজনীযাপনের জ্ঞাপক চিহ্ন সখীগণকে প্রদর্শন করছে। (৩৩৫)

কোন বিলাসিনী গণিকার সঙ্গলাভের জন্য কয়েকজন কামুকের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল। এই কারণে তার ভাটী বা পণ বেড়ে গিয়েছিল। তার সৌভাগ্যের কথা সে বলছিল অপরা গণিকাদের কাছে। (৩৩৬)

কোন গণিকার সঙ্গে রাত্রিবাসের জন্য দুই কামুকের মধ্যে বিবাদ বেধেছে। তারা শস্ত্র উদ্যত করেছে। তখন এক কুট্টনী তাদের দিকে ধাবিত হয়ে কলহ থামিয়ে দিচ্ছে। (৩৩৭)

খোশামোদের সুরে কোন বারবধূ ধনবান্ কামীকে বলছে,—বহু জনের কাছ থেকে ধন আহরণ করতে হয়। কিন্তু একজনের সঙ্গেই সেই ধন ভোগ করতে হয়। (৩৩৮)

কোন বিট গাথা গাইতে গাইতে দাসীর (বেশ্যার) সম্মুখে বিবিধ অঙ্গ-বিকৃতি সহকারে পায়চারি করছে। (৩৩৯)

কোন কামী বেশ্যাসক্তির ফলে নির্ধন হয়েছে। সে পরিচিতা বেশ্যার সঙ্গে ধনশালী পুরুষদের সংযোগ ঘটিয়ে তার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করছে। (৩৪০)

কোন ব্যক্তি গণিকাকে বলছে,—তোমার প্রতি আসক্তির জন্য গৃহত্যাগ করলাম, এখন তুমি পর হয়ে গেলে। (৩৪১)

কোন গণিকা একজনের কাছ থেকে ভাটী নিয়েছে, কিন্তু অপরের সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছে। তখন বৃদ্ধ বিটদের রায় অনুসারে বঞ্চিত ব্যক্তি প্রদত্ত ভাটীর দ্বিগুণ আদায় করছে গণিকার কাছ থেকে। (৩৪২)

একজন বিট অপর বিটকে বলছে,—শশিপ্রভার ভুজদ্বয়ে যে বলয়কলাপী (ভূষণ) দেখছ, তা তাকে দিয়েছি আমি। (৩৪৩)

নিজ সখাকে একজন বিট বলছে,—বল মদনক, আমার কি করণীয়। বিলাসাকে দুইখানি চীনাম্বর (চীনা রেশমের বস্ত্র) দিয়েও আমার বশীভূত করতে পারছি না। (৩৪৪)

প্রিয় সখাকে কোন বিট বলছে,—ওহে কলহংসক, আমার প্রতি কেলী স্নেহপরায়ণা, কিন্তু তার মাতা রাক্ষসী। সেই পাপিনীকে একশত বছরেও আমার বশীভূত করতে পারব না। (৩৪৫)

প্রিয় বন্ধুকে জনৈক বিট বলছে,—কিঞ্জল্কক, তুমি দাঁড়িয়ে কি চিন্তা করছ? তোমার দয়িতিকা, অর্থাৎ, প্রিয়া গণিকা আজ নাচবে। তুমি পুষ্প ও কুংকুমবস্ত্র সজ্জিত কর। (৩৪৬)

একজনকে অপর বিট বলছে,—কন্দর্পক, বৃথা গর্ব তোমার, এই গণিকা তোমার প্রতি রাগবতী নয়। পাঁচ দিন যাবৎ তোমার বিত্তের পরিচয় পেয়ে তোমার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করছে। (৩৪৭)

একজনকে অন্য একজন বিট বলছে,—বিলাসক, তুমি হরিসেনাকে ত্যাগ কর, যদি জীবিত থাকতে ইচ্ছা কর! তার প্রতি ব্যাপৃতপুত্র অনুরক্ত। সে ভয়ংকর লোক। [ব্যাপৃত সম্ভবত রাজকর্মচারী।] (৩৪৮)

কোন ব্যক্তি কেসরা নাম্নী গণিকার দ্বারা প্রদত্ত কাপড়খানিকে চাদরের মতো গলায় পেঁচিয়ে ঘুরছে। (৩৪৯)

কোন বিট বলছে যে সে মদনসেনার রতিলাভে বঞ্চিত, যেহেতু তার মায়ের বদন অতি প্রসারিত, অর্থাৎ, অতি বেশি চাহিদা। মদনসেনা মদিরার পীতাবশেষ নিজের হাতে তাকে দিয়েছে। তার মতে এই অনুগ্রহ বহু তপস্যার ফল। (৩৫০, ৩৫১)

একজন বলছে,—ওগো লীলোদয়, তুমি কুবলয়মালার গৃহ ত্যাগ করলে কেন? অপর একজন উত্তর দিচ্ছে,—বিনা মূল্যে সেই দাসীর গৃহে আমি কি করব? অর্থাৎ গণিকাসঙ্গ অর্থসাপেক্ষ। (৩৫২)

একজন মন্তব্য করছে,—ইন্দীবরকের বহু ধন বেশ্যারা গ্রাস করেছে। এখন সে তিলকমঞ্জরীর চরণসংবাহক বা ভৃত্য মাত্র। (৩৫৩)

কোন বেশ্যাজননী পরিচারিকাকে বলছে,—তুমি নৃত্যাচার্যকে বল যে আমার কন্যা হারা সুকুমারতনু। অতিশ্রম, অর্থাৎ অতিশয় নৃত্য তার দ্বারা করিয়ে নিবেন না। (৩৫৫)

কেউ গণিকাকে বলছে,—সুরতদেবি, শুকশাবককে কথা শেখাতে তোমার যত্ন নিরর্থক। তোমার প্রিয় পুরুষ তোমার জন্য বাইরে প্রতীক্ষা করছে। (৩৫৬)

কেউ পরিচারিকাকে বলছে,—স্মরলীলা বীণাবাদনের শ্রান্তি অপনোদনের জন্য পর্যংকে শয়িতা আছে। তাকে ত্বরিত উঠিয়ে দাও। মত্ত (কামুক) এসেছেন। (৩৫৭)

নায়কের শ্রুতিগোচর হয় এই প্রকারে কন্যাকে জননী বলছে,—মাধবি, বারংবার আদিষ্টা হয়েও বিগ্রহরাজের পুত্রের দ্বারা প্রদত্ত আভরণ কেন অঙ্গে ধারণ করছ না? (৩৫৮)

নায়কের কাছ থেকে গহনা লাভের উদ্দেশ্যে তার শ্রবণগোচর হয় এমন ভাবে বেশ্যাজননীকে কেউ বলছে,—তোমার মেয়ে ইন্দুলেখা বড় অন্যমনস্ক, মদ্যপানে অতি আসক্ত, তার কনকতাড়ী কখন কান থেকে খসে পড়েছে টের পায় নাই। (৩৫৯)

কোন বেশ্যাকন্যার করতল কন্দুকক্রীড়ার ফলে ঈষৎ তাম্রবর্ণ হয়েছে। তার নাম ললিতা। তাকে তার জননী বেশি সময়ের জন্য এরূপ খেলা করতে নিষেধ করছে। (৩৬২)

কোন নবাগত কামুকের নিকট থেকে গণিকা কুসুমদেবী কনকভাটী বা সুবর্ণপণ গ্রহণ করছে। (৩৬৩)

অন্য নবাগত কামুকের নিকট থেকে চন্দ্রলেখার মাতা প্রাথমিক পণ (গ্রহণক) আদায় করছে এবং বিদায়কালীন পুরস্কারের কথা বলছে। (৩৬৪)

কোন পরিচারিকা বেশ্যাজননীকে বলছে,—মাতঃ, বাসুদেব ভট্টের পুত্র তেমন দাতা নয়। সে নির্লজ্জ এবং শঠবৃত্তি। সে নিবারিত হয়েও সুরতসেনার বসন ছিঁড়ে ফেলে। (৩৬৫, ৩৬৬)

এক গণিকা অপরাকে বলছে,—ঐ ক্ষপটরাজের পুত্র ক্ষণকালের জন্যও আমার ঘর ত্যাগ করে না। এর ফলে অপর পুরুষের আগমনের সুযোগ ভগ্ন হয়। যেমন নগ্ন ব্যক্তি ঘাটে বসে থাকলে সেই স্থানে অন্য লোক আসতে পারে না। (৩৬৭)

প্রভাতকালীন কথোপকথন। বিভিন্ন গণিকা নিজ নিজ নৈশ অভিজ্ঞতার বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করছে। কোন গণিকার অভিযোক্তা (রতাভিলাষী) মদ্যপানে মৃতকল্প হয়েছিল, তাই তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নি এবং সুখে যামিনী অতিক্রান্ত হয়েছে। কোন গণিকা নায়কের সুকুমার সম্প্রয়োগ, পেশল বচন, বক্র পরিহাসের প্রশংসা করছে। কোন গণিকার গ্রাম্য কামুক বিষয়ে কৌতুককর অভিজ্ঞতা হয়েছে। কোন গণিকার বিড়ম্বনা হয়েছে অবিদগ্ধ রাজপুত্রের আচরণের ফলে। রাজার প্রাপ্য শুল্কের অপেক্ষা

অধিক আদায়ের জন্য নগরাধ্যক্ষ কোন গণিকাকে বলপ্রয়োগে জনসমক্ষে নিয়ে গিয়েছিল। কেরলী নাম্নী গণিকা কোন দাক্ষিণাত্যবাসীর অতিকামুকতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কেতকী নাম্নী গণিকা কামশাস্ত্রে পণ্ডিতের সঙ্গ উপভোগ করেছে। এই জাতীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা সুন্দরসেনের কর্ণগোচর হয়েছিল। (৩৯৫-৪০৪)

লুপ্তবিত্ত কামুককে নিষ্কাসনের বিষয়ে বিকরালা উপদেশ দিয়েছেন। এরূপ নায়কের সঙ্গে একাসনে গণিকা উপবেশন করবে না। তাকে উপহাস এবং তার প্রতিপক্ষের স্তুতি করবে। (৬১৬-৬২০)

গণিকা একজন কামুকের সঙ্গে নিয়ত যুক্ত থাকে না। যেমন মধুমক্ষিকা মধুহীন মৌচাক ছেড়ে যায়, তেমনি প্রকটরামা (বেশ্যা) বিত্তহীনকে পরিহার করে। আজ তাকে এক কামুক ক্রয় করে, আগামীকাল তাকে অপর কামুক ক্রয় করে। সারা জীবনের জন্য তাকে কেনা যায় না। (৬৪৮-৬৪৬)

যে কামুক ধনহীনতার জন্য পূর্বে নিষ্কাসিত হয়েছে, সে পুনরায় বিভবশালী হলে তার সঙ্গে পুনর্মিলনের চেষ্টা হচ্ছে বিশীর্ণপ্রতিসন্ধান এ বিষয়ে বিকরালা মালতীকে উপদেশ দিয়েছেন। কামুকের বিত্তের দিকেই গণিকার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। কামুকের বিত্তগ্রাস তাকে ভক্ষণের সামিল। প্রবরাচার্যের দুহিতা মঞ্জরী রাজপুত্র সমরভটকে ভক্ষণপূর্বক বর্জন করেছিল। (৭৩৩-৭৩৬ শ্লোক)

(৪) মঞ্জরীর আখ্যান

রাজা সিংহভটের পুত্র সমরভট দেবরাষ্ট্রের (মহারাষ্ট্রের) কোন অঞ্চলে বাস করতেন। তিনি (বারাণসীতে) শিবের মন্দির অভিমুখে গমন করেন। মন্দিরের পরিবেশে বিট ও গণিকাদের কথোপকথন তাঁর শ্রুতিগোচর হল। এদের আলাপন থেকে মন্দিরগত বেশ্যাবৃত্তির আভাস পাওয়া যায়। (৭৩৭-৭৫৬)

কোন গণিকা একজন বিটকে বলছে,—তোমার বয়স্য বীর সম্ভবত গম্ভীরেশ্বরের (দেবতাবিশেষের) সেবিকার সঙ্গে লগ্ন হয়েছে। তিন বছর ধরে এর কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি, এই দাসীটিও তাই পাবে, অর্থাৎ, এর দ্বারা বঞ্চিতা হবে। (৭৪৩)

কোন গণিকা অপরাকে বলছে,—কুরঙ্গিকে, সম্প্রতি বসুসেন তোমার অনুগামী হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তার জিহ্বায় গুড় আছে, অর্থাৎ, সে মিষ্ট কথা বলে। তার কাছ থেকে কোন লভ্য নেই। (৭৪৫)

কোন গণিকা সখীকে বলছে,—হরিণি, হর নামক এই ধূর্ত ঋণ দানকালে সকলকে বঞ্চনা করে। সে তরলিকা নাম্নী গণিকার আবর্তে নিমগ্ন হয়েছে। (এস্থলে মহাজনী কারবারে বঞ্চনার আভাস মেলে)। (৭৪৬)

কোন গণিকা সখীকে বলছে,—কুমুদিনি, এই কৃশকর্ণ দণ্ড ধারণ করেছে, কাষায়বসন পরেছে, হাতে নিয়েছে বৃষি (আসন), মৌনব্রতী হয়ে সকল বৈষ্ণবের প্রীতিভাজন হয়েছে, অথচ অন্যের অজ্ঞাতসারে স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করে; এই কপট লিঙ্গীর দ্বারা আমার মনস্কাম পূর্ণ হবে। (৭৪৮-৭৫০)

পূর্বপরিচিত বিট গণিকাকে বলছে,—যে সময়ে তোমার সঙ্গে নর্মরত ছিলাম, সেই দিবসগুলি অতিক্রান্ত। অধুনা তুমি পাশুপতাচার্যের আচার্যানী হয়েছ। অর্থাৎ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে ইদানীং তোমার প্রণয় চলছে। (৭৫৩)

সমরভট মন্দিরে উপবিষ্ট হলে তাঁর সামনে এসে বসল নর্তক, বংশীবাদক, গায়ক, গণিকা, শ্রেষ্ঠী ও বণিকগণ। তাঁকে দেওয়া হল তাম্বুল, কুসুম ও সুগন্ধিদ্রব্য। সমরভট সঙ্গীতাদি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। (৭৫৬-৭৯৩)।

নৃত্যাচার্য উত্তর দিলেন,—যেখানে বণিকেরা নেতা, শঠচরিত্রা বেশ্যারা পাত্র, সেখানে নাট্যের সৌষ্ঠব কি সম্ভব? বেশ্যাদের মধ্যে কেউ বলবান্ (পদস্থ) লোকের দ্বারা আক্রান্তা। কেউ রুচিযুক্ত কামুককে ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। কেউ পানগোষ্ঠীতে প্রিয় পুরুষের সঙ্গে দিবস অতিবাহিত করে। কেউ কামুকের আগমন প্রত্যাশায় গৃহদ্বারে বসে থাকে। কোন ক্ষেত্রে শূলাপাল উৎকোচ নিয়ে ঘোষণা করে যে অমুক গণিকা রজস্বলা। শূলা হচ্ছে বেশ্যা। শূলাপাল বেশ্যাদের অভিভাবক গৃহকর্তা, যার তত্ত্বাবধানে বেশ্যারা গৃহের বিভিন্ন কক্ষে বাস করে। নাটকের অভিনয়স্থানে আগতা কোন গণিকা পরিচিত কামুকের আগমনের খবর পেলেই কাজের ছুতায় রঙ্গালয় ছেড়ে যায়। এখানে নিরুৎসাহভাবে বৃত্তিরক্ষার জন্য গণিকারা রত্নাবলী নাটিকার অভিনয়ে হস্তপাদবিক্ষেপ করে। এই গণিকা বৎসরাজের ভূমিকায়, এই দ্বিতীয়া গণিকা রাজবয়স্যের ভূমিকায়, এই তৃতীয়া গণিকা বাসবদত্তার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়। আমার উৎসাহ দানের ফলে এই চতুর্থী গণিকা সিংহলরাজকন্যা রত্নাবলীর ভূমিকায় খ্যাতি লাভ করেছে।

(৭৯৪-৮১০)

সমরভট জানতে পারলেন যে মঞ্জরী রত্নাবলীর ভূমিকায় অভিনেত্রী। সেই সময়ে তাঁর সচিব বেশ্যাসক্তির চেয়ে পরকীয়া রতির শ্রেষ্ঠতা

প্রতিপাদনের জন্য যুক্তি বিন্যাস করলেন। পরস্ত্রী সংসর্গের নজীর ইন্দ্র ও অহল্যার মিলন। মঞ্জরীর জননী গণিকাপ্রীতির উৎকর্ষ প্রমাণে চেষ্টিতা হলেন। গ্রাম্য পুরুষ নাগরিকা বেশ্যাকে নিন্দা করে, অথচ গ্রামদেশে পরকীয়া রতির স্থান তৃণভূমি। এই বাদানুবাদ থামিয়ে নাট্যাভিনয় শুরু হল। মদনোৎসবের দৃশ্যে তরুণী প্রিয়পুরুষকে আলিঙ্গনরত। গৃহবধূ শৃঙ্গক দ্বারা সলিল নিক্ষেপ করছে তরুণের প্রতি। কুলবধূরা অশ্লীল ভাষণে নিযুক্তা হয়েছে। তারা যে ঘরের বধূ তা বুঝা যায় তাদের বদনাবৃতিজালিকা বা মুখাবরণ থেকে। (৮১১,৮১২,৮৫৯—৮৯৫)

অতঃপর সমরভট ও মঞ্জরীর মিলনের কাহিনীতে দূতীর মধ্যস্থতা চিত্রিত হয়েছে। মঞ্জরীর দূতী সমরভটের সামনে পুষ্প ও তাম্বূলপাত্র রেখে নায়িকার মনোভাব ব্যক্ত করেছে। তৎকালীন সংস্কৃতিতে পুষ্প ও তাম্বূলের প্রতি পক্ষপাত উল্লেখযোগ্য। (৯৯০-১০৫৬)

মঞ্জরীর সঙ্গে মিলনের ফলে রাজপুত্র সর্বস্বান্ত হলেন একথাই কাহিনীর প্রতিপাদ্য। বিকরালার বর্ণনায় গণিকাবৃত্তির আর্থিক পটভূমি প্রকটিত হয়েছে। তাঁর উপদেশ শ্রবণান্তে মালতী নিজগৃহে গমন করল। (১০৫৮)

এই কাব্য যে শ্রবণ করে, সে বিট, ধূর্ত, বেশ্যা ও কুট্টনী দ্বারা প্রতারিত হয় না,—এ কথা বলা হয়েছে সমাপ্তি বচনে। (১০৫৯)

একাদশ প্রকরণ ঃ

মুসলিম সমাজের বিবাহাদি সমাচার

ভারতীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম সমাজের হালচাল আংশিকভাবে আরবীয় ঐতিহ্য দ্বারা রূপায়িত হয়েছে। প্রাক্‌-ইসলাম আমলে আরবীয় সমাজের রূপটি ছিল কৌমতন্ত্র। ইসলামের আমলে রাজতন্ত্র ও রণতন্ত্রের একটা সমন্বয় ঘটেছে। আরবীয় বিবাহরীতিতে, বিবাহবিচ্ছেদের প্রণালীতে, যৌন সম্পর্কের ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামের দ্বারা কিছু কিছু সংস্কার সাধিত হয়। এই সব সংস্কার স্বাধীন নাগরিকদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু গোলামী প্রথাকে বহাল রাখা হয়েছে।

আরবীয় সমাজে শিঘার বা বিনিময় বিবাহ; সগোত্র বিবাহ, যথা, কাকাত-জ্যেঠাত ভাইবোনের বিবাহ (parallel cousin marriage); আসুর বিবাহ বা কন্যাবিক্রয়, নিয়োগ প্রথা, সাময়িকভাবে বহুপতি বরণের ক্ষেত্রে জৈব পিতৃত্বের পরিবর্তে সামাজিক পিতৃত্ব দ্বারা পুত্রের পরিচয়রীতি, বহুস্ত্রীবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, গণিকাপ্রথা, মুতবিবাহ প্রভৃতির প্রচলন বিষয়ে খবর পাওয়া যায়। মুতাববাহ রীতির বিশ্লেষণে প্রতিভাত হয় অস্থায়ী যুগ্ম পরিবার প্রথা (pairing family)। এই প্রথা সূচিত করে স্ত্রীলোকের স্বাধীন চালচলন। ইসলামের সংস্কারের ফলে বহুস্ত্রীবিবাহ সীমিত আকারে বজায় থাকে, কিন্তু নারীর পক্ষে এককালীন একপতিবিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। আসুরবিবাহের রীতিকে পরিবর্তিত করা হয়। বিধবাবিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ রীতিও সংশোধিত রূপ লাভ করে। নিয়োগ প্রথা উঠে যায়। মুতবিবাহের সমর্থক সংখ্যা হ্রাস পায়। স্ত্রীলোকের তথা কগ্‌নেট আত্মীয়ের উত্তরাধিকার স্বীকৃতি পায়। বিবাহের রীতিতে ও উত্তরাধিকারের নীতিতে স্ত্রালোকের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইসলামিক সংস্কারের অঙ্গীভূত। কিন্তু স্ত্রালোকের ভ্রমণকালীন বোরখা ধারণ ও অবরোধপ্রথা সম্ভবত বৈধতা লাভ করেছে এই সংস্কারকালে। [The Koran, tr. by G. Sale, Ch. XXXIII, pp.416, 417]

আরবীয় প্রভাবে প্রচলিত বোরখা হচ্ছে মুসলমান স্ত্রীলোকের আপাদ-মস্তক আবরণী। বাংলার হিন্দু বধূ পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা মুখ আবৃত করে। এর নাম ঘোমটা। প্রাচীনকালে বিবাহিতার চিহ্ন ছিল অবগুণ্ঠন।

আর্য বধূর অবগুণ্ঠন বিষয়ক উক্তি দৃষ্ট হয় সংস্কৃত গ্রন্থে। এক স্থলে আর্য বধূর বদনাবৃতিজালিকার উল্লেখ দেখে মনে হয় যে কোন কোন অঞ্চলে মুখঢাকনী ওড়না ব্যবহৃত হত, যেমন পাঞ্জাবী হিন্দু মেয়েদের ক্ষেত্রে এখনও দেখা যায়। গ্রীক রমণীরা কেশাবরণ ব্যবহার করত প্রাচীনকালে। এই আবরণের নাম কালিপট্রা (kalyptra)। গ্রীক কালিপটেইন, kalyptein মানে আবৃত করা। বৈদিক আমলের মেয়েরা মাথা ঢাকত কুম্ব, কুরীর নামক শিরোভূষণ দ্বারা। [মৃচ্ছকটিকম্ ৪।২৪ ; কুট্টনীমতম্ ৮৯৫ ; অথর্ব ৬.১৩৮।৩]

(১) আরবীয় আচার ব্যবহার ও ইসলামকৃত সংস্কার

আরবীয় কৌমগুলিতে জনগণ দ্বিধা বিভক্ত ছিল। কিছুসংখ্যক লোক ছিল যাযাবর। তারা বেদুইনরূপে পরিচিত ছিল। কিছুসংখ্যক মানুষ বাস করত শহরে। তাদের জীবনযাত্রা ছিল অংশত শৃংখলাপূর্ণ। সাধারণত অভিজাত বংশ থেকে নির্বাচিত হত কৌমের প্রধান। বিবিধ আচার ছিল আরবীয়দের মধ্যে। যৌন সম্পর্কের প্রকারভেদ ছিল। যথা, (১) কন্যার পিতাকে মূল্যদান পূর্বক কন্যাকে বিবাহ। (২) ভারতীয় আর্যদের নিয়োগ প্রথার সজাতীয় রীতি অনুযায়ী সুসন্তান লাভের জন্য স্বীয় পত্নীতে উচ্চ বংশের লোক নিযুক্ত হত। (৩) অপর একটি প্রথা অনুসারে দশ থেকে কমসংখ্যক পুরুষকে কোন রমণী তার সঙ্গে সহবাসের জন্য আহ্বান করত। ঈদৃশ সঙ্গমজাত পুত্রের জৈব পিতাকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। সহবাসকারীদের একজনের উপর সামাজিক পিতৃত্ব চাপিয়ে দিত সহবাসকারিণী। সামাজিক পিতার দ্বারাই পুত্রের লৌকিক পরিচয় নিয়ন্ত্রিত হত। (৪) বেশ্যাবৃত্তি আচরিত হত তাঁবুর ভিতরে কোন কোন মেয়ের দ্বারা। একপ্রকার পতাকা ছিল এই বৃত্তির পরিচায়ক। (৫) আরবীয় সমাজে মুত বিবাহ বা সাময়িক বিবাহ প্রথা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হত। শিয়াপন্থী ইথনা অশরী ব্যতীত অপর সকল মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক এই প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছে।

আরবীয় পরিবার ছিল পিতৃশাসিত এবং গৃহস্থালী ছিল পিতৃকেন্দ্রিক। বহুস্ত্রীবিবাহ অনুমোদিত হত। পত্নীসংখ্যার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ইসলাম-কৃত সংস্কারের ফলে চারিটি পর্যন্ত স্ত্রীবিবাহের নিয়ম চালু হয়। ইসলামের অনুশাসনেও পারিবারিক পিতৃতন্ত্র স্বীকৃতি পেয়েছে।

আরবীয় বিবাহপ্রণালীতে কন্যার অনুমোদন নেওয়া হত না। ইসলামিক রীতিতে বরের ও কনের অনুমোদন আবশ্যক। দুইজন সাবালক সাক্ষীর

চল্লিশ হাজার পর্যন্ত টাকার অংক লক্ষিত হয়। দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে আভিজাত্য অনুসারে মহর নির্ণীত হয়। [Ibid., p. 113]

যৌতুক দুইরকম হয়। যথা, চুক্তিবদ্ধ বা অচুক্তিবদ্ধ। চুক্তিপত্রে প্রতিশ্রুত যৌতুকের কিছু অংশ অবিলম্বে দেয় বা বিবাহকালীন দেয় এবং কিছু অংশ বকেয়া থাকে, যা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হলে পরিশোধ করতে হয় ঋণশোধের রীতিতে। শিয়া আচারে অঙ্গীকৃত যৌতুকের সর্বাংশই অবিলম্বে দেয়।

যে যৌতুক বিষয়ে কোন চুক্তি করা হয় না, তা কনের কুলপ্রথার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, কন্যার সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী তার পরিমাণ কমবেশি হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে মহর প্রথার মধ্যে বধূর অধিকার বা স্বার্থরক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রথা বরপক্ষের পীড়াদায়ক হয়েছে এরূপ অভিযোগ শোনা যায়। [Ibid , pp. 114-119]

এই প্রথার প্রসঙ্গে হিন্দু প্রথাগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনীয়। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে পূর্বকালে কন্যাপণের বিধান ছিল, অর্থাৎ, বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ দিত। এই পণ কন্যার প্রাপ্য এমন কথা বলা যায় না। এর অংশবিশেষ স্ত্রীধনের অন্তর্গত ছিল এবং মোটা অংশ কন্যার পিতাই গ্রাস করতেন। কন্যা-রত্নের কিংবদন্তীর তাৎপর্য বোধ হয় কন্যার বিবাহ লাভজনক এইরূপ বিবেচনা থেকে তাকে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হত।

ইংরাজ আমলের শেষভাগে হিন্দু প্রথার রূপান্তর ঘটে এবং বরপণের প্রচলন হয়। এই প্রথা অনুসারে বরপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছ থেকে পণ গ্রহণ করে। এরূপ রেওয়াজ বহু ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং পণ দানে অক্ষম কন্যার পিতা নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হয়েছেন। পণ প্রথা নিবারক আইন পাস হলেও অবস্থা বদলায়নি। বর্তমানে উচ্চবর্ণের ব্যাধিটি নিম্নবর্ণেও সংক্রামিত হচ্ছে।

১৯৬১ সালের ভারতীয় ২৮ নং আইনের দ্বারা বিবাহে পণ আদানপ্রদান শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে গণ্য হয়েছে, কিন্তু এই নিষেধক বিধির বিষয়ীভূত হয়নি মুসলিম মহর প্রথা। এই বিধানে কোন কন্যার বিবাহকালে বরপক্ষের দ্বারা গৃহীত পণ ঐ কন্যাকেই প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। ঈদৃশ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গোপনে অনুসৃত পণ প্রথাকে বন্ধ করতে পারেনি। [Dowry prohibition act 1961 দ্রষ্টব্য।]

কিছুকাল যাবৎ উভয় বঙ্গের শিক্ষিত মুসলমান সমাজে হিন্দু প্রথার অনুরূপ বরকে প্রদেয় যৌতুক প্রথার প্রসার বিষয়ে খবর পাওয়া যাচ্ছে। মুসলিম মধ্যবিত্তের মধ্যে পর্দাপ্রথা প্রায় বিলুপ্তির দিকে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশ ঘটছে। কন্যাকে শিক্ষাদান সত্ত্বেও মুসলমান অভিভাবকরা কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত যৌতুকের চিন্তায় বিব্রত বোধ করছেন। এক্ষেত্রে পণ প্রথায় সূচিত হয় তিনটি পর্যায়। যথা,—

(১) সেমিটিক আসুর বিবাহের অন্তর্গত প্রাচীন আরবীয় মহর প্রথা বা কন্যাবিক্রয় প্রথা,

(২) ইসলামকৃত সংস্কারের ফলে কন্যাকে প্রদেয় মহর প্রথা;

(৩) বাহ্য প্রভাবের ফলে অধুনা বিকশিত বরকে প্রদেয় যৌতুক প্রথা।

(৩) মুত বিবাহ প্রথা

প্রাক্‌-ইসলাম যুগের বিভিন্ন আরবীয় প্রথার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যে সকল মুসলমানী শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় আচার তার মধ্যে মুত বিবাহ উল্লেখযোগ্য। আইনী বিবাহ হচ্ছে সাদি। বাংলা অঞ্চলে পুনর্বিবাহের নাম নিকা। আরবীয় মুত (mut 'a) প্রথার তাৎপর্য সুখভোগের জন্য সাময়িক বা অস্থায়ী বিবাহ। এরূপ বিবাহের স্থায়িত্বকাল এক দিন, এক মাস, এক বছর বা তদধিক হতে পারে। এর শর্ত হচ্ছে সাময়িক সঙ্গিনীকে যৌতুক (মহর) দান। সুন্নি আচারে মুত বিবাহের অনুমোদন নাই। শিয়াদের মধ্যে একমাত্র ইথনা অশরী সম্প্রদায় এই প্রথা সমর্থন করে। অস্থায়ী সঙ্গিনাটি মুসলমান বা খৃস্টান বা য়িহুদী বা অগ্নি-উপাসিকা হতে পারে, কিন্তু অন্য কোন ধর্মাশ্রিতা হতে পারে না। কোন শিয়া মেয়ে অমুসলমান পুরুষকে অস্থায়ী সঙ্গী করতে পারে না। বস্তুতপক্ষে লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চলে শিয়া অভিজাত মেয়েরা এই প্রথা বর্জন করেছে। ইরানে ও ইরাকে মুত প্রথা বৈধ গণিকাপ্রথার নামান্তর মাত্র। আবার, এও দেখা যায় যে শিয়া বিদ্বানেরা এই প্রথা অনুযায়ী অস্থায়ী সঙ্গিনী গ্রহণ করেন।

মুত বিবাহজাত সন্তান বৈধরূপে বিবেচিত এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে। কিন্তু মুত বিবাহের সঙ্গিনী ভরণপোষণ দাবি করতে পারে না। [Fyzee, pp. 99-101]

মুত প্রথার সঙ্গে উপপত্নী প্রথা তুলনীয় নয়, যেহেতু সেকালের বা একালের রীতিতে উপপত্নী বহুক্ষেত্রে সারা জীবনের সঙ্গিনী।

(৪) অমুসলমানের সহিত বিবাহ

প্রচলিত রীতিতে মুসলমান পুরুষ ক্ষেত্রবিশেষে অমুসলমান রমণীকে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই মুসলিম নারীর পক্ষে অমুসলমান পুরুষকে বিবাহ বৈধ নয়।

সুন্নি মতে মুসলমানের পক্ষে মুসলিম মেয়েকে বা কেতাবীয়া মেয়েকে বিবাহ বৈধ। কিন্তু মুসলিম মেয়ে শুধুমাত্র মুসলিম ছেলেকে বিবাহ করতে পারে। কেতাবী ও কেতাবীয়া হচ্ছে যথাক্রমে য়িহুদী বা খৃস্টান ছেলে ও মেয়ে। মুসলিম ছেলের সঙ্গে কেতাবীয়া মেয়ের বিবাহ অনুমোদিত হলেও মুসলিম মেয়ের সঙ্গে কেতাবী ছেলের পরিণয় বিধিসঙ্গত নয়।

কোন ক্ষেত্রেই মুসলমান পুরুষ বৈধভাবে পৌত্তলিক মেয়েকে বিবাহ করতে পারে না।

শিয়া মতে অমুসলমানের সহিত বিবাহ অসিদ্ধ। কেতাবীয়া মেয়ের সঙ্গে মুত বিবাহ চলতে পারে। কিন্তু কেতাবী পুরুষের সঙ্গে শিয়া মেয়ের মুত বিবাহে অনুমতি নেই।

আলোচ্য রীতিগুলির সঙ্গে প্রাচীন আর্য অনুলোম বিবাহ বিধির সাদৃশ্য চোখে পড়বে। অনুলোম বিধিতে নিম্ন বর্ণ থেকে বধূবরণ চলে, কিন্তু নিম্ন বর্ণের পুরুষকে কন্যাদান অসঙ্গত। নিচু থেকে বধূ নির্বাচনে উচ্চ বর্ণের মর্যাদা অটুট থাকে, কেননা বধূ উচ্চবর্ণের পতির গৃহেই বাস করে। কিন্তু উচ্চবর্ণের মেয়ে নিম্নবর্ণের পতির ঘর করলে উচ্চবর্ণের মর্যাদা নষ্ট হয়।

মুসলমানের শ্রেয়োমন্যতার দরুণ বিহিত হয়েছে যে মুসলিম মেয়ে অমুসলমানের ঘরে বধূ হয়ে যেতে পারবে না, যেহেতু এতে উচ্চ মর্যাদা থেকে পতন হয়। কিন্তু অমুসলমানের মেয়েকে বধূরূপে ঘরে আনলে উচ্চ মর্যাদা থেকে বিচ্যুতি ঘটে না। [Fyzee, pp. 79-82, 100]

আমীর আলির মতে মুসলমান পুরুষ কর্তৃক হিন্দু মেয়েকে বিবাহ অবৈধ হতে পারে না, যেহেতু মোগল নৃপতিরা হিন্দু রাজপুত কন্যাকে বিবাহ করতেন এরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। অমুসলমান মেয়ের সঙ্গে মুসলমানের বিবাহ বৈধরূপে স্বীকৃতির দিন এসেছে,—এমন কথা বদরুদ্দীন তায়াবজী বলেছেন,-

যেহেতু বরোদারাজ্যে বরোদা স্পেশাল ম্যারেজ আইন অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাহে বাধা দূরীকৃত হয়েছে। [Ibid., p. 80]

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাহ অবৈধ, তবে উভয়ের মধ্যে সিভিল বা পঞ্জীকৃত বিবাহে বাধা দূরীকৃত হয়েছে ১৮৭২ সালের স্পেশাল ম্যারেজ আইন দ্বারা। এই আইন অনুসারে বিবাহকালে অহিন্দু ও অমুসলমান পরিচয় দিতে হয়। এই আইনের সংশোধিত রূপ ১৯৫৪ সালের স্পেশাল ম্যারেজ আইন। শেষোক্ত আইনের বলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে, হিন্দু ও খৃস্টানের মধ্যে, হিন্দু ও য়িহুদীর মধ্যে, মুসলমান নরনারীর মধ্যে, হিন্দু নরনারীর মধ্যে সিভিল বা পঞ্জীকৃত বিবাহ অনুমোদিত। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাহে ধর্মমত অস্বীকারের প্রয়োজন নেই। এই আইনকে কার্যকরী করার দায়িত্ব ন্যস্ত ম্যারেজ অফিসারের উপরে। তিনি বিবাহ পঞ্জীভুক্ত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলমান পুরুষের পঞ্জীকৃত বিবাহ ইদানীং ঘটছে। এরূপ বিবাহের সংখ্যা তুচ্ছ নয়। এর সঙ্গে তুলনায় মুসলমান মেয়ে ও হিন্দু পুরুষের বিবাহের সংখ্যা নগণ্য। কলিকাতা এলাকায় ১২৫ নং লোয়ার সারকুলার রোডস্থিত আঞ্চলিক বিবাহ কার্যালয়ে সংরক্ষিত ১৯৭৩ সালের বিবাহপঞ্জীতে অনুরূপ তথ্যের সন্ধান মেলে।

সোভিয়েট মুসলিম এলাকায় মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বিবাহ চালু করবার চেষ্টা চলেছে এবং বর্তমানে মুসলিম শিশুবিবাহ প্রথা ও বহুস্ত্রীবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ। এই এলাকাভুক্ত মুসলমান গোষ্ঠী হচ্ছে (১) তুর্কীজাতীয় উজবেক, কাজাক, আজেরবাইজানী, তুর্কমেন, কিরগিজ প্রভৃতি এবং (২) ইরাণীয় ভাষায় তাজিক, কুর্দ ইত্যাদি। এই সব গোষ্ঠীতে এখনও উল্লিখিত অনুলোম বিবাহের বাধা কার্যকরী। মুসলিম পুরুষরা অমুসলমান বধূকে ঘরে আনে, কিন্তু মুসলিম নারী বধূ হয়ে অমুসলমানের ঘর করতে যায় না। মর্যাদাশালীদের ঘরে নারীর অবরোধ রীতি উঠে যায় নি। বহুস্ত্রীবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ হলেও পরোক্ষভাবে এখনও চালু রয়েছে। [Problems of communism, Sept.-Oct., 1967, Muslims of Central Asia, G. Wheeler, pp. 72-76]

(৫) চতুঃসংখ্যায় সীমিত স্ত্রীবিবাহ

ইসলামের বিধান অনুসারে পুরুষের পত্নীসংখ্যা একই সময়ে চারিটিতে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, এক বা দুই বা তিন বা চার পর্যন্ত পত্নীর সংখ্যা হতে

পারে, তার বেশি হতে পারে না। পঞ্চমী পত্নী গ্রহণ বাতিল বিবাহের অন্তর্গত নয়, তবে ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহরূপে গণ্য। মুসলিম নারীর তরফে এককালীন একমাত্র স্বামীগ্রহণ অনুমোদিত। দ্বিপতিবিবাহ মুসলিম মতে বিধিসম্মত নয় এবং দ্বিতীয় পতির সন্তান অবৈধরূপে বিবেচ্য। এরূপ বিধানের মধ্যে স্ফুট হয় পুরুষপ্রধান সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং পুরুষের প্রতি পক্ষপাত। হিন্দু পরিবারের মতোই মুসলিম পরিবার পিতৃতান্ত্রিক এবং উভয় ক্ষেত্রেই বাসস্থান পিতৃকেন্দ্রিক (patrilocal)। [Fyzee, p. 78]

উক্ত বিধান মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অন্তর্গত। মুসলিম আইনের প্রধান উৎস পবিত্র কোরাণে সম্ভবত সাধারণ মানুষের জন্য একবিবাহ প্রস্তাবিত হয়েছে এবং একটি উক্তির ধরণে মনে হয় যে আরবীয় বহুস্ত্রীবিবাহ রীতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে চারিটি স্ত্রী অনুমোদিত হয়েছে। এই উক্তি অনুসারে চারি পত্নীর প্রতি সমব্যবহার যেক্ষেত্রে সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে একস্ত্রীবিবাহে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। দাসী উপপত্নীর ক্ষেত্রে কোন সংখ্যা নির্দেশ করা হয় নাই। একটি ব্যাখ্যা অনুসারে মুসলিম কানুনে উপপত্নীপ্রথার ও গোলামীপ্রথার অনুমোদন ছিল, যেমন বৈদিক আমলের আর্যদের মধ্যেও এই দুইপ্রকার প্রথা ছিল। [The Koran, Chap. IV, tr. by G. Sale, p. 71 , Ency , Hastings, Arabian Marriage, Vol. VIII, 1953, p. 470.]

পবিত্র কোরাণের ব্যবস্থায় নীতিগতভাবে একস্ত্রীবিবাহের নির্দেশ নাই। এক মতে খৃস্টীয় বিধানেও স্পষ্টভাবে একবিবাহ নীতি প্রতিপাদিত হয় নাই, উপরন্তু মধ্যযুগীয় খৃস্টীয় নীতিতে বহুস্ত্রীবিবাহের অসমর্থন প্রতীত হয় না। সম্ভবত আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিবর্তনের ভিতর দিয়ে একবিবাহনীতির জন্ম হয়েছে। আধুনিক নৈতিকতায় এককালীন একস্ত্রীবিবাহের বা একপতি-বিবাহের উপর যেমন জোর দেওয়া হয়, তেমনি সেইসঙ্গে যেন বিবাহোত্তর ব্যভিচারকে সমর্থন জানানো হয়। এক্ষেত্রে বিবেচ্য যে স্ত্রীস্বাধীনতা ও নরনারীর অবাধ মেলামেশার সঙ্গে জড়িত প্রাক্‌বিবাহ কিংবা বিবাহোত্তর স্বেচ্ছাচার, যেমন স্ত্রীলোকের অবরোধের সঙ্গে অংশত সংশ্লিষ্ট বহুস্ত্রীবিবাহের নীতিগত সমর্থন ও উপপত্নীপ্রথা। আধুনিক কালের একবিবাহনীতির মধ্যে ফুটে উঠেছে পরিবারের আকৃতি সংকোচনের প্রবৃত্তি, কিন্তু স্বামীস্ত্রীর যৌন জীবনের উপর যথার্থ নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করা হয় নাই। [Ency. Brit., Marriage, Vol. 14, 1959, p 950]

প্রাচীন ও মধ্যযুগেও একনিষ্ঠ পরিবার স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। সেন্ট পল নিয়ম করেছিলেন যে বিশপ নামধেয় ধর্মযাজকের একাধিক স্ত্রী থাকতে পারবে না। প্রাচ্য রক্ষণশীল গির্জার ধর্মযাজকদের পুনর্বিবাহে অনুমোদন ছিল না। জনশ্রুতি অনুসারে মুসলিম সমাজে যুক্তিবাদীরা (Mutazilite) একবিবাহ-নীতির সমর্থক ছিলেন। মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজে শ্রীরামের উপাসকরা রামায়ণীয় রামের একবিবাহের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে একবিবাহ সমর্থন করতেন এরূপ কিংবদন্তী আছে। [Ibid., p. 951]

সামাজিক বিচারে বহুস্ত্রীবিবাহ, দ্বিস্ত্রীবিবাহ ও একস্ত্রীবিবাহের সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণ জড়িত। নীতিগতভাবে যে ক্ষেত্রে বহুস্ত্রীবিবাহ সমর্থিত, সেখানেও গরীব জনগণ সাধারণত একবিবাহকারী। অভিজাতদের মধ্যে ও সচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থদের মধ্যে দুই স্ত্রী বা তদধিক স্ত্রীবিবাহ লক্ষিত হয়। হারসকোভিটস বলেছেন,—

'এমন কোন গোষ্ঠী নেই, যেখানে বহুস্ত্রীবিবাহ আচরিত হয়, অথচ সেই সঙ্গে যথেষ্টসংখ্যক একবিবাহকারী পরিবার নেই। এমন সমাজও প্রায় নেই, যেখানে একবিবাহনীতি স্বীকৃত এবং সেইসঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্ক নেই।' [Cultural Anthropology, M. J. Herskovits, 1958, p. 169]

আধুনিক সভ্যতায় একবিবাহকারী পরিবার কতকটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন সাধন করে, কিন্তু এই স্ত্রীসংখ্যা সংকোচন দ্বারা প্রকৃত যৌন জীবনের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় না। বিবাহোত্তর ব্যভিচার যেন একবিবাহ বিধির পরিপূরক। আবার, একথাও সত্য যে বহুস্ত্রীবিবাহের সমর্থক গোষ্ঠীগুলিতে বহুপরিমাণে একবিবাহকারী পরিবার চোখে পড়ে। মুসলমান সমাজে আর্থিক কারণে এরূপ পরিবারের সংখ্যাই বেশি। ১৯৪৭ সালে মিশরে মোট বিবাহিত মুসলিম পুরুষদের মধ্যে একাধিক স্ত্রীবিবাহকারীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৩.৮ ভাগ। এই বছরে ইরাকে মোট বিবাহিত মুসলমানদের ভিতরে শতকরা মাত্র ৯ জন ছিল একাধিক স্ত্রীবিবাহকারী। অর্থাৎ, ইসলামের নীতিতে একাধিক স্ত্রীবিবাহ সমর্থিত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মধ্যে আচরিত রীতি হচ্ছে একস্ত্রীবিবাহ এবং এই ব্যাপারে মূল কারণ যে অর্থনৈতিক এবিষয়ে সন্দেহ নাই। [Ogburn and Nimkoff, op. cit., p. 492]

বর্তমানকালে প্রাচ্য দেশগুলিতে পশ্চিমী পরিবার প্রথার ধাঁচটি আমদানি করার চেষ্টা চলছে।

বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান সমাজেও বিবাহ ও পরিবারপ্রথার সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা হয়েছে বিগত কয়েক দশকের মধ্যে। এই সংস্কারের অন্তর্গত বাল্যবিবাহ ও বহুস্ত্রীবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, স্ত্রীর তরফে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্থাপন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানে প্রবর্তিত মুসলিম পরিবার সংক্রান্ত অরডিনানস আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং স্বামীর তরফে একাধিক বিবাহ শর্তযুক্ত করা হয়েছে। [আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩]

তুরস্কে কেমাল পাশাকৃত সংস্কারের অন্তর্গত বহুস্ত্রীবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, পর্দাপ্রথা বিলোপ, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, চাকরীক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের অধিকার স্থাপন ইত্যাদি। আধুনিকীকরণের বা পশ্চিমীকরণের ব্যাপারে বর্তমানে তুরস্ক ও জাপানই সর্বাধিক অগ্রণী। তুরস্কের প্রভাব অন্যান্য মুসলমান সমাজে সংস্কারের মনোভাব সৃষ্টি করেছে। বঙ্গদেশীয় মুসলমান রমণীরা ধীরে ধীরে বোরখা বর্জন করছে। আফগানিস্তানে পর্দাপ্রথা তুলে দেওয়ার জন্য আমানুল্লাকৃত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল বটে, কিন্তু আবার উল্টোদিকে হাওয়া বইছে। [চতুষ্কোণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০, কাবুলওয়ালার দেশ দিয়ে ষষ্ঠ পর্ব, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩২৮, ৩২৯]

(৬) মুসলমান সমাজে জাত বিভাগ

ইসলামের সাম্যনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন জাত বা বর্ণগত সংগঠন। অথচ মুসলিম এলাকায় জাতের অস্তিত্ব রয়েছে। উত্তর আফ্রিকায় এবং আরবে ধাতুশিল্পীরা (smiths) স্বতন্ত্র জাতে পরিণত। নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে তারা বিবাহ সম্পর্ক পাতায়। এরূপ অন্তর্বিবাহ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্রোয়েবারের মতে জাত হচ্ছে বদ্ধদ্বার শ্রেণী, যার মধ্যে বাইরের মানুষ সহজে প্রবেশ পায় না। আরবের উত্তরাংশে উটপালক রুবল (Ruwala) বেদুইনদের বসতি। এদের সমাজে ধাতুজীবী ও নিগ্রো দাসরা জাতের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ধাতুজীবীরা ধাতুর কাজ করে ও বন্দুক মেরামত করে। তারা রুবলদের অনেক প্রয়োজন মেটায়। অথচ মর্যাদার বিচারে এই অপরিহার্য মানুষগুলি সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কবলে পড়েছে। [Anthropology, A. L. Kroeber, 1967, p. 276]

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য দক্ষিণভারতে কোচিন অঞ্চলে স্থিত য়িহুদী উপনিবেশ। এরা ধর্মীয় প্রয়োজনে হিব্রু ভাষা শেখে, কিন্তু মলয়ালম ভাষায় কথা বলে এবং ভাত খায় ও পাণ চিবায়। এদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ, পিঙ্গল ও কৃষ্ণাঙ্গ এই প্রকার তিনটি জাত গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক জাত বিবাহ ও ভোজনের ব্যাপারে নিজ গণ্ডীকে অতিক্রম করে না। অর্থাৎ, হিন্দু জাতের রীতিনীতির দ্বারা এরা বেশ প্রভাবিত হয়েছে।

কোচিন এলাকার দেশজ খৃস্টানদের মধ্যে সম্প্রদায় (sect) ও জাত (caste) হিসেবে বিভাগ বিদ্যমান। জাতের গণ্ডীতেই বিবাহ ও ভোজন চালু। এই গণ্ডী কখনও অতিক্রান্ত হয় না। এই সব জাতের দৃষ্টান্ত ভারতীয় সংস্কৃতির গণ্ডীগত বিভজন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। অথচ য়িহুদী, খৃস্টান ও মুসলিম ধর্মবিশ্বাস সেমিটিক সংস্কৃতির উৎসজাত।

[Ibid , pp 432, 433]

ভারতীয় মুসলমান সমাজে জাতের (caste-এর) অস্তিত্ব বিষয়ক নজীর পাওয়া যায়। বোম্বাই অঞ্চলের তিনটি মুসলমান ব্যবসায়ী শ্রেণীর নাম হচ্ছে শিয়াপন্থী খোজা ও বোহোরা এবং সুন্নিপন্থী মেমন। খোজা ও মেমনরা হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। এদের ভাষা প্রধানত কাচ্চি (Cutchi)। খোজাদের ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত অবতারবাদের মধ্যে হিন্দু ছাপ রয়েছে। খোজা ও মেমনদের উত্তরাধিকার রীতিতে হিন্দু রীতির প্রভাব ছিল। যথা, উইলের দ্বারা সম্পূর্ণ সম্পত্তির ব্যবস্থাকরণ। মুসলমান রীতিতে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ উইলের আওতায় পড়ে। ১৯৩৭ সালের শরিয়ৎ আইনের দ্বারা মুসলমান রীতির অনুবর্তন অনুমোদিত হয়েছে। ১৯৩৮ সালের কাচ্চি মেমন আইনের দ্বারা মেমনরা মুসলমান রীতির কবলিত হয়েছে। বোহোরা মানে বণিক্। বোহোরাদের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। মুসলমান বোহোরাদের মধ্যে জাতের বৈশিষ্ট্য প্রকট।

কোন কোন জাত বা গোষ্ঠীতে হিন্দুয়ানির সঙ্গে মুসলমানী চালচলন দেখা যায়। গুজরাটের মটিয়া কুনবি জাতের সৎপন্থীরা অথর্ববেদকে মানে, আবার রমজানের রোজা পালন করে। উত্তর প্রদেশের হুসেনী ব্রাহ্মণদের মধ্যে, বাংলার ভগবানিয়াদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম আচারের সংমিশ্রণ ঘটেছে।
[Fyzee, op. cit., pp. 30, 31, 51 ; 52, fn. ; 54—61]

মালাবার অঞ্চলের মোপলারা একটা মুসলমান জাত বা গোষ্ঠী। এদের মধ্যে কিছু পরিবার মাতৃধারাবিশিষ্ট এবং বাসস্থানের রীতিতে মাতৃকেন্দ্রিক।

অর্থাৎ, মুসলিম পিতৃধারা ও পিতৃকেন্দ্রিক বাসস্থানের রীতি এদের একাংশের ভিতরে চালু হয় নাই। [Kinship Organisation in India, I. Karve, 1953, p. 181]

এনামুল্ হক্ এবং আবদুল করিম বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে পাঁচটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। যথা, সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মোগল ও বাঙ্গালী। সৈয়দরা হজরত মহম্মদের কন্যাপক্ষের বংশধররূপে পরিচিত। আরবীয় অভিজাত বংশধররা শেখ। তুর্করা পাঠান। মধ্য এশিয়ার উৎসজাত মোগল। সাধারণ মুসলমান বাঙ্গালী। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চলে অভিজাত মুসলমানের আখ্যা শেখ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানকে শেখ বলা হয়। কলিকাতা অঞ্চলে কখনও কখনও কিছুসংখ্যক মুসলমান শুধুমাত্র হিন্দুকেই বাঙ্গালীরূপে অভিহিত করেন। কলিকাতাবাসী কিছু কিছু হিন্দুও এরূপ সংজ্ঞাকরণে অভ্যস্ত।

উক্ত লেখকদ্বয়ের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে সম্মানিত মুসলমানদের মধ্যে কাজী বা বিচারক, মোল্লা বা পুরোহিত, আলিম বা আরবীজানা লোক এবং ফকীর বা সাধক বুদ্ধিজীবী পর্যায়ভুক্ত। উত্তর ভারতীয় সুফীমতের প্রভাবে বঙ্গীয় মুসলমানদের হালচাল অনেকাংশে রূপায়িত হয়। এই প্রভাবের ফল পীরপূজা। হিন্দু গুরুপূজার সজাতীয় পীরপূজা। সপ্তদশ শতকের অনেক মুসলমান হিন্দুর কর্মফলবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কবি মরদনের কাব্যে কর্মবাদের পরিচয় মেলে। এই সময়ের কাব্য থেকে জানা যায় যে হিন্দু মেয়ে ও মুসলমান ছেলের বিবাহ ঘটত এবং এই ব্যাপারে হিন্দু মেয়েকে ধর্মান্তরিত করা হত না। অর্থাৎ, হিন্দু মেয়েকে খৃস্টান বা য়িহুদীর মতো কেতাবীয়ারূপে বিবেচনা করা হত। এই যুগে মুসলমান মেয়েরা ললাটে সিন্দূরের টিপ দিত। এই প্রথা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের একাংশের ভিতরে এখনও রয়েছে। [আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজ, এনামুল্ হক্ ও আবদুল করিম, ১৯৩৫, পৃঃ ৮৮ – ১০১]

এ. কে. নজমল করিমের মত অনুসারে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে নকল মোগল, নকল পাঠান, নকল সৈয়দ ও নকল শেখের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এই কারণে নূতন শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক হয়েছে। সকল বাঙ্গালী মুসলমানকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা, আশরাফ বা অভিজাত-বংশীয় এবং আতরাফ বা নীচবংশীয়। আতরাফের নীচে উপস্থাপিত হয়েছে আর্জল শ্রেণীর মুসলমান।

ডক্টর ঘোস আনসারির মতে উত্তর প্রদেশে আশরাফ শ্রেণীর অন্তর্গত সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান এই চারিটি জাত্। এই রাজ্যে শুদ্ধ মুসলমান জাত্ হচ্ছে জুলাহ বা তাঁতী, দর্জি, নই বা নাপিত, কুমহার বা কুমার ইত্যাদি এবং অশুদ্ধ মুসলমান জাত্ হচ্ছে ভাজি (মেথর)। আশরাফরা বর্ণভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করলেও কার্যত জাত মেনে চলেন। [Races and Cultures of India, pp 320, 321]

ইয়াকুব আলীর "মুসলমানের জাতিভেদ" (১৯২৭ খৃস্টাব্দ) নামক গ্রন্থে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের জাতবিভাগ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এই বিবরণ প্রস্তুত হয়েছে ১৯১১ সালের লোকগণনা সমাচারের সহায়তায়। বঙ্গদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে বড় ছোট ৮০ প্রকার জাত বর্তমান। এরূপ জাতবিচার ইসলামের নীতিকে বা আদর্শকে বাহ্যত লংঘন করেছে এই অভিমত লেখক প্রকাশ করেছেন। তাঁর আলোচনা নীতিগত বা আদর্শগত বলা যেতে পারে। সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাপারটাকে তিনি বিচার করেন নাই। বঙ্গীয় মুসলমানদের জাতগুলির একটা তালিকাও তিনি দিয়েছেন এই পুস্তকে। যথা, সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান, কাজী, খাঁ, খোন্দকার, মীর, মিঞা, মির্জা, মল্লিক, ভুঁইয়া, গোলাম, চৌধুরী, ফকীর, ধোবা, জোলা, কসাই, মুচি, মেহ্তর, দর্জি, কুমার, নিকারী (মাছ বিক্রেতা), মাল্লা (নৌকাচালক), ধুনকার (লেপতোষক প্রস্তুতকারক), কলু (তৈল প্রস্তুতকারক), চুণারী (চুণ ব্যবসায়ী), মশালচী (দীপধারী) ইত্যাদি। [নির্মল বসুর উদ্ধৃতি, হিন্দু সমাজের গড়ন, ১৩৫৬, পৃঃ ১৪৩-১৪৫]

ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে। মুসলমান সমাজের একাংশ বহিরাগত এবং অপর বৃহত্তর অংশ হিন্দু থেকে বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত। অভিজাত হিন্দু বর্ণের দ্বারা অবহেলিত নিম্ন জাতগুলির লোকেরা ইসলাম ধর্মের আশ্রয়ে এসেছে মর্যাদা বা অধিকার লাভের জন্য। ধর্মান্তরের পরেও তাদের বৃত্তিপরিচয়সূচক জাতসংজ্ঞা বিলুপ্ত হয় নি। হিন্দু প্রতিবেশীর জাতবিচার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে তাদের জাতবিচার। একে পরিবেশগত প্রভাব বলা যেতে পারে। বর্ণভেদের পরিবেশে বর্ণচেতনা বিলুপ্ত না হয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বঙ্গীয় মুসলমানদের সামাজিক সংগঠন হিন্দু রীতিকে অতিক্রম করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ও বিচার্য। বহিরাগত মুসলমানের শ্রেয়োমন্যতা এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানের হীনমন্যতা সামাজিক বিভেদকে টিকিয়ে রেখেছে। এই বৈষম্যের মধ্যে আদর্শগত

সাম্যবোধ খুব জোরালো হয়নি। সেই কারণে জাতবিচারকে প্রতিরোধের ক্ষমতা এই নীতিবোধের মধ্যে ছিল না।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথাও এক্ষেত্রে চিন্তনীয়। ভারতের সামাজিক ইতিহাসে পরিস্ফুট হয় সমন্বয়বাদ, যা ঠিক একীকরণের বা সমীকরণের নীতি নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে বিভক্তকরণের সহযোগী সংযোজন নীতি। এই নীতির রূপায়ণ চোখে পড়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃস্টান সমাজে। একীকরণের কোন সংস্কার আন্দোলন এদেশে সার্থক হয় নাই। বীর শৈব আন্দোলন, চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন, রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন বর্ণভেদকে আঘাত হানতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কালে কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। জাতবোষ্টম একটা অন্তর্বিবাহকারী গোষ্ঠীমাত্র। ব্রাহ্মরাও প্রায় এরূপ একটা গোষ্ঠীতে পরিণত। কোন কোন অঞ্চলে অনুন্নত বৌদ্ধ জাত দৃষ্টিগোচর হয়। ঈদৃশ পরিবেশে মুসলমান সমাজে জাতবিচার স্বাভাবিকভাবেই প্রেরণা লাভ করেছে। [Studies in Indian Social Polity, B N. Datta, 1944, pp. 273-277]

[**দ্রষ্টব্য**ঃ (ক) মুহম্মদ আয়ুব হোসেন বঙ্গীয় রাঢ় অঞ্চলের মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিবাহরীতি বিষয়ে মূল্যবান বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। এই বিবরণের অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে রাঢ় অঞ্চলে মুসলিম বিবাহে স্ত্রী আচার সংশ্লিষ্ট। বিবাহের পাত্রপাত্রীর গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত ভোজন, ...। অনুষ্ঠানি, দধিমঙ্গল, বৌমেহমানী, অষ্টমঙ্গল প্রভৃতি স্ত্রী আচারের অঙ্গীভূত। আইবুড়ো ভাত পাত্রকে ও পাত্রীকে খাওয়ানো হয় অব্যূঢ় বা অবিবাহিত অবস্থা মোচনের জন্য। পাত্রের ও পাত্রীর মাথার উপরে হাত রেখে এয়োরা সোহাগের ছড়া আবৃত্তি করে। কন্যার বাড়ীতে যাওয়ার প্রাক্কালে পাত্র ও পাত্রের মা দধিভক্ষণ করে। এর নাম দধিমঙ্গল। বিবাহের অনুষ্ঠানের পরে বরকে কনের চাঁদমুখ দেখানোর রীতি। তার পরে বরের বাড়ীতে বৌমেহমানী অনুষ্ঠান। মেহমান অতিথি। বরের গৃহে বৌ অতিথি। তাকে অতিথিরূপে সম্বর্ধনা করা হয়। তার পরে বধূর গৃহে বর আট দিন বাস করে। এর নাম অষ্টমঙ্গল। এই রীতিগুলিতে হিন্দু রীতির ছাপ রয়েছে। হিন্দু বিবাহেও রয়েছে গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত ভক্ষণ। বিবাহ অনুষ্ঠানের পরে বরবধূর সামনে সোহাগ জলপূর্ণ ঘট রাখবার রীতি। বিবাহের পূর্বে পাত্রের ও পাত্রীর দধি ও খই ভক্ষণের নাম দধিমঙ্গল। বৌমেহমানীর সজাতীয় হিন্দু বৌভাত অনুষ্ঠান। হিন্দু অষ্টমঙ্গল প্রথা মুসলিম রীতির সদৃশ। হিন্দু শুভদৃষ্টি প্রথায় বর বধূ পরস্পরকে অবলোকন করে।

(খ) মুসলিম তলাক প্রথা। স্বামী কর্তৃক উচ্চারিত বিবাহবিচ্ছেদের সংকল্পবাক্য হচ্ছে তলাক। তলাক দুই প্রকার। যথা,—তলাকুস সুন্নত এবং তলাকুল বিদত। তলাকুস সুন্নত হচ্ছে হজরত মহম্মদ কর্তৃক অনুমোদিত। তলাকুল বিদত হচ্ছে অননুমোদিত।

তলাকুস সুন্নত হচ্ছে দুই প্রকার। যথা, আহসান তলাক এবং হসান তলাক। আহসান সর্বাধিক অনুমোদন প্রাপ্ত। হসান অনুমোদন প্রাপ্ত। (১) আহসান রীতিতে স্ত্রীর তুহর (tuhr) অবস্থায় স্বামী একবার মাত্র বিবাহ বিচ্ছেদের বাক্য উচ্চারণ করে। তুহর হচ্ছে ঋতুমুক্ত অবস্থা। এর পরে স্ত্রী তিন মাস ইদ্দত পালন করে। ইদ্দত কালে স্বামী স্ত্রীসঙ্গ থেকে বিরত থাকে। ইদ্দত কালে স্ত্রীসঙ্গ করলে তলাক প্রত্যাহার হয়। (২) হসান রীতিতে স্ত্রীর তিনটি ঋতুমুক্ত অবস্থায় স্বামী বিবাহবিচ্ছেদের বাক্য উচ্চারণ করে। প্রত্যেক ঋতুমুক্ত অবস্থায় একবার এরূপ বাক্য উচ্চারণ করে।

তলাকুল বিদত অনুসারে স্ত্রীর একটি ঋতুমুক্ত অবস্থায় স্বামী তিনবার স্ত্রীকে বলে "আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম"। শিয়া আইনে এই রীতি স্বীকৃত নয়।

তলাক ই তফ্‌বীদ অথবা তলাক ই তফ্‌বিজ অনুসারে স্বামী বিচ্ছেদবাক্য উচ্চারণের দায়িত্ব স্ত্রীর উপর বা অপর ব্যক্তির উপর অর্পণ করে। প্রথমা স্ত্রীর অনিচ্ছায় স্বামী দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করলে প্রথমা এই তলাক রীতির সাহায্যে বিবাহ ভঙ্গ করে।

ইলা প্রথার দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ হয়। এ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীসঙ্গ থেকে বিরত থাকার সংকল্প গ্রহণ করে এবং চার মাস ধরে স্ত্রীসঙ্গ করে না।

জিহার প্রথা। বিবাহ ভঙ্গের এই রীতিতে স্বামী ঘোষণা করে যে তার নিকটে তার স্ত্রী জননীর পৃষ্ঠদেশতুল্য। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এরূপ বিবাহবিচ্ছেদ প্রত্যাহার করা চলে।

তলাক হচ্ছে স্বামীকৃত বিবাহ বিচ্ছেদ রীতি। তলাক ঘোষিত হলে স্বামী স্ত্রীকে দেনমহরের অবশিষ্ট অংশ প্রত্যর্পণ করে।

খুল প্রথায় স্ত্রী বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে স্বামীকে ক্ষতিপূরণ দেয় স্ত্রী।

মুবারত প্রথায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

ইদ্দত প্রথা। বিবাহ বিচ্ছেদের পরে বা স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনর্বিবাহ পর্যন্ত স্ত্রীর অপেক্ষাকাল হচ্ছে ইদ্দত। বিধবার ইদ্দত চার মাস দশ দিন। বিচ্ছিন্না স্ত্রীর ইদ্দত তিন মাস কাল। ইদ্দতকালে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ চলে না। পূর্ব পতির দ্বারা স্ত্রী গর্ভবতী কিনা নির্ণয়ের জন্য ইদ্দত পালনের ব্যবস্থা।

(গ) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে আত্মীয় ও আত্মীয়ার বাচক শব্দের দৃষ্টান্ত। আবা—বাবা। চাচা—কাকা। ফুফু—পিসী। ফুফা—পিসা। খালা—মাসী। বুবু—দিদি। নানী—মার মাতা। দাদী—পিতার মাতা।]

দ্বাদশ প্রকরণ :

সমসাময়িক প্রবণতা

(ক) গ্রন্থগত আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবন ও তার অঙ্গীভূত যৌনজীবন। প্রাচীন কালের শহরে যে জাতীয় যৌন আতিশয্যের প্রসার ঘটেছিল সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাচীনের পাশাপাশি আধুনিক নিদর্শন সন্নিবেশ দ্বারা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে স্থানে স্থানে। বিবাহের প্রাচীন রীতিগুলির অধিকাংশই বহুপূর্বেই বিলুপ্তির কবলিত; দুই তিনটি এখন পর্যন্ত টিকে রয়েছে পরিবর্তিত আকারে। যথা, কন্যাদান রীতি, কন্যাপণের বিকৃতি বরপণ প্রথা, গান্ধর্ব রীতির আধুনিক সংস্করণ। প্রেমমূলক বিবাহ পূর্বকালে রেজিস্ট্রি করা হত না, বর্তমানে এরূপ বিবাহে পঞ্জীকরণ ক্ষেত্রবিশেষে আবশ্যক হয়। প্রাচীন আসুর বিবাহের পরিবর্তিত বর্তমান রূপ বরপণমূলক বিবাহ, যদিও পণপ্রথা আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রাচীন রীতিতে একাধিক স্ত্রীবিবাহ দোষার্হ নয়, কিন্তু বর্তমানে আইনের বলে দণ্ডার্হ। বর্তমানের অনুমোদিত রীতি এক-বিবাহ। বিধবাবিবাহ সমাজের উচ্চস্তরে অতীতে সমর্থিত ছিল, মধ্যযুগে সমর্থন হারিয়েছে এবং বর্তমান কালে পুনরায় সমর্থন লাভ করেছে, যদিও সমাজের নিম্নস্তরে বিধবাবিবাহের সমর্থন সর্বকালেই রয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের ও পুনর্বিবাহের অধিকার সম্ভবত প্রাচীনকালে পুরুষ ও নারী সমানভাবে ভোগ করত, কিন্তু মধ্যযুগীয় দৃষ্টান্ত পুরুষের প্রতি পক্ষপাত দুষ্ট। বর্তমানে এরূপ অধিকার নরনারীর ক্ষেত্রে আইন দ্বারা স্বীকৃত। গণিকাপ্রথা সুদূর অতীতের স্মৃতি বহন করছে এবং বর্তমানে আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে গণ্য হলেও শহরে পরিবেশে পরোক্ষভাবে বা গোপনে পরিপোষিত হচ্ছে। মনুসংহিতায় ভ্রূণহত্যা পাতকরূপে কথিত হয়েছে এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্তও বিহিত হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে আইনের বিধান অনুসারে হাসপাতালে গর্ভপাতকরণ অনুমোদিত, যেহেতু প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীতে সন্তানসংখ্যা ভীতির কারণ ছিল না, কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যাহ্রাস সরকারী নীতিরূপে বিবেচিত (১১।২৪৯)। এসকল দৃষ্টান্ত থেকে স্ফুট হয় যে প্রাচীন নীতির অনুবর্তন বর্তমানের প্রয়োজনের সঙ্গে বেমানান, তাই নূতন সংস্কার বা পরিবর্তন সামাজিক সমর্থন পাচ্ছে। অতীতের প্রয়োজন থেকে যে নৈতিকতা উদ্ভূত হয়েছিল তার সার্থকতা বহুপরিমাণে হ্রাস পেয়েছে বর্তমানের

প্রয়োজন বিবেচনায়। কালের গতির সঙ্গে প্রয়োজন বদলায় এবং নূতন প্রয়োজন আবির্ভূত হয়। প্রয়োজনের অনুগামী নৈতিকতা যুগে যুগে রূপান্তর লাভ করে। পূর্বেকার পাপবোধ ধর্মীয় চেতনাজাত এবং ধর্মীয় ধারণার দ্বারা পুষ্ট। বর্তমানে পাপবোধ অপগত হচ্ছে এবং অপরাধ নির্ণয়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রগত। পাপ ও রাষ্ট্রনির্দিষ্ট অপরাধ একার্থক নয়। পাপের ধারণায় পরলোকের ভয় বিদ্যমান, যেক্ষেত্রে ফলভোগ থেকে নিষ্কৃতি নাই। তাই পাপের গুরুত্ব অধিক এবং পাপবোধ সামাজিক স্থিতির অধিকতর সহায়ক। অপরাধ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বিধানের লংঘন এবং আইন শৃংখলার ব্যবস্থাপনাকে এড়িয়ে অনুষ্ঠিত হলে শাস্তিযোগ্য হয় না। অপরাধ নিবারণ শৃংখলাব্যবস্থা সাপেক্ষ। যেখানে শৃংখলা সহজায়ত্ত, সেখানে অপরাধের ন্যূনতা। যেখানে শৃংখলা শিথিল, সেখানে অপরাধের অনুষ্ঠানে বাধা থাকে না। এজাতীয় শৃংখলা নিতান্তই বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ মাত্র এবং এর সাহায্যে অপরাধ কমবেশি নিবারিত হয় বটে, কিন্তু অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তির মূলে আঘাত করা সম্ভব নয়। শৃংখলার মধ্যে ফাঁক থাকলে অপরাধের সুযোগ সৃষ্ট হয়। ছিদ্রহীন শৃংখলা মনুষ্যসাধ্য নয়। তাই রাষ্ট্রগত নৈতিকতা কতখানি কার্যকরী হতে পারে তা বলা কঠিন। ধর্মবিশ্বাসজাত নৈতিকতা অন্তত আংশিকভাবে আভ্যন্তর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে. তাই পাপের প্রবৃত্তিকে সংযত করে। ধর্মীয় টাবু বা নিষেধ যে জাতীয় মানসিক ভয়কে জাগ্রত করে তা পাপনিবারণে বহুলাংশে সহায়ক। অপরাধ নিবারণে রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা এতখানি সহায়ক হতে পারে না।

(খ) আমরা যতই বাস্তববাদী হয়ে উঠি না কেন, ঔচিত্যের প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে পারি না। যেখানে সহজ অনুমোদন আমাদের মন থেকে নিঃসৃত হয় বা হয় না, সেখানে উচিতের বিবেচনা লুকিয়ে থাকে। কোন কাজকে বা হালচালকে বা সাময়িক প্রবণতাকে আমরা অনুমোদন করি বা করি না উচিতের বিবেচনায়। ঔচিত্যবোধ কিন্তু সকলের একপ্রকার নয়। একজনের বিচারে যা করণীয় তা অপরের বিচারে অকরণীয়। ভালর বা মন্দের প্রশ্নে দুই বিচার হুবহু একরকম হয় না, যদিও এমন কোন মন নাই, যেখানে এই প্রশ্ন ওঠেই না। এক গোষ্ঠীর ভালমন্দ বিষয়ক ধারণা অপর গোষ্ঠীর ভালমন্দের ধারণার সঙ্গে অভিন্ন হয় না। এক অঞ্চলে যা ভাল বা মন্দ তা অপর অঞ্চলের ভাল মন্দের অনুরূপ নয়। এক যুগের ঔচিত্য চেতনা অপর যুগের ঔচিত্য চেতনা থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে। ঔচিত্য বলতে ধরে নিতে হয় কালিক বা আঞ্চলিক বা

ব্যক্তিগত ধারণা। অর্থাৎ, ঔচিত্য আপেক্ষিক ধারণা মাত্র। দেশ কাল পাত্র অনুসারে ঔচিত্যবোধ বদলায়। সার্বদেশিক সার্বকালিক বা সার্বজনীন ঔচিত্যের সন্ধান অবশ্য অযৌক্তিক নয়। কতটুকু অংশে এই ঔচিত্য সর্বদেশের ও সর্বকালের ধারণাগত তা ভেবে দেখবার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাচীন ভারতীয় নৈতিকতার হালচাল। বৈদিক আমলের নীতিবোধ দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায় কর্মকাণ্ডীয় এবং দ্বিতীয় পর্যায় জ্ঞানকাণ্ডীয়। কর্মকাণ্ডীয় আদর্শ ছিল সুখী গৃহস্থ জীবনচর্যা। মাত্র দুটি আশ্রম কার্যত ছিল স্বীকৃত। যথা, ব্রহ্মচর্য বা ছাত্রজীবন ও গার্হস্থ্য। জ্ঞানকাণ্ডীয় আদর্শে প্রাধান্য পেল বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম। বানপ্রস্থ হচ্ছে বনবাসীর জীবন। সন্ন্যাস হচ্ছে ভিক্ষু জীবন। সেকালে ভিক্ষু বলতে বোঝা যেত সন্ন্যাসী। একালের ভিক্ষু হচ্ছে ভিক্ষাজীবী। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শ্রমণরূপে কথিত হত। আদি বৈদিক জীবনাদর্শ সুখভোগ। উপনিষদীয় জীবনাদর্শ মোক্ষ এবং বৌদ্ধ জীবনাদর্শ নির্বাণ। সুখবাদ থেকে উত্তরণ হল দুঃখবাদী নৈতিকতায়। পূর্বে জীবনকে সুখবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হত। পরবর্তী পর্যায়ে দুঃখবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মানবীয় কর্তব্য বিচার্য হল। পূর্বের যজ্ঞীয় আদর্শে পশুবধ অনুমোদিত ছিল। পশুমাংস দেবতাকে আহুতিরূপে প্রদান করা হত এবং ভক্ষিত হত। পশুহিংসা অন্যায়রূপে গণ্য ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে বৈদিক আর্যেরা ছিলেন মাংসভক্ষক। দ্বিতীয় পর্যায়ে যজ্ঞ নিন্দিত হল এবং অহিংসা নীতি গৃহীত হল। এই অহিংসা নীতি সর্বজীবের প্রতি প্রযোজ্য ছিল এবং শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ, জীবকেন্দ্রিক নৈতিকতা এক্ষেত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে। এই নৈতিকতা সমাজের সর্বাংশে গৃহীত হয়েছিল এমন কথা বলা যায় না। সেকালে সমাজের একাংশে মাংসভক্ষণ ও মদ্যপান প্রচলিত ছিল। (অহিংসন্ সর্বভূতানি, ছা উপ ৮।১৫।১)।

কিন্তু প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে অহিংসা ও সত্য আদর্শরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অহিংসা শুধু মানুষের ক্ষেত্রে সীমিত ছিল না। সকল জীবকে অহিংসা নীতির বিষয় করা হয়েছিল। বর্তমান কালে মানবতাবাদ আদর্শ হিসেবে প্রচারিত হয়ে থাকে। মানবতা মানবকেন্দ্রিক আদর্শ। মানুষকে হিংসা করা উচিত নয় একথাই এই আদর্শের প্রতিপাদ্য। মানুষ ব্যতীত অন্য জীবকে, এমন কি গৃহপালিত জীবকে বধ করা চলতে পারে খাদ্যের জন্য। আধুনিক কালের নীতিতে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। মানুষকে ঘিরে সর্বপ্রকার কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমানের নীতিশাস্ত্র মানবকেন্দ্রিক এবিষয়ে সন্দেহ নাই। পশুহত্যার উপরে কোন

টাবু বা নিষেধ প্রকৃতপক্ষে নাই। আধুনিক চিন্তায় মানুষের প্রতি পক্ষপাত অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক কালে শ্রেণীকেন্দ্রিক নৈতিকতা প্রস্তাবিত হয়েছে। এই ন্যায়তত্ত্বে শোষিত শ্রেণীকে কেন্দ্রস্থলে রেখে কর্তব্য অকর্তব্য বিচার করা হয়েছে। এই নীতিতন্ত্র আবার দ্বিধাবিভক্ত। যথা —(১) শ্রেণীসমন্বয়ের নীতি ; (২) শ্রেণী-সংগ্রামের নীতি। প্রথম নীতিতে শোষক শ্রেণীকে উচ্ছেদের কথা নাই, শোষণকে সংযত করার প্রস্তাব কার্যকরী করা হচ্ছে, যার একটা পরীক্ষণ হচ্ছে welfare economy বা জনকল্যাণমূলক অর্থনীতি। এই নীতিতে বিপ্লব বর্জনীয়রূপে গণ্য হয়েছে। দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে বিপ্লবের নীতি, যার অর্থ শোষকশ্রেণীর সমূলে উচ্ছেদ। এই নীতি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নৈতিকতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রকে শোষিত শ্রেণীর হাতিয়াররূপে বিবেচনা করা হয়েছে।

পুঁজিতন্ত্রী কল্যাণরাষ্ট্রের ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো স্বতন্ত্র বলা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই যে সমাজ বিকশিত হয়ে উঠছে তা কিন্তু বহু বিষয়ে সাদৃশ্যযুক্ত। উভয় ক্ষেত্রেই কয়েকটি নবজাত প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হচ্ছে। যথা,—

(১) যৌথ পরিবার বিলীয়মান ও রক্ত সম্পর্কের গুরুত্ব হ্রাসের দিকে। ব্যক্তিগত পরিবার বা ছোট ছোট স্বামী-স্ত্রী-সন্তানমূলক পরিবার গড়ে উঠছে। গৃহনির্মাণ রীতিতেও ব্যক্তিগত পরিবারের উপযোগী ফ্ল্যাট নির্মাণের দিকেই ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। (২) সন্তানের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিবার বিবেচ্য নয়। সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করছে। (৩) বহুক্ষেত্রে কন্যাজামাতার সঙ্গে শ্বাশুরী বাস করতে বাধ্য হয়। বিবাহিত পুত্র পিতামাতার সঙ্গে বাস করে না পিতামাতা আর্থিক দিক দিয়ে পুত্রের উপর নির্ভরশীল নয়, যেহেতু বার্ধক্যভাতা বহুক্ষেত্রেই চালু হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জন্য আবশ্যকীয় সেবাশুশ্রূষা সুলভ নয়। বার্ধক্য ও জরা সমস্যারূপে পরিণত। (৪) তারুণ্য ও বার্ধক্যের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বন্ধনের নীতি স্ফুট হচ্ছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আন্তরিকতাময় বন্ধনসূত্রগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং উদ্ভূত হচ্ছে কৃত্রিম বন্ধনসূত্র, যার ফলে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধ মূর্ত হয়ে উঠছে। বাহ্যিক দরদ প্রকাশ, বাঙ্‌ময় সামাজিকতা হচ্ছে আধুনিক রীতি। এর ভিতরে প্রাণের স্পর্শ নাই, জীবনের লক্ষণ নাই। কেউ কারও জন্য স্বার্থত্যাগে ব্রতী নয়। ব্যক্তিগত কর্তব্যগুলিকে রাষ্ট্রের

উপর বা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা হচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্র তো অনেক সময়েই ব্যক্তিগত সমস্যাকে বুঝতেই পারে না, আর প্রতিষ্ঠানগুলি ছকবাঁধা কাজ করে মাত্র। (৫) স্বামী-স্ত্রীসম্পর্কেও ফাটল দেখা দিচ্ছে এবং বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। উভয় প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেই অপঞ্জীকৃত বিবাহ, প্রাক্‌বিবাহ স্বেচ্ছাচার ও বিবাহোত্তর স্বেচ্ছাচার, স্খলিত কৌমার্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে। (৬) যৌন জীবনে নিয়ন্ত্রণ উঠে যেতে বসেছে। একটা ভয়াবহ দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত হচ্ছে, যা যৌন স্খলনকে সামান্য ত্রুটী রূপে গণ্য করে। পারিবারিক জীবনের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় মানুষের আকর্ষণকেন্দ্র প্রায় অবলুপ্ত, এর ফলে পিতামাতা আত্মীয়স্বজন যথার্থ আপনজনরূপে আর গণ্য নয়। সন্তানস্নেহ, পিতামাতার কর্তব্য, সন্তানের কর্তব্য, এই সকল নৈতিক বিচার যেন অনাবশ্যক হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র বা বৃহত্তর সমাজ পারিবারিক তথা রক্তগত সম্পর্কগুলিকে গিলে ফেলছে।

(গ) বর্তমানে যে নূতন ধরণের নৈতিকতা রূপ লাভ করছে, তাকে বলা চলে প্রবৃত্তিমার্গ। এই মার্গে সংযমের বা আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন কথা নেই। আহার বিহার, যৌনজীবন, ক্লাব জীবন প্রভৃতিতে ইচ্ছার উপরে কোন শাসন নেই। বিধি নিষেধের বালাই নেই। ওগুলি তো বাইবেলের ব্যাপার বা ধর্মীয় ব্যাপার। মাথার উপরে বাইবেল চাপিয়ে জীবনের গতি মন্থর করা চলে না। তাই ইন্দ্রিয় সংযমের বা মানসিক নিয়ন্ত্রণের উপদেশগুলি আজ অকেজো ও অচল। বাধাহীন মানসিকতাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতারূপে অভিহিত করা হচ্ছে। ব্যক্তির ইচ্ছায় বাধা না থাকাই হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীন জীবন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা নাই নূতন জীবন দর্শন বা রাজনৈতিক মত প্রতিপাদনের ব্যাপারে, অন্য কোন ব্যাপারে নয়। জীবন যাপন প্রণালীতে বা যৌন জীবনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কার্যত প্রায় নেই, কেননা অভিভাবকের আসন শূন্য পিতামাতার কর্তৃত্ব উঠে যাওয়ার ফলে। রাষ্ট্র বা বৃহত্তর সমাজ রাজনৈতিক অভিভাবক মাত্র।

ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবার মতো। আমরা বাহ্য দৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রের ঝগড়াই দেখি, উভয়ের মিল দেখি না। একথা আজ আর অস্পষ্ট নয় যে উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের ভিত্ থেকে ধর্মের শিকড়গুলি উপড়ে ফেলা হচ্ছে। ধর্ম নির্বাসিত হলে বিধি নিষেধও পাততাড়ি গুটায়। ধর্মীয় বাঁধনকে বিদায় জানানো আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক নীতিতে ধর্মকে আফিমরূপে গণ্য করা হয়েছে এবং পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম বাধারূপে ধর্মকে বিবেচনা করা হয়েছে।

দুটি সিদ্ধান্তই অবাধ ভোগবাদী ও সুখবাদী নৈতিকতাকে জন্ম দিয়েছে। রেণেসাঁর যুগে এই নৈতিকতা ভ্রূণাবস্থায় ছিল এবং শিল্পযুগে হয়েছে ভূমিষ্ঠ। নানাপ্রকার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক ভোগবাদী চিন্তাধারা আজ যৌবনের দর্শনরূপে পরিণত। এই উচ্ছল আবেগচঞ্চল বল্গাহীন ঘোড়াকে আজ কে দমন করবে? শিল্পী ও সাহিত্যিকরা মোটামুটিভাবে চলমান জীবনের স্তুতিকারের ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ মুখ ফুটে সংযমের কথা বলেন না। সত্যিই তো আধুনিক জীবন-দর্শনকে স্বীকৃতি জানালে সংযমের কোন সূত্রকে খুঁজে পাওয়া যায় না তত্ত্বের দিক দিয়ে অথবা যুক্তির দিক দিয়ে। আধুনিকতার বাহ্যিক জলুস সকলকে বোকা বানিয়েছে।

সেকালের ধর্মীয় শাসনে গলদ ছিল না এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু গলদ থাকা এক জিনিস, আর নিয়ন্ত্রণ না থাকা অন্য জিনিস। ধর্মকে ভুলে দেওয়ার প্রশ্ন যখনই উঠেছে, তখনই ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণগুলিও উঠে যেতে বসেছে। প্রাচীন ভারতে একবিবাহের পাশাপাশি দ্বি-ত্রি-স্ত্রীবিবাহ বা বহুস্ত্রীবিবাহ সমর্থন পেত, কিন্তু ব্যভিচারবোধ ছিল। সমাজের বাঁধন ছিল দ্বৈত নৈতিকতার (double moral standard) মধ্যে। অর্থাৎ, বিবাহিত জীবনের পাশা-পাশি গণিকাপ্রথার মধ্যে। এই ব্যবস্থায় যৌন নিয়ন্ত্রণ এবং যৌন অনিয়ন্ত্রণ পাশাপাশি বিরাজ করত। এরূপ নৈতিকতার চেহারা উৎকৃষ্ট এমন কথা বলছি না বা গণিকাপ্রথাকে সমর্থন করছি না। কিন্তু লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে সেকালে ব্যভিচার ছিল নিন্দনীয় এবং প্রাক্‌বিবাহ বা বিবাহোত্তর যৌন স্খলন পাপাচাররূপে বিবেচিত ছিল। পাপবোধ থেকে টাবুচেতনা উদ্ভূত হয়েছিল। এর ফলে ছিল সমাজের নৈতিক বাঁধন। আজকের দৃশ্য অন্য প্রকার। এক-বিবাহকে আইনগত করা হয়েছে বটে, কিন্তু যৌনবিচ্যুতি সংক্রান্ত পাপবোধ বিলুপ্ত হতে বসেছে। পশ্চিমী সমাজে প্রাক্‌বিবাহ ও বিবাহোত্তর যৌন চ্যুতি একপেয়ালা চা'পানের মতো সহজ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে ভয়ের কথা হচ্ছে যৌনতা বিষয়ক টাবুচেতনা প্রশ্নের বিষয় হয়েছে। সামাজিক জীবনের অভিধান থেকে সংযম-বাচক শব্দগুলি বিসর্জিত হচ্ছে। এই নবীনতার ঢেউ এসেছে আমাদের সমাজেও এবং পশ্চিমীকরণের দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

'অনিয়ন্ত্রণের পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদত্ত হয়ে থাকে তার উৎস শিল্পযুগের জীবনদর্শন। এই দার্শনিক চিন্তাকে ঘিরে রয়েছে জড়বাদ, ভোগবাদ, সুখবাদ, স্বভাববাদ ইত্যাদি। জড়বাদী চিন্তাসূত্র পাপপুণ্যকে স্বীকার করে

না। তার বক্তব্য একধরণের স্বভাববাদ। যা কিছু স্বভাবের অনুকূল তাই ভালরূপে এবং যা কিছু স্বভাবের প্রতিকূল তা মন্দরূপে বিবেচিত হয়েছে। পাপবোধের দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল সমাজের নৈতিক বাঁধন। এই নব্য চিন্তায় কোন প্রকার নৈতিক বাঁধন প্রসঙ্গ নাই। স্বভাবের অনুসরণের তাৎপর্য হচ্ছে যে-জাতীয় বাঁধন এখনও সমাজে টিকে আছে তাকে তুলে দেওয়া। স্বভাব-চারিতায় ইচ্ছার স্বাধীনতায় আভ্যন্তর বিবেকের চাপের কোন প্রশ্ন নেই, শুধুমাত্র বাহ্যিক চাপের প্রশ্ন রয়েছে। এই বাহ্যিক চাপ ধীরে ধীরে রাষ্ট্রগত হয়ে যাচ্ছে। একে বলা চলে রাষ্ট্রীয় বিবেক দ্বারা সংগঠিত নিয়ন্ত্রণ। এই জিনিসটা সামাজিক বিবেক থেকে নিঃসৃত নিয়ন্ত্রণ নয়। সমাজের কর্তৃত্ব থেকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে উত্তরণ বা অবতরণ ঘটছে। রাষ্ট্রকে ভালমন্দের বিচারকরূপে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলকে ভালমন্দের নিয়ামকরূপে গণ্য করা হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে পুরাতন বিবেকবোধ, পাপবোধ আর অবকাশ পাবে না। ভালর ধারণা, মন্দের ধারণা আর ধর্মীয় পুস্তক থেকে নিঃসৃত হবে না। রাষ্ট্রীয় বা দলীয় বিবেক ভালমন্দের মাপকাঠিকে করবে নির্ধারণ। এই ধরণের নিতান্ত বাহ্যিক নৈতিকতা হচ্ছে আধুনিকতম জড়-বাদী ও সুখবাদী জীবনদর্শনের মূল কথা। এ যুগে তাই প্রকৃত নৈতিক বাঁধন বলতে যে জিনিস বোঝা যায় তা সমাজ থেকে হচ্ছে নির্বাসিত। আমরা ধীরে ধীরে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনিয়ন্ত্রণের যুগে প্রবেশ করছি। পুরাতন নৈতিকতার কিছু অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে, তাই আসন্ন পরিবর্তনের ধারা বুঝতে পারছি না। যদি বুঝতে পারতাম, তাহলে সাবধানতার কথা উঠতই।

শ্বেতাঙ্গ সমাজে যে জিনিস চালু হয়েছে, তাই এদেশীয় সমাজেও চালু হতে চলেছে। এদেশেও জড়বাদী ও ভোগবাদী চিন্তাধারা আমদানীকৃত হচ্ছে। পশ্চিমী ছাঁচের দ্বারা এদেশীয় সমাজের রূপান্তর সাধিত হচ্ছে। পানালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি, অবাধ যৌন রতি, তরুণ তরুণীর অবাধ মেলামেশা প্রভৃতিতে পশ্চিমী অনুকরণ প্রতিভাত। বৃদ্ধ ও তরুণের সমন্বয় আর কাম্য নয়। তরুণেরা প্রবীণদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের শিকলগুলি খুলে ফেলবার জন্য। তাঁরা ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আরও অধিক পরিমাণে চাই।

অতীতের নৈতিকতার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে বহুকাল ধরে। প্রাচীন কাহিনীতে যে সমাজচিত্র সুলভ তা থেকে একালের উপযোগী নীতিশিক্ষা সম্ভব হতে পারে এমন কথা বলা যায় না। বর্তমান হিন্দু সমাজ

মহাভারতীয় সমাজে নিশ্চিতই রূপান্তরিত হতে পারে না এবং তা কাম্যও নয় বা সম্ভাব্যতার অন্তর্গতও নয়। পিছনে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ বাস্তবানুগ নয়। বর্তমানকাল যথার্থভাবে যেমন অতীতের নকল হতে পারে না, তেমনি একটি অঞ্চল অপর অঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করতে পারে না। প্রাচীন নৈতিকতায় বহু সামাজিক রীতি অন্তর্গত ছিল, যা একালের অনুপ-যোগী। কিছু কিছু মহাভারতীয় রীতি, যথা,—নিয়োগপ্রথা, প্রাচীনকালেই সমর্থন হারিয়েছিল। বর্তমানে সেই সব প্রথায় পুনঃ প্রবর্তনের প্রশ্ন উঠে না। মহাভারতীয় কাহিনী অনুসারে রাজা যযাতি নিজ ভোগসুখের জন্য পুত্রকে স্বীয় জরা অর্পণ করেছিলেন অথবা ভীষ্ম পিতাকে দ্বিতীয় বিবাহের সুযোগ দেওয়ার জন্য চিরকুমার ব্রত পালন করেন। এ জাতীয় ঘটনা থেকে অসম্ভাব্য অংশ বাদ দিলে যে নীতি প্রতিভাত হয় তা একালের চোখে বিদ্ঘুটে। পিতার ভোগসুখের বা বিবাহের জন্য পুত্রের যৌন উপবাস সেকালের কোন সামাজিক প্রথার পরিচায়ক নয়। এজাতীয় ঘটনা সেকালেও কদাচিৎ ঘটত। একালেও এরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে কখনও কখনও। বিবাহযোগ্য পুত্র থাকা সত্ত্বেও কিছুকাল পূর্বেও বিপত্নীক বৃদ্ধ দারগ্রহণ করতেন। সকল বৃদ্ধই এরূপ অপরাধে লিপ্ত হতেন এমন কথা বলছি না। কোন কোন বৃদ্ধ এরূপ দুর্মতি দেখাতেন। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনাবলীর মধ্যে চোখে পড়ে যে শ্বেতাঙ্গ সমাজেও বৃদ্ধ ঠাকুরদা বা ঠাকুরমা বিবাহের রশি গলায় পরছেন। এরূপ খবর থেকে দুর্বুদ্ধির চেয়েও ভয়াবহ একটা সামাজিক চেহারা ফুটে ওঠে। এই সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহিত পুত্রের সহিত বৃদ্ধ পিতামাতার একত্রবাস সম্ভব হয় না। বিপত্নীক বৃদ্ধরা ও বিধবা বৃদ্ধারা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। কেউ কেউ নিঃসঙ্গতার সমাপ্তি খোঁজেন নূতন পরিণয়ের পথ বেছে নিয়ে।

অতীতের হুবহু অনুকরণ সম্ভব নয় বলেই প্রাচীন নৈতিকতার মধ্যে শিক্ষণীয় অংশ নেই এমন কথা বলা যায় না। সেকালেও প্রবৃত্তিমার্গ অনুসৃত হত জনগণের একটা অংশে, কিন্তু তার পাশাপাশি নিবৃত্তিমার্গ প্রচলিত ছিল। প্রবৃত্তিকে সংযত রাখার জন্য নিবৃত্তিমার্গের উপযোগিতা ছিল। সম্ভবত আতিশয্য গোষ্ঠীগত ব্যাপার ছিল মাত্র। বৃহত্তর সমাজের যে চিত্র প্রাচীন সাহিত্য থেকে উদ্ধার করা যায়, তা উচ্ছৃংখল জীবনের পরিচায়ক নয়। এটুকু অনুমান করা চলে যে নিবৃত্তির আদর্শ দ্বারা প্রবৃত্তিমার্গ নিয়ন্ত্রিত হত। নিয়ন্ত্রণের পক্ষে শক্তিশালী জনমত ছিল। নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা বিষয়ে সামাজিক চেতনা ছিল। জীবনদর্শনের মধ্যে অনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নি। চার্বাকীয় নৈতিকতায় যৌন অনিয়ন্ত্রণের নির্দেশক সূত্র পরিষ্কার-

ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। অতীতের নৈতিকতায় অন্তর্ভুক্ত সংযমের সূত্র একালের পক্ষেও অনুপযোগী নয় বলেই মনে হয়।

মনুসংহিতা অনুসারে—ন মাংসভক্ষণে দোষঃ ন মদ্যে ন চ মৈথুনে, প্রবৃত্তিঃ এষা ভূতানাং নিবৃত্তিঃ তু মহাফলা। মাংসাহার, মদ্যপান ও স্ত্রীসংসর্গ দোষযুক্ত নয়, যেহেতু এবিষয়ে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রয়েছে। কিন্তু এ সব বিষয় থেকে নিবৃত্তি সুফলজনক। (মনু ৫।৫৬)

এই উক্তিটি প্রাচীন ভারতীয় নৈতিকতার পরিচায়ক। যতিধর্ম বা সন্ন্যাস সব সাধারণের আচরণীয় ছিল একথা বলা যায় না। প্রবৃত্তিমার্গ সমাজের একাংশে অনুসৃত হত। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত সামাজিক জীবনকে সংযত রাখত।

চারি আশ্রমের বিভাগের মধ্যেও প্রাচীন নৈতিকতার পরিচয় মেলে। গার্হস্থ্য আশ্রম হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত যৌন জীবন। যৌন উপবাস বা শৃংখলবিহীন যৌনতা সামাজিক স্থিতির প্রতিকূল। দুই আতিশয্যের মধ্যবর্তী ছিল গৃহস্থ জীবন। এই মধ্যপন্থা বজায় থেকেছে বানপ্রস্থের পরিকল্পনায়। বানপ্রস্থ হচ্ছে বনবাসীর জীবন এবং বার্ধক্যকালের জন্য বিহিত। সংসার থেকে অবসর গ্রহণের প্রাচীন নাম ছিল বানপ্রস্থ। ব্যক্তিগত জীবনের মঙ্গলকর অনেক বিধান ধর্মগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এগুলির উপযোগিতা একালের পক্ষেও স্বীকার্য। সেকালের নৈতিকতায় ব্যক্তিগত কর্তব্যের নির্দেশ থাকত, কিন্তু একালের নৈতিকতায় ব্যক্তিগত জীবন গঠনের বিষয় উপেক্ষিত হয়।

একটা আধুনিকতম আলোচ্য বিষয় দুর্নীতি। এই জিনিসটি সেকালেও ছিল এবং এর প্রতিরোধের জন্য রাজকীয় ব্যবস্থাদি ছিল। এর বিরুদ্ধে একটা সামাজিক বিবেক জাগ্রত ছিল। সম্ভবত ধর্মীয় বাঁধন থাকার ফলে এই বিবেক সৃষ্টি হয়েছিল। বিগত তিন দশকের পূর্বেও এই বাঁধন একেবারে নষ্ট হয় নাই। বর্তমানে এই বাঁধন ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে পাপ-বোধের বিলুপ্তির ফলে এবং দুর্নীতি ব্যাপকতা লাভ করছে। বর্তমানে দুর্নীতি প্রায় সর্বগত। এই ঘটনা বুর্জোয়া সমাজের অবক্ষয়জনিত এমন কথা কেউ কেউ বলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পরিবেশও দুর্নীতিমুক্ত হতে পারে নি এমন খবরও আমরা পাই। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ধর্মীয় বাঁধনকে বাদ দিয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সার্থক হতে পারে না। নিয়ন্ত্রণের পশ্চাতে সামাজিক বিবেক জাগ্রত না হলে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় রক্তচক্ষু যথেষ্ট নয়। দুর্নীতি-গ্রস্ত পরিবেশে পুলিশ ও আইন খুব কার্যকরী নিবারক হতে পারে না।

পরলোকের ভয় বা পাপবোধ দ্বারা সৃষ্ট হয় আভ্যন্তর নিয়ন্ত্রণ। এজাতীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে দুর্নীতির যথার্থ প্রতিরোধ সাধ্য নয়। অবশ্য বর্তমানের নাস্তিক চিন্তাধারার মধ্যে পাপ, পুণ্য, ধর্ম, অধর্ম সংক্রান্ত প্রসঙ্গের অবতারণাকে অনেকে উপহাস করবেন। একটা বিষয়ে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। অপকর্মের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে অপকর্ম নিবারিত হবে একথা সকলেই বলেন। কিন্তু অপকর্ম নিবারণের জন্য ব্যবহৃত সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রগুলির কার্যকরিতা যে গণবিবেকের উপর নির্ভরশীল সেদিকে কেউ নজর দেন না। সেই গণবিবেক ধর্মীয় বাঁধনের ক্রমিক বিলুপ্তির ফলে নিজেই বিলুপ্ত হতে বসেছে। তাই দুর্নীতি দমনের নীতিকথায় বাহ্যিক সমর্থন মেলে, গণমনের সমর্থন মেলে না।

(খ) এস্থলে আধুনিক সমাজতন্ত্রের জন্মদাতা লেনিনের বক্তব্য স্মরণীয়। লেনিন ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু সংযমের নীতিতে আস্থা পোষণ করতেন। এই বিষয়টা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ক্লারা জেটকিন লিখিত স্মৃতিকথার অন্তর্ভূত তাঁর সহিত লেনিনের কথোপকথনের বিবরণে। এই সময়ে জার্মানিতে যৌন প্রগতি আন্দোলন চলছে এবং একটি অভিমত চালু হয়েছে যে যৌন পরিতৃপ্তি এক গ্লাস জল পানের মতোই সহজ ব্যাপার। লেনিন ক্লারাকে বোঝালেন যে যৌন সম্পর্কের সামাজিক দিকটা বিবেচ্য। প্রেমের ভিতর দিয়ে জন্মলাভ করে একটি তৃতীয় জীবন বা সন্তান। সেই সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না প্রেমরত নরনারী। তাই প্রেমের মধ্যে সংযমের কথাকে বাদ দেওয়া চলে না। তৃষ্ণা দূরীকরণের উপমা টেনে আনলে বলা চলে যে বহুলোকের মুখের স্পর্শ দ্বারা এঁটো গ্লাস থেকে সুস্থ মানুষ জল পান করে না। এই উক্তিতে প্রতীত হয় যে প্রাক্‌বিবাহ বা বিবাহোত্তর স্বেচ্ছাচার ছিল লেনিনের অনভিলষিত। এর সঙ্গে সমসাময়িক কালের সমাজতান্ত্রিক অঞ্চলের হালচাল সঙ্গতিবিহীন। সমাজতন্ত্রের অঞ্চলগুলিতে যৌন স্বাধীনতার নমুনা বর্তমানে স্বেচ্ছাচারের আকার লাভ করেছে এরূপ সংবাদ মাঝে মাঝে আমাদের গোচরীভূত হয়। অতিরিক্ত মদ্যপানের প্রসার ঘটছে সোভিয়েট ভূমিতেই এবং তা প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও। এরূপ পরিস্থিতি থেকে সূচিত হয় যে অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলেও নৈতিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না। [যৌন সমস্যায় লেনিনের মতামত, ক্লারা জেটকিনের লেনিন স্মৃতি থেকে সংকলিত, ১৯৪৪]

বর্তমানের তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে সূচিত হয় যে সামাজিক সমৃদ্ধির (affluence) ফলে অনায়াস জীবন যাপনের নানারকম সুযোগসুবিধা অধিগত হয়, কিন্তু ভোগবিলাসের আতিশয্যের দিকে প্রবণতা দেখা দেয়। ঈদৃশ আতিশয্যের অঙ্গীভূত পানদোষ বা যৌন স্বেচ্ছাচার। ভোগবাদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকৃত হলে আতিশয্যের যুক্তিকে খণ্ডন করা চলে না।

এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃতপক্ষে আত্মসুখবাদের মর্মকথা এবং যথার্থ জন-কল্যাণের অথবা প্রকৃত যৌথতন্ত্রের বা কমিউনিজমের পরিপন্থী। তাই নূতনতর ঐতিহ্যমুখী চিন্তার আবশ্যকতা অথবা দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের কথা এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

পরিশিষ্ট

(ক) হিন্দু সমাজে আইন প্রণয়ন দ্বারা সংস্কার প্রচেষ্টা

ভারতে ইংরাজ আমলের সূচনা থেকে হিন্দু পরিবারের আধুনিকীকরণের জন্য ধারাবাহিকভাবে বিবিধ আইন প্রণীত হয়েছে। এই সকল আইনের ক্ষুদ্র তালিকা প্রদত্ত হচ্ছে।

(১) রামমোহন রায়ের সাহায্যে লর্ড বেনটিংক কর্তৃক ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিবারক রেগুলেশন প্রবর্তন।

(২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ১৮৫৬ সালে প্রবর্তিত আইন দ্বারা হিন্দু বিধবা বিবাহ বৈধকরণ।

(৩) কেশব সেনের উদ্যোগে প্রবর্তিত ১৮৭২ সালের ৩নং বিশেষ বিবাহ আইন দ্বারা সিভিল বা পঞ্জীকৃত বিবাহের অধিকার স্থাপন। এই আইনের বলে অহিন্দু পরিচয়ে অসবর্ণ বিবাহ সম্ভব হয়। ব্রাহ্মরা অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করেন।

হরি সিং গৌড়ের চেষ্টায় প্রবর্তিত ১৯২৩ সালের আইনের বলে হিন্দু পরিচয়ে অসবর্ণ সিভিল বিবাহের অধিকার স্থাপন।

১৯৫৪ সালের স্পেশাল ম্যারেজ আইন অনুযায়ী ধর্মীয় পরিচয় বজায় রেখে হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর অথবা হিন্দুর সঙ্গে অন্য ধর্মাবলম্বীর সিভিল বিবাহের অধিকার স্থাপিত হয়েছে। এই আইন হচ্ছে ১৮৭২ সালের ৩নং বিশেষ বিবাহ আইনের সংশোধিত রূপ।

(৪) হরবিলাস সারদার চেষ্টায় প্রবর্তিত ১৯২৯ সালের সারদা অ্যাক্ট বা শিশুবিবাহ নিবারক আইন দ্বারা বরের ন্যূনতম বয়স আঠারোয় এবং কনের ন্যূনতম বয়স পনেরোয় নির্দিষ্টকরণ।

(৫) ১৯৪৬ সালের হিন্দু বিবাহে বাধা দূরীকরণ আইন দ্বারা সগোত্র বিবাহ বৈধকরণ এবং একবর্ণান্তর্গত দুই উপবর্ণের পাত্রপাত্রীর বিবাহ বৈধকরণ।

১৯৪৯ সালের হিন্দু বিবাহ বৈধতা আইনের বলে (ক) দুই বর্ণের পাত্র-পাত্রীর বিবাহ বৈধকরণ; (খ) দুই ধর্মের পাত্রপাত্রীর বিবাহ বৈধকরণ, অর্থাৎ, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি দেশজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে কোন বাধা থাকল না।

১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন দ্বারা (ক) অসপিণ্ড বিবাহ বিধির সংকোচন, অর্থাৎ, বরের ও কনের বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি পর্যন্ত এবং মাতামহ পর্যন্ত সপিণ্ড গণনা প্রবর্তন। (খ) এই আইনের বলে স্বামীর ও স্ত্রীর একবিবাহ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (গ) এই আইন দ্বারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শর্তমূলক জুডিসিয়াল সেপারেশনের বা আইনসম্মত বিচ্ছেদের অধিকার এবং শর্তমূলক ডাইভোর্সের বা পূর্ণবিচ্ছেদের অধিকার পেয়েছে। আইনসম্মত বিচ্ছেদ হচ্ছে বিবাহবন্ধন বজায় রেখে পৃথকভাবে অবস্থান এবং যৌন সহবাসে বিরতি। [হিন্দু আইনে বিবাহ, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬২, পৃঃ ৫৭-৬৭ ; Hindu Law, Mulla, 1966, pp. 602, 619-625, 630, 646, 647, 682-684, 748, 749 ; The Special Marriage Act, 1954, Govt. of India, 1971]

(৬) ১৯৭১ সালের ভেষজবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গর্ভাবস্থা অবসানকরণ আইন অনুসারে ১৯৭২ সাল থেকে হাসপাতালে গর্ভপাতকরণ চালু হয়েছে। এস্থলে উল্লেখ্য যে ১৯৭২ সালে পূর্ব জার্মানিতে গর্ভপাত বৈধতা আইন প্রবর্তিত হয়েছে। [A. B. Patrika, April 1, 28, 1972.]

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবৃতি অনুসারে ভারতে প্রতি সাতজন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন অবৈধভাবে গর্ভপাতের আশ্রয় নিত উল্লিখিত আইন প্রণয়নকালে। [Ibid., April 1, 1972]

একটি বিবরণ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে আলিপুর জেলাজজ আদালতে প্রতি বছরে প্রায় ৬০০ বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন রেজিস্ট্রি হচ্ছে। ১৯৭২ সালে এরূপ আবেদন সংখ্যা ৫৮২। প্রতি বছরেই আবেদন সংখ্যা বেড়ে চলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেজিসট্রিকরা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। সামাজিক বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংখ্যা কম। অধিকাংশ বিচ্ছেদের দরখাস্তের মধ্যে প্রবঞ্চনা ও ব্যভিচারের অভিযোগ থাকে। [যুগান্তর, ৩১ মে, ১৯৭৩]

(৭) ১৯৫৬ সালের নারী ও বালিকা সংক্রান্ত নীতিবিরুদ্ধ ব্যবসা নিবারক আইন দ্বারা সমগ্র ভারতে গণিকা প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনে একুশ বছর পূর্তির পূর্ব পর্যন্ত বয়সের স্ত্রীলোক বালিকারূপে গণ্য হয়েছে। দেহ দানের দ্বারা উপার্জনকারিণীকে বলা হয়েছে গণিকা। এই আইনের বলে গণিকাবৃত্তির সহায়কমাত্রই শাস্তিযোগ্য। (ক) গণিকালয়ের দখলকার বা পরিচালক ; (খ) যিনি ভাড়া করা গৃহকে গণিকালয়রূপে ব্যবহার করছেন ; (গ) যিনি অন্য ব্যক্তিকে নিজ ভাড়াকরা গৃহ গণিকালয়রূপে ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন ; (ঘ) যে গৃহস্বামী নিজ গৃহ ভাড়া

দেওয়ার সময়ে অবগত আছেন যে তাঁর গৃহ গণিকালয়রূপে ব্যবহৃত হবে ; (ঙ) আঠারো বছরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক যে ব্যক্তি কোন নারীর বা বালিকার বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা উপার্জিত অর্থের সহায়তায় জীবিকা নির্বাহ করে ; (চ) যে ব্যক্তি কোন নারীকে বা বালিকাকে তার সম্মতিতে বা অসম্মতিতে বেশ্যা-বৃত্তির উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করে , (ছ) যে ব্যক্তি কোন নারীকে বা বালিকাকে তার সম্মতিতে বা অসম্মতিতে গণিকালয়ে আবদ্ধ করে অথবা তার পতি ব্যতীত অন্য পুরুষের সহিত সঙ্গমের জন্য তাকে কোন গৃহে আবদ্ধ করে ; (জ) যে নারী বা বালিকা বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্তা ; (ঝ) যে পুরুষের সহিত বেশ্যাবৃত্তি চলছে ;—এই সকল ব্যক্তি কারাদণ্ডের যোগ্য। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় প্রকাশ্যে ঘোষিত গণিকাবৃত্তি বন্ধ হলেও পরোক্ষ বা গোপন বেশ্যাবৃত্তি এখনও চালু রয়েছে। (The suppression of immoral traffic in women and girls act, 1956 , Act No. 104 of 1956.)

(খ) বিদেশীয় হালচাল

ইউরোপে অল্পবয়সীদের প্রাক্‌বিবাহ যৌন সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে এরূপ খবর মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। একটি সমীক্ষার ফলে জানা যায় যে ব্রিটেনে প্রতি বছরে অবিবাহিতা তরুণীদের মধ্যে দুই লাখের গর্ভসঞ্চার হয় এবং অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। এই সমীক্ষা চালিয়েছেন অধ্যাপক-ডাক্তার জন নিউটন।

সুইডেনের রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো কৃত অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে যে বর্তমানে সুইডিশ তরুণ সমাজে বিবাহের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বিবাহবিহীন যৌন সম্পর্ক বাড়তির দিকে। প্রতি পাঁচটি নবজাতকের মধ্যে একটি অবৈধ সন্তান। ১৯৬৬ সালে বিবাহের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬১০০০, কিন্তু ১৯৭১ সালে বিবাহের সংখ্যা হচ্ছে ৩৯০০০। [যুগান্তর, ১২ মে, ১৯৭২, দিলীপ মালাকারের বিবৃতি।]

শহরীকরণের সঙ্গে জড়িত ক্ষুদ্রায়তন পরিবার এবং বিবাহবিহীন পরিবার। শহরের পরিবেশে ছোট ছোট স্বামীস্ত্রীমূলক পরিবার গড়ে উঠতে থাকে। বিবাহবিচ্ছেদের প্রবণতাও বাড়তে থাকে স্বামীস্ত্রীর পারস্পরিক সহনশীলতার অভাবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই প্রকার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে শহরীকরণের ফলে। ইজভেসটিয়া (২০ জুলাই, ১৯৭২) প্রদত্ত সংবাদ অনুসারে প্রতি তিনটি সোভিয়েট বিবাহের মধ্যে একটি বিবাহ তিন বছর পূর্তির পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়। বহুক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ

প্রয়োজনটি হয় না। বিচ্ছেদের পরে অনেক পুরুষ পুনর্বিবাহে অনিচ্ছুক থাকে। অবিবাহিত জীবন যাপনের দিকেও প্রবণতা লক্ষিত হচ্ছে ইদানীন্তন কালে। [Problems of Communism, July-August, 1973, Population policy in the USSR, H. D. Cohn, pp. 52, 53.]

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানিতে যৌনতা সংক্রান্ত নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। এই আইনের অধিকাংশ ধারা ১৯৭৩ সালেই কার্যকরী হচ্ছে, শুধুমাত্র অশ্লীল সাহিত্য সংক্রান্ত ধারাটি ১৯৭৪ সালে কার্যকরী হবে। এই আইন অনুসারে ১৮ বছরের অধিক বয়স্কদের কাছে অশ্লীল সাহিত্য বিক্রয় বৈধ। যৌন দায়িত্বের বয়সসীমা সাধারণত আঠারো। আঠারোর উর্ধ্ব বয়স্কদের মধ্যে সমযৌনতা সংসর্গ অপরাধরূপে বিবেচ্য নয়। বিবাহজাত আত্মীয় ও আত্মীয়ার মধ্যে যৌন সংসর্গ অবৈধ নয়। স্বামীর বা স্ত্রীর তরফে ব্যভিচার শাস্তিযোগ্য নয়। শুধুমাত্র রক্তসম্পর্কিত আত্মীয় ও আত্মীয়ার মধ্যে যৌন সম্পর্ক বিষয়ে কোন অনুমোদন নাই। অর্থাৎ, যৌন বিষয়ে পুরাতন নিষেধগুলি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। বিবাহোত্তর ব্যভিচার ও সমযৌনতা সংসর্গ (homosexual act) আইনগত স্বীকৃতি পাচ্ছে। আইন প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে উনিশ শতকীয় যৌন নৈতিকতার অন্তর্গত নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার।

(Statesman, Nov. 11, 1973)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W. H. O.) একটি সংবাদ অনুসারে পশ্চিমী অঞ্চলে যৌন রোগ বৃদ্ধি দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। তরুণদের মধ্যেই অধিক পরিমাণে যৌন রোগের প্রসার ঘটছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে গনোরিয়া চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যৌন ব্যাধির প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। এর কারণ সম্ভবত প্রাক্‌বিবাহ স্বেচ্ছাচার। (দিলীপ মালাকারের বিবৃতি, যুগান্তর, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলিতে আত্মহত্যার সংখ্যাবৃদ্ধিও লক্ষণীয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে (১) হাঙ্গেরিতে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা সর্বাধিক। প্রতি এক লক্ষে ৩৩ জন। (২) চেকোশ্লোভাকিয়ায় আত্মহত্যা-কারীর সংখ্যা প্রতি এক লক্ষে ২৪ জন। (৩) সুইডেনে প্রতি এক লক্ষে ২২ জন। (৪) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক লক্ষে প্রায় ১০ জন। (৫) জাপানে প্রতি এক লক্ষে প্রায় ১৪ জন। (৬) ফ্রান্সে প্রতি এক লক্ষে প্রায় ১৫ জন। (যুগান্তর, ৩০ জুন, ১৯৭৩)

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

History of Human Marriage, E. Westermarck, 1921.

Ancient Society, L. H. Morgan, 1958.

Social Organization, R. H. Lowie, 1961

Primitive Society, R H. Lowie, 1961.

Social Organization. W. H. R. Rivers, 1932.

Sex and Repression in Savage Society, B. Malinowski, 1960.

The Mothers, R. Briffault, abridged edition, 1959.

Elements of Social Anthropology, B. C. Mazumdar, 1936.

An Introduction to Social Anthropology, D. N. Majumdar and T. N. Madan, 1961.

Teach yourself Anthropology, J. E. M. White, 1960.

Society, R. M. MacIver and C. H. Page, 1953.

A Handbook of Sociology, W. F. Ogburn and M. F. Nimkoff, 1966.

Sociology, M. Ginsberg, 1963.

Social Evolution, G. Childe, 1963.

Evolution of Law, N. C. Sen Gupta, 1962

Evolution of Property from Savagery to Civilization, P. Lafargue, Calcutta edition.

Origin of the Family, Private Property and the State, F. Engels, Moscow, 1948.

Anthropology (সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিষয়ক), A. L. Kroeber, 1948, 1967.

Cultural Anthropology, M. J. Herskovits, 1958.

Cultural Anthropology, N. K. Bose, 1961.

Races and Cultures of India, D. N. Majumdar, 1961.

Kinship Organization in India, I. Karve, 1953.

Marriage and Family in India, K. M. Kapadia, 1968.

Origin and Growth of Caste in India, N. K. Dutt, 1931.

Some Aspects of the Earliest Social History of India, S. C. Sarkar, 1928.

Hindu Law and Custom, J. Jolly, tr , 1928.

Hindu Law of Marriage and Stridhana, G. Banerjee. 1896.

Social and Religious life in the Grihya Sutras, V. M. Apte, 1954.

Mother Right in India, O. R. Ehrenfels, 1941.

Studies in Indian Social Polity, B. N. Datta, 1944.

History of Dharmasastra, P. V. Kane, vol. II, 1941.

Some Ksatriya Tribes of Ancient India, B. C. Law, 1924.

A brief sketch of the Zoroastrian Religion and Customs, E. S. Dadabhai Bharucha, 1928.

Outlines of Muhammadan Law, A. A. A. Fyzee, 1955.

Principles of Hindu Law, D. F. Mulla, 1919, 1966.

Totemism and Exogamy, J. G. Frazer, vol. II, 1910.

Totem and Taboo, S. Freud, tr., 1961.

The Todas, W. H. R. Rivers, 1906.

The Veddas, C. G. Seligman and B. Z. Seligman, 1911.

The Kharias, S. C. Roy and R. C. Roy, 1937.

The Bhumijas of Seraikella, T. C. Das, 1931.

The Kharias of Dhalbhum, T. C. Das, 1931.

The Andaman Islanders, A. R. Radcliffe-Brown, 1948.

Patterns of Culture, R. Benedict, 1961, chapter IV on the Zuni.

The Aborigines of the Highlands of Central India, B. C. Mazumdar, 1927.

The Beginnings of English Society, D. Whitelock, 1952.

Post-Caitanya Sahajiya Cult of Bengal, M. M. Bose, 1930.

The people of India, H. Risley, 1915.

Ancient India, E. J. Rapson, 1960.

The Civilization of Ancient India, L. Renou, tr., 1959.

Epic India, C. V. Vaidya, 1907.

Buddhist India, T. W. Rhys Davids, 1959.

Vedic India, L. Renou, tr., 1957.

Vedic Mythology, A. A. Macdonell, 1897.

The Sanskrit Drama, A. B. Keith, 1959.

মানব সমাজ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বঙ্গানুবাদ, ১ম খণ্ড, ১৩৬৮।
কায়স্থ পুরাণ, শশিভূষণ নন্দী, ১৩৩৫।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ, মহিম চন্দ্র মজুমদার, ১৯০০।
জাতক-মঞ্জরী, ঈশান চন্দ্র ঘোষ কৃত বঙ্গানুবাদ হইতে সংকলিত, ১৯৩৪।
প্রাচীন ভারতে নারী, ক্ষিতি মোহন সেন, ১৩৫৭।
বিধবা বিবাহ, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।
হিন্দু সমাজের গড়ন, নির্মল কুমার বসু, ১৩৫৬।
হিন্দু আইনে বিবাহ, তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬২।
ভারতে বিবাহের ইতিহাস, অতুল সুর, ১৩৮০।

সহায়ক পুস্তকাবলী:

Teach yourself Archaeology, S. G. Brade-Birks, 1962.
Prehistoric India, S. Piggott, 1952.
Vedic Age, edited by R. C. Majumdar, 1957.
The Age of Imperial Unity, edited by R. C. Majumdar, 1960.
Foundations of Language, L. H. Gray, 1958.
An Introduction to Comparative Philology, P. D. Gune, 1962.
The Sanskrit Language, T. Burrow, 1965.
Selections from Avesta and Old Persian, I. J. S. Taraporewala, 1922
The Veda of the Black Yajus School, tr. by A. B. Keith, Part I, 1967.

যাস্কক্বত নিরুক্ত, অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত বঙ্গানুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬০।
ঋগ্বেদ, রমেশ চন্দ্র দত্তকৃত বঙ্গানুবাদ, ১৯৬৩।
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীকৃত বঙ্গানুবাদ, ১৩৫৭।

কৌম, জন, জনপদ ও বর্ণ সূচী

বিষয়সূচী

ম তা ম ত

বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি

অধ্যাপক নৃপেন্দ্র গোস্বামী

দেশ—১৬. ১১. ৬৮.

গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে আনন্দ পেয়েছি। তার কারণ তার মধ্যে কয়েকটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, বৈদিক সংস্কৃতির রূপ ভাল ক'রে বুঝতে সমাজতাত্ত্বিক রীতির প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক রীতির আলোচনা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বৈদিক যুগের একটি ছাঁচের মধ্যে ফেলে আলোচনা করা যায় না।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা—কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৫.

আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয় বিভাগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লেখক বৈদিক জীবনধারার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকল্পের মূল তাৎপর্য দ্বিধাহীন চিত্তে এবং ঋজুরেখ ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন।...'মাতৃকাচর্যা ও মাতৃতন্ত্র' শীর্ষক পারচ্ছেদটি তথ্যচয়নের নৈপুণ্যে এবং মনোজ্ঞ বিশ্লেষণে অনবদ্য হয়েছে।...তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে 'বৈদিক সমাজ-সংগঠন' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। এই প্রসঙ্গে তি'ন গোত্র, প্রবর, টটেম ও আর্য কৌম স'গঠন নিয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা সত্যিই অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি করে।

যুগান্তর—১২. ৯. ৬৮.

নৃপেন্দ্র গোস্বামীর 'বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি' বইটি বাংলা ভাষায় রচিত একখানি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পুস্তক।

অমৃত—৩০. ৮. ৬৮.

'বেদের ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকায় এই গবেষণার কাজ সার্থকতা লাভ করেছে।...গ্রন্থটির বিচার আলোচনার পরিধি সীমিত নয়, বরং অতিশয় ব্যাপক, সেই কারণে এই গ্রন্থটি বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে।

পরিচয়—মাঘ, ১৩৭৫.

লেখক মর্গান, ব্রিফো, গর্ডন চাইল্ড্ এবং মার্কস-এর বিচারপদ্ধতি স্বতন্ত্রভাবে বিবৃত করিয়াছেন এবং সংক্ষেপে বিচারও করিয়াছেন। নিজে আলোচনাকালে কাহারও বিশেষ মতবাদের তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। এরূপ স্বাধীন আলোচনার দোষগুণ দুইই আছে। তবে গুণই বেশি। মতবাদ পক্ষপাত-দুষ্ট নহে, ইহা নিশ্চয়ই গুণ।…লেখক মোটামুটি *Social anthropology*-র যুক্তিসহ পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা—২৬. ২. ৬৯.

ঋগ্বেদের যুগে এবং উত্তর-বৈদিক যুগে আর্যদের ধ্যান-ধারণা এবং কর্মকাণ্ডে বিস্ময়কর অগ্রগতি—তার পিছনে আছে এক বৃহৎ ঘটনা, অনার্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সমন্বয়। সমন্বয়ের প্রক্রিয়ায় একদিকে আর্যরা যেমন অন্যদের থেকে গ্রহণ করেছেন বিস্তর, অন্যদিকে নিজেদের বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু হারিয়েছেন। আর্য সংস্কৃতির এই দিকটিরও সুন্দর আলোচনা করেছেন লেখক।

সাপ্তাহিক বসুমতী—২. ১. ৬৯.

ভারততত্ত্বের ক্ষেত্রে এইজাতীয় একটি উচ্চমানের গ্রন্থ রচনার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত ক'রে অধ্যাপক গোস্বামী বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হলেন সন্দেহ নেই।

মাসিক বসুমতী—পৌষ, ১৩৭৫.

বাংলা ভাষায় এই ধরণের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা ইতিপূর্বে হয় নাই।…এই গ্রন্থপাঠে নূতন রীতিতে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা সকলে অনুভব করিবেন।

পনেরো টাকা